কিশোর থ্রিলার

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ৫৫

রকিব হাসান

সেবা

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১	(তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)	৫২/-
তি. গো. ভ. ১/২	(ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো)	৫০/-
তি. গো. ভ. ২/১	(প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২/২	(জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৩/১	(হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩/২	(কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪/১	(ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৪/২	(ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৫	(ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৬	(মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৭	(পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৮	(আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ)	৫০/-
তি. গো. ভ. ৯	(পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল)	৫২/-
তি. গো. ভ. ১০	(বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১১	(অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১২	(প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ১৩	(ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৪	(পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ১৫	(পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১৬	(প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	৫৫/-
তি. গো. ভ. ১৭	(ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১৮	(খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১৯	(বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২০	(খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২১	(ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ২২	(চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ২৬	(ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২৭	(ঐতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৮	(ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	৪৮/-
তি. গো. ভ. ২৯	(আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৩০	(নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মুলা)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৪৮/-
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৫	(নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৩৬	(টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৩৭	(ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৩৮	(উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৯	(বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)	৪৩/-

রহস্যের খোঁজে

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

মুসারাও ঢুকল, ট্রেনটাও এসে থামল প্ল্যাটফর্মে।

সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে আছে ফারিহা। কামরার দরজাগুলোর দিকে তাকাচ্ছে।

ব্যাগ-সুটকেস নিয়ে লোক নামছে। ছুটাছুটি করছে কুলিরা। কিন্তু কিশোর কই?

'কোথায় ও?' যাত্রীদের মধ্যে তাকে খুঁজছে ফারিহার চোখ।

'কি জানি,' কানের পেছনটা চুলকাল রবিন, 'হয়তো ছদ্মবেশ নিয়েছে! আমাদের সঙ্গে মজা করার জন্যে।'

তার গায়ে কনুইয়ের গুঁতো মারল মুসা। 'ওই দেখো, ওই যে!'

তিনজনেই দেখল, পেছনের শেষ কামরাটা থেকে টেনে-হিঁচড়ে বিরাট এক সুটকেস নামাচ্ছে মোটাসোটা, গোলগাল এক কিশোর।

ঠিক! ওই ছেলেটাই কিশোর, ছদ্মবেশে রয়েছে, কোন সন্দেহ রইল না তিনজনের।

দৌড় দিতে যাচ্ছিল ফারিহা, হাত টেনে ধরল মুসা, 'দাঁড়াও! সে যেমন আমাদের সঙ্গে চালাকি করছে, আমরাও করব। সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেও না চেনার ভান করব। দেখি কি করে?'

সুতরাং কাঁধে ওভারকোট ঝুলিয়ে, বিশাল সুটকেসের ভারে বাঁকা হয়ে গিয়ে যখন ওদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল ছেলেটা, একটা কথাও তার সঙ্গে বলল না ওরা। এমনকি তার দিকে তাকিয়ে হাসল না পর্যন্ত। তবে কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর পিছে পিছে চলল।

ফিরেও তাকাল না ছেলেটা। জুতোর শব্দ তুলে একতালে হেঁটে চলেছে। প্ল্যাটফর্মের বাইরে বেরিয়ে সুটকেস নামিয়ে রেখে, পকেট থেকে একটা লাল রুমাল বের করে বিকট শব্দ করে তাতে নাক ঝাড়ল।

'কাণ্ড দেখো!' বলে উঠল ফারিহা, 'একেবারে ফগর‍্যাম্পারকটের মত করে নাক ঝাড়ছে। অভিনয় করছে। ডাক দেব নাকি?'

'না, এখন না,' মুসা বলল, 'পরে।'

রুমাল পকেটে রেখে সুটকেস তুলে আবার পা বাড়াল ছেলেটা। পেছনে লেগে রইল তিনজন। জুতোর শব্দে ফিরে তাকাল সে। ভুরু কোঁচকাল। সুটকেসটা নামিয়ে রাখল হাতটাকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে।

সঙ্গে সঙ্গে পেছনে দাঁড়িয়ে গেল তিনজন।

সুটকেস তুলে ছেলেটা এগোতেই ওরাও এগোল।

আবার ফিরে তাকাল ছেলেটা। জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার? আমার পেছনে

লেগেছ কেন?'

জবাব দিল না তিনজনের কেউ।

বিরক্ত স্বরে ছেলেটা বলল, 'ঝামেলা! পাজি ছেলেমেয়েগুলো আমার পেছনে লেগেছে কেন?'

ঝটকা দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে আবার এগোল সে।

ফিসফিস করে ফারিহা বলল, 'বললাম না ফগর‍্যাম্পারকটের অভিনয় করছে!'

'সুটকেসের ভারে তো বাঁকা হয়ে গেল!' রবিন বলল। 'চলো, বলে দিই আমরা ওকে চিনে ফেলেছি। বোঝাটা নিয়ে ওকে রেহাই দিতে পারি।'

'এই, কিশোর, দাঁড়াও,' ডাক দিল মুসা।

ছুটে গিয়ে ছেলেটার হাত চেপে ধরল ফারিহা। 'স্টেশনে তোমাকে আনতে গিয়েছিলাম আমরা।'

পাশে এসে দাঁড়াল রবিন, 'তারপর? কেমন আছ?'

সুটকেস নামিয়ে রাখল ছেলেটা। কোমরে হাত দিয়ে মুখোমুখি হলো ওদের। বলল, 'দেখো, বড় বেশি বিরক্ত করছ! জলদি বিদেয় হও! নইলে বাড়ি গিয়ে চাচাকে বলে দেব। আমার চাচা পুলিশের লোক।'

হা-হা করে হেসে উঠল মুসা। 'হয়েছে হয়েছে, আর লাগবে না! তুমি যে কিশোর, বুঝতে আর বাকি নেই আমাদের। সুটকেসটা আমাদের হাতে দেবে, না একা একাই বোঝা টেনে মরবে?'

সন্দেহ ফুটল ছেলেটার চোখে। 'ছিনতাই করতে আসোনি তো? সুটকেস কেড়ে নেবে নাকি?'

হাত নেড়ে মুসা বলল, 'দূর, বাদ দাও না অভিনয়! ভাল্লাগছে না আর!'

ফারিহা জিজ্ঞেস করল, 'টিটুকে কোথায় রেখে এলে?'

হাঁ করে তাকিয়ে আছে ছেলেটা। যেন কিছু বুঝতে পারছে না। আনমনে মাথা নেড়ে বিড়বিড় করতে করতে সুটকেস তুলে নিল আবার। হাঁটতে শুরু করল।

কিছুদূর গিয়ে তিনজনকে অবাক করে দিয়ে ভুল পথ ধরল। যেদিকে মোড় নিল, সেটা কিশোরদের বাড়ি নয়।

আরও অবাক হলো ওরা, গাঁয়ের পুলিশম্যান কনস্টেবল ফগর‍্যাম্পারকটের বাড়ির দিকে ছেলেটাকে এগোতে দেখে। দাঁড়িয়ে গেল তিনজনে।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকাল ছেলেটা। তারপর গেট খুলে ভেতরে ঢুকে গেল।

'ঘটনা কি, বলো তো?' মুসা বলল, 'কিশোর অমন করল কেন? ঝামেলার বাড়িতেই বা ঢুকল কেন? কি করতে চায়?'

'কি জানি!' আবার কানের পেছনটা চুলকাল রবিন। 'মতলব একটা নিশ্চয় আছে!'

'হয়তো ফগের সঙ্গে কোন চালাকি করতে গেছে,' ফারিহা বলল।

'কি চালাকি?' মুসার প্রশ্ন।

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না!' চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল রবিন।

দুই

কিছুক্ষণ পর মুসাদের বাগানের ছাউনিতে বসে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছে তিনজনে, এই সময় গেটের কাছে কুকুরের ডাক শোনা গেল।

'ওই যে টিটু!' বলে লাফ দিয়ে উঠে দরজার দিকে দৌড় দিল ফারিহা।

রবিন আর মুসাও ছুটল।

বাইরে বেরিয়ে দেখল গেট খুলে ভেতরে ঢুকছে কিশোর। ওদেরকে দেখে দৌড়ে আসতে লাগল ছোট্ট কুকুরটা।

কোলে তুলে নিল ফারিহা।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'ওকে পেলে কোথায়? সুটকেসে ভরে রেখেছিলে নাকি?'

বুঝতে পারল না যেন কিশোর। মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'মানে?'

'হয়েছে, আর সহ্য করতে পারছি না!' হাত নেড়ে অধৈর্য হয়ে বলল মুসা, 'অভিনয়টা এবার বাদ দাও! স্টেশনে তোমাকে সুটকেস হাতে গাড়ি থেকে নামতে দেখলাম, সঙ্গে টিটু ছিল না। এখন এল কোত্থেকে? আনলে কি করে ওকে? এ তো ভূতুড়ে কাণ্ড মনে হচ্ছে! ঝামেলার বাড়িতেই বা ঢুকলে কেন?'

আরও অবাক মনে হলো কিশোরকে। 'ঝামেলার বাড়িতে ঢুকলাম? কি বলছ? টিটুকে নিয়েই তো গাড়ি থেকে নামলাম। ভাবলাম, প্রথম ট্রেনে আমাকে না দেখে ভেবেছ, আর আসব না। ফিরে এসেছ। বাড়িতে ব্যাগ রেখেই তাই ছুটে এসেছি।'

আগেই সন্দেহ হয়েছিল রবিনের, বাড়ল এখন সেটা। জিজ্ঞেস করল, 'ছদ্মবেশে আসোনি তুমি?'

'তা কেন আসব? আমি আমার মতই এসেছি।'

'সত্যি বলছ ছদ্মবেশ নাওনি?'

'না,' জোরে জোরে মাথা নাড়ল কিশোর। 'ব্যাপারটা কি বলো তো?'

স্টেশনে ওকে আনতে যাওয়ার পর থেকে যা যা ঘটেছে, সব খুলে বলল মুসা, রবিন আর ফারিহা।

শুনে গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর। 'হুঁ! ওই ছেলেটা আমি নই, অন্য কেউ। কারণ সে যে ট্রেনে এসেছে বলছ, আমি সেটাতে আসিনি। এসেছি পরেরটায়। অল্পের জন্যে মিস করেছিলাম প্রথম ট্রেনটা। নিশ্চয় ও ফগর্যাম্পারকটের ভাতিজা। শরীর-স্বাস্থ্য হয়তো আমার মত। তাই ভুল করেছ।'

রবিনও একমত হয়ে মাথা নাড়ল, 'তা হতে পারে। কিন্তু জানা যাবে কি করে?'

'এ আর এমন কঠিন কি। ফগর্যাম্পারকটের বাড়িতে গেলেই জানা যাবে।'

তখনই যেতে চাইল ফারিহা। কিন্তু কিশোর রাজি হলো না। বলল, 'এটা কোন রহস্য নয়, এত তাড়াহুড়োরও দরকার নেই। পরে গেলেও চলবে। তা তোমরা আছ কেমন?'

কথা বলতে বলতে ছাউনির দিকে এগোল ওরা। বড়দিনের ছুটি। ছুটিটা

বন্ধুদের সঙ্গে কাটানোর জন্যে গ্রীনহিলসে এসেছে কিশোর। সে আগে চলে এসেছে। জরুরী একটা কাজ সেরে পরের ট্রেনে আসবে ওর চাচা-চাচী।

কোন রহস্য পাওয়া গেছে কিনা, জানতে চাইল কিশোর। নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল অন্য তিনজন। পাওয়া যায়নি। কিছুই নেই। গ্রীনহিলস থেকে যেন উধাও হয়ে গেছে রহস্য।

আর কোন কাজ না পেয়ে পরদিন সকালে ফগর্যাম্পারকটের বাড়িতে রওনা হলো ওরা, ছেলেটার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। বাড়িতে ঢুকতে হলো না। রাস্তা থেকেই ওরা দেখল, গেট খুলে বেরিয়ে আসছে সে। ফগের সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে আনছে। একটা চাকা বসা। নিশ্চয় টিউব পাংচার হয়ে গেছে। সারাতে নিয়ে যাচ্ছে।

'ওই যে!' কিশোরকে দেখাল ফারিহা।

ওদের দেখে বিরক্ত হলো ছেলেটা। তার চোখ দেখেই বোঝা গেল।

বিরক্ত কিশোরও হলো, বন্ধুদের ওপর। 'ওই ময়দার দলাটাকে আমি ভেবেছ! ভাবতে পারলে কি করে এমনটা! আমি কি অতই কুৎসিত?'

'না না, তা নও!' তাড়াতাড়ি বলল ফারিহা। 'তুমি খুবই সুন্দর। আমরা ভেবেছি তুমি ছদ্মবেশ নিয়েছ।'

ওদের সামনে দিয়েই পথ। তাই আসতে হলো ছেলেটাকে। নইলে হয়তো অন্য পথ ধরেই যেত। এটা অবশ্য মুসার ধারণা। তবে কাছে এসে তাকে অবাক করে দিয়ে হাসল ছেলেটা। বলল, 'কালকে যে ভুল করেছিলে এবার বুঝলে তো? আমি চাচাকে বলেছি ঘটনাটা। সে বলল কিশোর নামে নাকি একটা পাজি ছেলে আছে আমার মত মোটা। তোমরাও নাকি সবাই খুব বদ। নিজেদের গোয়েন্দা হিসেবে জাহির করো। জ্বালিয়ে মারো গাঁয়ের লোককে।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি নিশ্চয় কিশোর পাশা?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তুমি?'

'আমি উইলিয়াম ববর্যাম্পারকট।'

'শুধু বব বললে হয় না?'

'তা হয়। ওটাই বরং আমার পছন্দ। বেশি লম্বা নাম বলতে গিয়ে ভুল উচ্চারণ করে ফেলে লোকে। খারাপ লাগে।'

'বেড়াতে এসেছ নাকি চাচার বাড়িতে?' জানতে চাইল রবিন।

'হ্যাঁ। এই প্রথম এলাম এখানে। আমার আসার ইচ্ছে ছিল না। চাচাটা ভীষণ কড়া। খালি বড়াই করে, নিজের বুদ্ধির বড়াই। বড়দিনের ছুটিতে আমার আব্বা-আম্মা বাইরে চলে গেছে। আমাকে বলল এখানে এসে থাকতে। বাধ্য হয়ে এলাম। নইলে কে আসে তার কাছে মরতে! তোমরা তার কি করেছ বলো তো? শোনার সঙ্গে সঙ্গে খেপে গেল। বলল, তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে। নইলে নাকি বিপদে ফেলে দেবে। তবে আমি তার কথা শুনব না। অত শাসন ভাল লাগে না। কোন রহস্য পেলে বোলো, চাচাকে দেখিয়ে দেব, তার চেয়ে বুদ্ধি আমার বেশিই।'

ওদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই যখন চাচার অত বদনাম করল, বোঝা গেল

চাচাকে পছন্দ করে না বব। কিশোর বলল, 'তা দেখাতে পারবে। কঠিন কোন কাজ না। রহস্য পেলেই তোমাকে জানানো হবে। একহাত দেখিয়ে দিয়ো তখন চাচাকে।'

'তা তো দেখাবই! দিয়েই দেখো না খালি একটা রহস্য! খালি চাচাকেই নয়, তোমাদের চেয়েও ভাল গোয়েন্দা আমি, সেটাও প্রমাণ করে ছেড়ে দেব!'

মুসার বলতে ইচ্ছে করল—এতই যদি ভাল গোয়েন্দা, তাহলে নিজের রহস্য নিজেই জোগাড় করে নাও না কেন? কিন্তু বলল না। তবে খোঁচা মারিতে ছাড়ল না। 'হুঁ, তুমি যে ঝামেলার ভাতিজা, বোঝাই যাচ্ছে।'

'মানে?'

'না, কিছু না,' আরেক দিকে তাকাল মুসা।

'তুমি বলতে চাও আমিও চাচার মত বেশি কথা বলি?'

'না, তা আর বললাম কোথায়...'

বাধা দিল কিশোর, 'ঝগড়াঝাঁটি বাদ দাও। বব, আমরা যে রহস্য দিতে চেয়েছি, খবরদার, তোমার চাচাকে কিন্তু বোলো না এ কথা। তাহলে আর কিছু করতে পারবে না। কিছুই করতে দেয়া হবে না তোমাকে।'

'পাগল হয়েছ জানাব!'

রবিন জানতে চাইল, 'তা এসেই চাচার ওপর অমন খেপলে কেন?'

'খেপব না! রাতে খাতা খুলে কবিতা লিখতে বসলাম। দেখে আজেবাজে কথা বলতে শুরু করল চাচা। বলে কিনা, কবিতা নাকি বোকারা লেখে। বুদ্ধিমান লোক ওসব পাগলামি করে সময় নষ্ট করে না। তোমরাই বলো, আমাকে কি বোকা মনে হয়? তারপর সকালে উঠেই বলে কি, সাইকেলটার চাকা বসে গেছে, মেরামত করে নিয়ে আয়। এমন ভঙ্গি করল, আমি যেন তার চাকর। বিশ্বাস করো, বাড়িতেও এ সব কাজ করি না আমি!'

'কি কবিতা লেখো তুমি?' জিজ্ঞেস করল ফারিহা।

উজ্জ্বল হলো ববের চোখ। 'শুনবে? দাঁড়াও, শোনাচ্ছি একটা।' স্কুলে শিক্ষক পড়া ধরলে যেমন করে বলে ছেলেরা, তেমনি ভঙ্গিতে বলল:

কবিতার নাম মরা শুয়োর,

—লিখেছেন উইলিয়াম ববর‍্যাম্পারকট।'

সুর করে আবৃত্তি শুরু করল:

'এক যে ছিল মরা শুয়োর,
তার ছিল তিন ছানা;
কাজের মধ্যে শুধুই তাদের
ঝগড়া ছিল জানা...'

'মরা শুয়োরের আবার ছানা থাকে কি করে?' ধরে বসল মুসা।

'গাধা নাকি, সহজ কথাটা বুঝলে না! আরে বেকুব, মরার পর ছানা হয়নি শুয়োরটার, ছানা হওয়ার পর মরেছে।'

হাহ্ হাহ্ করে হাসল মুসা। বলল, 'চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও। একদিন দেখা যাবে নোবেল প্রাইজই পেয়ে গেছ। তবে লাইনের পাশে নোট লিখে বুঝিয়ে

দিয়ো কি বলতে চেয়েছ। ক্লাসিক জিনিস তো, সবাই বুঝতে পারবে না।'

মুসার ব্যঙ্গ শুনে রেগে উঠতে যাচ্ছিল বব, পেছনে গর্জন শোনা গেল, 'খ্যাই, বব! এখনও যাসনি!'

গেট খুলে বেরিয়ে এসেছে ফগ।

চাচাকে দেখে কুঁকড়ে গেল বব। বলল, 'এই যে, যাচ্ছি!' গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে বলল, 'পরে দেখা হবে। তোমরা রহস্যের খোঁজ করতে থাকো।'

তাড়াহুড়ো করে চলে গেল সে।

তিন

কয়েক দিন কেটে গেল। রোজই গোয়েন্দাদের সঙ্গে দেখা করে বব। বিরক্ত করে ফেলল ওদের। দেখা হলেই তিনটে কাজ–রহস্য আছে কিনা জানতে চাওয়া, চাচার বদনাম করা, আর কবিতা শোনানোর চেষ্টা। ফগের ব্যাপারে অনেক নতুন নতুন তথ্য জানতে পারল গোয়েন্দারা।

এক সকালে মুখ কালো করে বলল বব, 'জানো, আজ কি কাণ্ড করেছে, চাচা? ছয়টা ডিম ভেজে একাই খেয়ে ফেলেছে! আমাকে একটাও দেয়নি। কেবল এক প্লেট পরিজ দিয়েছে।'

আরেক দিন বলল, 'পুলিশের শুনেছি চব্বিশ ঘণ্টাই ডিউটি। কিন্তু চাচাটাকে কখনোই কাজ করতে দেখি না। বসে বসে থাকে। দুপর হলেই গাদা গাদা গেলে। তারপর নাক ডাকায়। সাধে কি আর পেটমোটা হয়! ইস্, একদিন এসে যদি দেখে ফেলত ক্যাপ্টেন, খুব ভাল হত!'

অন্য একদিন বলল, 'চাচা বলে কি শোনো, তোমাদের ধরে নাকি কিছুদিন হাজতে ভরে রাখা উচিত। তাতে তোমাদের শিক্ষা হবে...'

বিরক্ত হয়ে কিশোর বলল, 'দেখো, বব, ঘরের কথা এ ভাবে অন্যকে বলা উচিত না। গুরুজনদের বদনাম তো একেবারেই নয়। তোমার চাচা তোমাকে বিশ্বাস করেই এ সব বলে। তুমি আমাদের বলে দেবে জানলে বলত না।'

তর্ক শুরু করল বব, 'বলার জন্যেই বলে! তুমি জানো না!'

'আমার তা মনে হয় না।'

অহেতুক তর্ক করতে ইচ্ছে করল না কিশোরের। চুপ হয়ে গেল। যে বোঝে না, তাকে বোঝানো কঠিন।

মহা খাপ্পা হয়ে একদিন রবিন বলল, 'একটা রহস্য পেলে এখন কাজ হত। দিয়ে দেয়া যেত ওকে। ঠেলা সামলাতে গিয়ে বুঝত কত ধানে কত চাল।'

'কিন্তু রহস্য তো আর অত সহজ না!' মুসা বলল। 'পাব কোথায়? নিজেদের জন্যেই তো জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছি।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'রহস্য পেলে তো আমাদেরও এ ভাবে বসে থাকা লাগত না। একটা কাজ করব নাকি?'

'কি কাজ?' জানতে চাইল অন্য তিনজন।

টিটু লেজ লম্বা করে দিয়ে বসে এমন ভঙ্গিতে তাকাল, যেন সে-ও শোনার জন্যে উৎসুক।

'রহস্য একটা বানিয়ে দেব নাকি ওকে?' বন্ধুদের দিকে তাকাল কিশোর।

'রহস্য বানাবে?' ভুরু কোঁচকাল রবিন। 'কি ভাবে?'

হাসল কিশোর। 'আরেকবার ও এসে জিজ্ঞেস করলে বানিয়ে বানিয়ে একটা গল্প বলে দেব। বলব, অমুক জায়গায় লুটের মাল এনে লুকিয়েছে ডাকাতেরা। আমরা সূত্র পেয়েছি। খুঁজতে যেতে বলব তাকে।'

হেসে উঠল ফারিহা। হাততালি দিয়ে বলল, 'ঠিক! তাই করো! খুব মজা হবে!'

কি করতে চায় আরও খুলে বলল কিশোর। শুনে হাসতে লাগল রবিন আর মুসাও।

আলোচনা করে একমত হলো সবাই, ববকে ঘাড় থেকে খসাতে হলে ওই কাজই করতে হবে।

সুতরাং এরপর যখন বব ছাউনিতে দেখা করল ওদের সঙ্গে, বলা হলো, পরদিন নোটবুক নিয়ে তৈরি হয়ে আসতে। একটা রহস্যের খোঁজ ওরা পেয়েছে। প্রয়োজনীয় সূত্র দেয়া হবে, যাতে সে তদন্ত করতে পারে।

পরদিন সকালে এসে হাজির হলো বব। হাতে কালো একটা নোটবুক। দেখেই চিনতে পারল কিশোর। পুলিশের নোটবুক। নিশ্চয় চাচারটা চুরি করে এনেছে। বললে কিছুতেই নিতে দিত না ফগ। কারণ এই জিনিস বাইরের কারও হাতে দেখা গেলে চাকরি চলে যেতে পারে তার।

কিশোর জানতে চাইল, 'এটা কোথায় পেলে?'

বব জানাল, 'চাচার ড্রয়ারে।'

'খুব অন্যায় করেছ এনে। সরকারি জিনিস। ধরা পড়লে তুমি তো বিপদে পড়বেই, তোমার চাচাকেও বিপদে ফেলবে।'

'কেন, এতে দোষের কি আছে?'

'তোমার চাচাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখো, কি দোষ।'

'বেতিয়ে পিঠের চামড়া তুলে ফেলবে,' বলে দিল মুসা।

রেগে গেল বব, 'দেখো, আমার সঙ্গে এ ভাবে কথা বোলো না বলে দিলাম!'

শান্তকণ্ঠে কিশোর বলল, 'তুমি বুঝতে পারছ না, বব। সত্যি বলছি, সাংঘাতিক রেগে যাবে তোমার চাচা। আমার কথা শোনো। এটা যে নিয়েছ, তাকে বোলো না। বাঁচতে চাইলে চুপচাপ রেখে দিয়ো ড্রয়ারে।'

আর তর্ক করল না বব। বলল, 'ঠিক আছে, তাই করব। আমার নোটবুকটা আনিনি, ভুলে বাড়িতে ফেলে এসেছি। ভাবলাম, তোমাদের কথা নোট করে নিতে হবে, তাই এনেছি এটা। কোথায় লিখি এখন, বলো তো?'

'আমি একটা ধার দিতে পারি তোমাকে,' রবিন বলল।

'তাহলে খুবই ভাল হয়।'

পুরানো একটা নোটবুক বের করে দিল রবিন।

'হ্যা, এখন কি করতে হবে বলছি তোমাকে,' কিশোর বলল, 'মন দিয়ে শোনো। যেখানে রহস্যময় ঘটনা ঘটছে সেই জায়গাটা দেখতে যাবে প্রথমে। যা যা দেখবে, যা পাবে, সব লিখে রাখবে। যাদেরকে সন্দেহ হবে তাদের নাম লিখবে। এক এক করে তদন্ত চালাবে তাদের ওপর। যার ওপর থেকে সন্দেহ চলে যাবে তার নাম কেটে দেবে। বুঝতে পারছ?'

লিখে নিতে নিতে ঘাড় কাত করল বব, 'পারছি।'

'লেখা শেষ হলে বোলো।'

বেশ দ্রুত লিখতে পারে বব। শেষ করে মুখ তুলল। বলল, 'এবার বলো, কোথায় তদন্ত করতে যেতে হবে। রহস্যটা কি?'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল কিশোর। এক এক করে তাকাল বন্ধুদের মুখের দিকে। ফারিহার দিকে চেয়ে চোখ টিপে ইঙ্গিতে বোঝাল—খবরদার, হেসো না।

এখনই হাসি আসছে ফারিহার। কিশোর বলতে আরম্ভ করলে যে না হেসে পারবে না এটা বুঝে টিটুকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সব পণ্ড করতে চায় না।

ববকে বলল কিশোর, 'ডেভিলস হিল চেনো?'

মাথা নাড়ল বব, 'দূর থেকে দেখেছি। যাইনি কখনও।'

'এবার যাবে। রাতের বেলা যেতে হবে। নানা রকম ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটে ওখানে, সে-জন্যেই নাম রাখা হয়েছে শয়তানের পাহাড়। পুরানো একটা বাড়ি আছে ওখানে। অনেক দিন থেকে পোড়ো। রাতের বেলা তার আশেপাশে অদ্ভুত আলো দেখা যাচ্ছে কদিন ধরে। আমরাই যেতাম তদন্ত করতে। নেহায়েত তুমি ধরলে, তাই তোমাকে জানালাম খবরটা। দেখি কি করতে পারো।'

কেউকেটা ভঙ্গিতে ঘাড় দুলিয়ে বব বলল, 'ভেব না। ঠিক সমাধান করে ফেলব এই রহস্যের। কবে যাব, বলো তো? রোজ রাতেই আলো দেখা যায়?'

কিশোর জবাব দেয়ার আগেই বাইরে তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করল টিটু।

মুহূর্ত পরেই দরজায় দেখা দিল ফারিহা। উত্তেজিত হয়ে জানাল, 'বব, তোমার চাচা আসছে!'

ফগের পায়ে কামড়ে দেয়ার জন্যে খেপে গেল টিটু। শক্ত করে তাকে ধরে রাখল ফারিহা।

তাড়াতাড়ি ফগেরটা এবং রবিনের দেয়া নোটবুক, দুটোই পকেটে ভরে ফেলল বব। ঠিক এই সময় দরজায় উদয় হলো তার চাচা। বিশাল থাবা দিয়ে ঠেলে ফারিহাকে সরিয়ে ভয়ানক স্বরে ভাতিজাকে বলল, 'এখানে বসে বসে আড্ডা দেয়া হচ্ছে, না! আর আমি ওদিকে খুঁজে মরি! এসো আজ, দেখাব মজা! তোমাদের মত আলসেদের কি করে শায়েস্তা করতে হয় জানা আছে আমার!'

ববকে নিয়ে চলে গেল ফগ।

চার

বেড়াতে এসে বিপদেই পড়ল বেচারা বব। কোথায় একটু আনন্দ-ফুর্তি করবে, অলস সময় কাটাবে, তা না, সারাক্ষণ কড়া নজর। মুসাদের বাড়ি থেকে ধরে এনে এমন এক কাজ ঘাড়ে চাপিয়েছে চাচা, খাটতে খাটতে জান শেষ। সারাটা দিনই প্রায় কেটে গেল, তা ও কাজ আর ফুরায় না।

প্রচণ্ড পরিশ্রম তো হচ্ছেই, তার ওপর ভয়–কখন ড্রয়ার টান দিয়ে নোটবুকটা যে খোয়া গেছে দেখে ফেলে চাচা। সারাদিন ঘরে বসে থেকেছে চাচা, রাখার সুযোগ পায়নি বব। সন্ধ্যার পর থেকে বার বার ওই ঘরে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল সে। কিন্তু যতই শিস দিতে দিতে আনমনে ঢুকে পড়ার ভান করুক, ঠিক ফিরে তাকাচ্ছে চাচা।

বব আবার ঢোকার চেষ্টা করতেই দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে খেঁকিয়ে উঠল ফগ, 'হয়েছে কি তোর? অমন ছটফট করছিস কেন? বার বার ওঘরে কি?'

'না, এমনি। হাত ধুতে যাচ্ছিলাম।'

'ঝামেলা! ক'বার হাত ধোয়া লাগে? এই তো ধুয়ে এলি, দুই মিনিটও হয়নি। আবার! বলে বলে ধোয়ানো যায় না, আজ হাত ধোয়ারই বা অত ধুম কেন?'

'কেমন যেন আঠা আঠা লাগছে।'

রান্নাঘরে ফিরে এল বব। আর্মচেয়ারে আরাম করছে তার চাচা। কোটের বোতাম খোলা। ভুঁড়ি ঠেলে বেরিয়ে আছে। ব্যাঙের চোখের মত গোল গোল চোখগুলো আধবোজা।

চেয়ারে বসে পড়ল বব। ভাবছে, আজ ঘুমাতে যাচ্ছে না কেন চাচা? রোজই তো এ সময় বিছানায় চলে যায়। একটা খবরের কাগজ তুলে নিল।

ববের আচরণে সন্দেহ হয়েছে ফগের। ভাবছে, ছেলেটা এমন করছে কেন? হতচ্ছাড়া কিশোর পাশাটা কোন কুবুদ্ধি ঢুকিয়ে দেয়নি তো মাথায়? ফাইল ঘেঁটে দেখতে বলেছে? রহস্যের খোঁজ করছে হয়তো। ভেবেছে, ফাইলে গোপন কিছু লেখা থাকতে পারে।

চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করল ফগ।

চাচার নাক ডাকানো শুরু হতে হাতের কাগজটা রেখে দিল বব. এই-ই সুযোগ। চট করে অফিসে ঢুকে ড্রয়ার খুলল। নোটবুক রাখল। কিন্তু বন্ধ করার আর সময় পেল না, পেছনে গর্জে উঠল চাচা, 'এই, কি করছিস! ড্রয়ারে হাত দিলি কেন!'

ধড়াস করে এক লাফ মারল হৃৎপিণ্ড। ববের মনে হলো বুকের খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে চলে আসবে ওটা। ঠাণ্ডা হয়ে গেল হাত-পা। কথা বলতে গেল, স্বর বেরোল না।

ঠাস করে তার গালে চড় মারল ফগ। 'বল, কি নিতে যাচ্ছিলি!'

গাল চেপে ধরে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল বব, 'কিছু না, চাচা, খোদার

কসম!'

আরও জোরে গর্জে উঠল ফগ। 'খুললি কেন তাহলে?'

জবাব দিতে পারল না বব।

চড় পড়ল আরেক গালে।

শাসিয়ে দিয়ে ফগ বলল, 'আর যদি এখানে ঢুকতে দেখি, পিঠের ছাল তুলে ফেলব! সত্যি করে বল কেন ঢুকেছিস? রহস্য খুঁজতে বলেছে কিশোর, তাই না?'

খানিকটা স্বস্তি পেল বব। যাক, নোটবুকটা রাখতে দেখেনি চাচা। গরম হয়ে যাওয়া কানের ওপর হাত চেপে ধরে বলল, 'না, চাচা, কসম। রহস্যটার কথা সে আগে থেকেই জানে। আমাকে বলেছে।'

কান খাড়া হয়ে গেল ফগের। 'রহস্য! কোন্ রহস্য?'

'ডেভিলস হিলে নাকি রাতের বেলা আজব আলো দেখা যায়। আর কিছু বলেনি অবশ্য। মনে হয় জানে না।'

'খবরদার, ওই পাজিগুলোর সঙ্গে মিশবি না। কুবুদ্ধি দিয়ে দিয়ে মাথাটা খারাপ করে দেবে। আজ ছেড়ে দিলাম। আর যদি এ ঘরে ঢুকে কিছু খুঁজতে দেখি…যা, হোমওয়ার্কগুলো সেরে ফেল।'

বাধ্য ছেলের মত রান্নাঘরে ফিরে এসে অঙ্ক বই নিয়ে বসল বব। কিন্তু বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকাই সার হলো। এমন একটা রহস্য ফেলে রেখে কি আর অঙ্ক করা যায়! কবে রাতের বেলা বেরোতে হবে সেটাও জানা হয়নি কিশোরের কাছ থেকে। ভীষণ রাগ হলো চাচার ওপর। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল, ইয়া বড় এক বাঘ তার চাচার ঘাড় মটকে মেরে ফেলেছে। লাশটা পড়ে গেছে পানিতে। সেটা নিয়ে ডুব দিয়েছে বিশাল এক কুমির।

সকালে উঠেই হুকুম দিল চাচা রান্নাঘরটা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। তারপর অফিসের র‍্যাকে রাখা সমস্ত ফাইলপত্র ঝাড়তে হবে। এত বিষাক্ত হয়ে গেল ববের মন, মনে হতে লাগল স্বপ্নটা সত্যি হলেই ভাল হত।

সারাটা সকাল ঘরে আটকে রইল বব। দুপুরের পর তার চাচা আর্মচেয়ারে শুয়ে নাক ডাকানো শুরু করতেই ভাবল, বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু সাহস করতে পারল না।

কি করবে ভাবছে সে, এই সময় দরজায় এত জোরে থাবা পড়ল মনে হলো যেন ভেঙে ফেলতে চাইছে কেউ।

চমকে জেগে গেল ফগ।

বব জিজ্ঞেস করল, 'খুলে দেব গিয়ে?'

জবাব দিল না চাচা। তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিল। তার ভয়, এত জোরে যখন থাবা দিয়েছে, অফিসের কেউ এসেছে। ক্যাপ্টেনও পাঠিয়ে থাকতে পারেন। সাধারণ কোন লোক পুলিশের ঘরের দরজায় এত জোরে থাবা দিতে সাহস করবে না।

কিন্তু অবাক হয়ে ফগ দেখল, সাহস করেছে। আর যে করেছে সে অতি সাধারণ এক বুড়ি। তাকে দেখেই কফ জড়ানো ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'একটা অভিযোগ করতে এসেছি, মিস্টার ফগ…'

'ফগর‍্যাম্পারকট!' ধমকে উঠল ফগ।

'সরি, ফগর‍্যাম্পারকট। আমার পাশের বাড়ির বেটিটা মহা শয়তান। খালি আমার বাগানে আবর্জনা ফেলে, ময়লা পানি ফেলে...'

'ঝামেলা! নাম কি আপনার? কোথায় থাকেন?'

'ওই তো ওদিকে,' কোন দিকই দেখাল না বুড়ি। 'গতকাল আমাকে শয়তান বুড়ি বলে গাল দিয়েছে। শকুন বলেছে। আরও কি করেছে জানেন...'

'লিখিত অভিযোগ করুন, দেখি কি করা যায়,' দরজা লাগিয়ে দিল ফগ।

আর্মচেয়ারে এসে শোয়ার পর দুটো মিনিটও গেল না, আবার দরজায় শব্দ। এবার আর থাবা নয়, বেশ মার্জিত টোকা। লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গেল ফগ। খুলে দেখে সেই বুড়ি। দেখতে সাধারণ হলে কি হবে, বুড়িটা খুব চালাক। থাবা দিলে যদি আর দরজা না খোলে, সে-জন্যে টোকা দিয়েছে।

খেঁকিয়ে উঠল ফগ, 'আবার কি?'

'বলতে ভুলে গেছি, স্যার, গত পরশু আমার গায়ে এক বালতি ময়লা পানি ঢেলে দিয়েছে বেটিটা...'

গর্জে উঠল ফগ, 'বললাম না লিখিত অভিযোগ করতে! যত্তোসব ঝামেলা!'

দরজা লাগিয়ে দিয়ে গজগজ করতে করতে এসে শুয়ে পড়ল সে।

মিনিটখানেক পর আবার দরজায় ধাক্কা।

না খুলে উপায় নেই। বুড়ি না হয়ে অন্য কেউও হতে পারে। ভাতিজার দিকে তাকিয়ে ফগ বলল, 'দেখ্, কে?'

বুড়িই এসেছে আবার। ববকে দেখেই বলে উঠল, 'বলতে ভুলে গেছিলাম, লিখিত অভিযোগ করতে পারব না আমি। লেখাপড়া জানি না। মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট তোমার কি হন?'

'চাচা।'

'তোমার চাচাকে জিজ্ঞেস করো, এখন আমি কি করব?'

ববকে সাংঘাতিক অবাক করে দিয়ে চোখ টিপল বুড়ি। চাদরের ভেতর থেকে একটুকরো কাগজ বের করে তার হাতে গুঁজে দিল। ফিসফিস করে বলল, 'আমি কিশোর পাশা! শোনো, জলদি আমাকে ধমক দাও! চলে যেতে বলো!'

হাঁ হয়ে গেল বব। চমকটা কাটাতে সময় লাগল। তাড়াতাড়ি কাগজটা পকেটে রেখে ধমক দিয়ে বলল, 'ঝামেলা! বার বার বিরক্ত করছেন কেন? চাচাকে এখন ডাকা যাবে না, ঘুমোচ্ছেন! যান, ভাগুন!'

জোরে জোরে বলল কিশোর, 'পুলিশের অত ঘুম কিসের? আমার কাজ করে দিচ্ছে না! ওপরওলাদের কাছে যাব আমি, নালিশ করব...'

'যান, করুনগে!' দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিয়ে ফিরে এল বব।

ভাতিজার কাজে খুশি হলো চাচা। বলল, 'যা, আজ আর কিছু করা লাগবে না। বিশ্রাম নে গে।'

সরে চলে এল বব। উঁকি দিয়ে দেখল, তার চাচ [illegible] করছে। আবার আর্মচেয়ারে শরীরটাকে নেতিয়ে দিয়েছে। নাক ডাকানো শুরু হতে দেরি নেই। সাবধানে নোটটা বের করে খুলল সে। লেখা আছে:

আজ রাতে ডেভিলস হিলে আলোর সন্ধান কোরো। পোড়োবাড়ির পাশের খাদে লুকিয়ে থাকবে। রাত্র বারোটায়। কাল আমাকে জানাবে।

পাঁচ

বাকি দিনটা ভয়ানক উত্তেজনার মধ্যে কাটাল বব।

ব্যাপারটা তার চাচার দৃষ্টি এড়াল না। জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে? অমন করছিস কেন?'

'না, কিছু না, চাচা,' বলে ওখান থেকে সরে গেল বব।

ডেভিলস হিল চেনে সে, কিন্তু পোড়োবাড়িটা কোথায় জানে না। তার চাচা নিশ্চয় চেনে, কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস করা যাবে না কোনমতেই। করলেই হাজারটা প্রশ্ন।

সুতরাং বুকশেলফ থেকে একটা ম্যাপ বই বের করে নিয়ে বসল। গ্রীনহিলসের ম্যাপে পাহাড়টা বের করতে সময় লাগল না। পোড়োবাড়িটাও পাওয়া গেল। একটা নালার ধার ধরে এগোলেই পাওয়া যাবে বাড়িটা। কোন পথে কি ভাবে যেতে হবে পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে রাখল ম্যাপে। রাতের বেলা জঙলা জায়গায় বাড়ির পাশের খাদে লুকিয়ে বসার কথা ভাবতেও রোমাঞ্চ হলো।

ঘরে ঢুকল ফগ। ভাতিজাকে গভীর মনোযোগে ম্যাপ দেখতে দেখে তীক্ষ্ণ হলো দৃষ্টি। 'কি দেখছিস?'

চাচা কখন ঘরে ঢুকেছে খেয়াল করেনি বব। চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি বইটা বন্ধ করে বলল, 'অনেক জায়গাই চিনি না তো, এলাকার একটা ম্যাপ দেখছিলাম!' বইটা শেলফে রেখে উঠে দাঁড়াল। পকেটে হাত দিয়ে স্পর্শ করল কিশোরের নোটটা। কোনমতেই দেখানো যাবে না এটা চাচাকে। মনে মনে কিশোরের বুদ্ধির প্রশংসা করল। সাংঘাতিক চালাক। কি সুন্দর চাচার নাকের কাছে দিয়ে পাচার করে গেল নোটটা।

ববের আচরণেই সন্দেহ করে বসল ফগ, কিছু একটা ঘটছে। চুপ করে রইল। ববকে সতর্ক করে দিলে কি ঘটছে সেটা জানতে পারবে না। একটা কাজ দিয়ে তাকে রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিল। ম্যাপ বইটা বের করে খুলল। চোখে পড়ল নালার পাশে পেন্সিলের দাগ, পোড়োবাড়ির কাছে চলে গেছে।

'ঝামেলা!' বিড়বিড় করে আনমনে মাথা ঝাঁকাল ফগ। 'ওখানেই তাহলে ঘটছে কিছু!' মনে পড়ল ববের কথা, কিশোর বলেছে–আজব আলো দেখা যায় ডেভিলস হিলে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, সেদিন রাতেই পাহাড়ে যাবে ওই রহস্যময় আলোর রহস্য ভেদ করার জন্যে।

সে-রাতে শয়তানের পাহাড়ে যাওয়ার জন্যে আরও অনেক লোক তৈরি হচ্ছে। তাদের মধ্যে কিশোর গোয়েন্দারাও রয়েছে। এত রাতে ফারিহাকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না, তাই ঘরে থাকতে বলা হলো তাকে। থাকার কোন ইচ্ছেই নেই ওর, খালাম্মার বকার ভয়ে বাধ্য হয়েই থাকল।

টিটুকেও নেয়া হবে না। সে ঘরে থাকবে। বেঁধে রেখে এসেছে তাকে কিশোর।

একটা করে টর্চ নিল তিন গোয়েন্দা। আর নিল লাল, নীল আর সবুজ রঙের অয়েল পেপারের মত কাগজ, লজেন্সের মোড়ক হয় সেগুলো দিয়ে। টর্চের সামনে এই কাগজ ধরে রঙিন আলো তৈরি করবে ববকে ভয় দেখানোর জন্যে।

রাতের খাওয়া সেরে ববও তাকে তাকে রইল চাচার ঘুমানোর অপেক্ষায়।

কিন্তু চাচাও আর ঘুমায় না। বিছানায় কেবলই গড়াগড়ি করছে বব। এ ভাবে বেশি নড়াচড়া করলে চাচার সন্দেহ হতে পারে। তাই শেষে ঘুমের ভান করে চুপ করে রইল।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ কাপড় পরে টর্চ হাতে বেরিয়ে গেল ফগ।

বব সেটা জানতে পারল না। কোন রকম সাড়াশব্দ না পেয়ে সে ভাবল তার চাচা ঘুমিয়ে পড়েছে। নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমে কাপড় পরল সে। একটা টর্চ হাতে নিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

কিশোররা ততক্ষণে পাহাড়ে পৌঁছে গেছে।

পোড়োবাড়ির পাশে ঝোপে লুকিয়ে বসল কিশোর। মুসা আর রবিন বসেছে বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে আলাদা আলাদা ঝোপে। কয়েক মিনিট পর পর পোড়োবাড়ি, অর্থাৎ কিশোরের দিকে তাক করে আলো জ্বালানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে ওদের।

নির্জন পাহাড়। শীতের রাত। জনমানুষের চিহ্নও নেই পাহাড়ে, কেবল ওরা তিনজন বাদে। শাঁই শাঁই শব্দে পাতায় পাতায় শিহরণ তুলে বয়ে যাচ্ছে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। গরম কাপড় ভেদ করে হাড়ে ঢুকে যেতে চাইছে।

পাহাড়ে উঠে রহস্যময় কিছু না দেখে বিরক্ত হয়ে গেল ফগ। ভাবল—কি পোলাপানের কথায় এই শীতের মধ্যে মরতে এলাম! তারচেয়ে লেপের নিচে শুয়ে থাকা ভাল ছিল। ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে গরম কফি খাওয়া, সে তো আরও আরামের। ফিরে যাবে ভাবছে, ঠিক এই সময় তার সামনেই কিছুদূরে আলো জ্বলে উঠল।

আরে, ঠিকই তো বলেছে বিচ্ছু ছেলেটা! কিছু একটা ঘটছে ডেভিলস হিলে! চট করে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল ফগ। দম বন্ধ করে তাকিয়ে রইল সামনের দিকে।

আবার জ্বলল লাল আলো।

খানিক পর পাশে একটু দূরে ঢালের নিচে জ্বলল সবুজ আলো। তারপর ঢালের ওপর দিকে নীল আলো।

এ ভাবে আলোর সঙ্কেত দিতে খুব মজা পাচ্ছে রবিন আর মুসা। ভাবছে, ববটা কি এসেছে? এলে এই আলো দেখে কি করবে?

আনন্দ কিশোরেরও লাগছে।

হঠাৎ একটা ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ কানে এল। কাছেই। তবে কি বব? কে আলো জ্বালে দেখার জন্যে আসছে?

ধরা পড়ার ভয়ে আলো জ্বালানো বন্ধ করে দিল কিশোর।

ফগ ভাবছে, আলো জ্বেলে একে অন্যকে সঙ্কেত দিচ্ছে লোকগুলো। কোন ধরনের কোড ব্যবহার করছে। তিনজন আছে ওরা।

অনেকক্ষণ ধরে আর আলো জ্বলল না। একভাবে বসে থেকে থেকে পা ব্যথা হয়ে গেল ফগের। আড়ষ্ট পেশীকে সহজ করার জন্যে পা নড়াতে গিয়ে শুকনো ডালে পা দিয়ে ফেলল। মট করে ভাঙল সরু ডাল।

বিশ মিনিট ধরে কিশোরের সাড়া না পেয়ে মুসা এবং রবিন মনে করল—কাজ শেষ, বাড়ি রওনা হয়ে গেছে সে। ওদের ওপর নির্দেশ আছে, একবার জ্বলার পর বেশিক্ষণ আলো আর না জ্বললে বুঝতে হবে, আর জ্বালানোর দরকার নেই। বাড়ি যেতে হবে। সবাই একসঙ্গে দল বেঁধে যাওয়া ঠিক হবে না, ববের চোখে পড়ে যেতে পারে।

উঠে পড়ল দু-জনে। যার যার মত বাড়ির পথ ধরল।

ওদের ধারণা ঠিক নয়। কিশোর আগের জায়গাতেই বসে আছে। নিঃশ্বাসের শব্দ সন্দেহ জাগিয়েছিল তার, ডাল ভাঙার শব্দ নিশ্চিত করে দিল খাদের মধ্যে ঝোপের ভেতর কেউ লুকিয়ে আছে। ববই হবে। ও ছাড়া এত রাতে এখানে আর কে আসবে?

আলো জ্বালানোর ঝুঁকি আর নেয়া যাবে না। ধরা পড়ে যেতে পারে। বসে থেকেও লাভ নেই। ববকে আলো যা দেখানোর দেখানো হয়েছে। রবিন আর মুসাও অনেকক্ষণ আলো দেখেনি। সুতরাং কথামত ওরাও নিশ্চয় বাড়ি রওনা হয়ে গেছে।

আস্তে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। খাদে নামল। ঠিক কোন্ ঝোপটা থেকে শব্দ হয়েছে বুঝতে পারেনি। অন্ধকারে দেখাও যাচ্ছে না তেমন কিছু। তারার আলোয় আবছা ভাবে চকচক করছে নালার পানি। নালার ধার ধরে এগোল সে।

ছায়ামূর্তিটা খাদে নামতেই ফগের চোখে পড়ে গেল। মুচকি হাসল সে। ভাবল, চোর-ছ্যাচড় হবে। মূর্তিটাকে তার সামনে দিয়ে পেরোতে দিল। তারপর দিল লাফ। পেছন থেকে জাপটে ধরতে গেল।

পেছনে ডাল নড়ার শব্দে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। ধরতে আসছে একটা লোক। বব যে নয়, অন্ধকারেও বুঝতে পারল। দৌড় দিতে গেল সে।

থাবা দিয়ে তার কোট চেপে ধরল ফগ। চেঁচিয়ে বলল, 'ঝামেলা! কে হে তুমি?'

এটা আশা করেনি কিশোর। ফগ এখানে এল কি ভাবে বুঝতে পারল না। বোঝার চেষ্টাও করল না। এক ঝাড়ায় কোট ছুটিয়ে নিয়ে দিল দৌড়।

পেছনে চিৎকার করতে করতে দৌড়ে আসতে লাগল ফগ। ধস্তাধস্তিতে তার টর্চটা মাটিতে পড়ে বাল্ব ভেঙে গেছে। ফলে জ্বালতেও পারল না, কিশোরের চেহারাও দেখতে পেল না। অন্ধকারে ছুটতে গিয়ে গাছের শেকড়ে পা লেগে ধুড়ুম করে পড়ল উপুড় হয়ে।

ফিরেও তাকাল না কিশোর। আরও জোরে দৌড়াতে লাগল। ফগের হাতে

পড়া চলবে না কিছুতে।

ছুটতে ছুটতে অবাক হয়ে ভাবছে কিশোর, ববটা গেল কোথায়?

ছয়

ডেভিলস হিলে নালার অভাব নেই। পথ ভুল করে অন্য নালা ধরে বব চলে গেছে আরেক দিকে। অজানা কারও নজরে পড়ে যাওয়ার ভয়ে টর্চ জ্বালতে সাহস করেনি। সুতরাং অনেক পথ এগিয়েও কোন পোড়োবাড়ি তার চোখে পড়ল না।

সামনে পাহাড়ের ঢাল শুরু হয়েছে একপাশ থেকে। তার নিচে ঢাল। আর এগোনোর মানে হয় না। তাই ওখানেই একটা ঢিবির ওপর বসে হাঁপাতে লাগল সে। অন্ধকারে চোখ মেলে রইল রহস্যময় আলোর আশায়, যদিও আশাটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে এখন। জায়গামত না পৌছতে পারলে আলো দেখতে না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

তবে আলো সে দেখতে পেল ঠিকই। বেশ কিছুটা দূরে হঠাৎ করে জ্বলে উঠেই কমে যেতে শুরু করল।

তারপর শোনা গেল শব্দ। কান পেতে রইল সে। এগিয়ে আসছে। গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ চিনতে ভুল হলো না। চোখে পড়ছে না ওটা। হেডলাইটের আলোও দেখা যাচ্ছে না। কেন? পাহাড়ের নিচের কোন দেয়াল আড়াল করে রেখেছে? নাকি আলো জ্বালেইনি?

অনেক বেড়ে গেল ইঞ্জিনের শব্দ, তারপর কমতে লাগল। দূরে সরে যাচ্ছে।

উঠে দাঁড়াল বব। গাড়িটা দেখার চেষ্টা করল। দেখল না। ঢিবি থেকে নেমে নালার ধার ধরে আরও খানিকটা এগিয়ে দেখার জন্যে হাঁটতে শুরু করল। সাবধান রইল। হাটার সময় শব্দ করল না, টর্চ জ্বালল না।

কিছুদূর এগোতে পায়ের শব্দ কানে এল।

একজোড়া? না না, দুই! তিনজোড়াও হতে পারে!

অন্ধকারে মৃদু স্বরে কথা শোনা গেল, 'গুড নাইট, ডোনার। পরে দেখা হবে।'

জবাবে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল অন্য একজন।

তারপর আর কোন কথা নেই। দু-দিকে চলে গেল পায়ের শব্দ। পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছে লোকগুলো।

কেঁপে উঠল বব। শীতও লাগছে, উত্তেজনাও আছে। নিশ্চয় এ রহস্যটার কথাই বলেছে কিশোর। সে আসবে কিনা চাচা শুনে ফেলার ভয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেনি। তবে এখনও যখন আসেনি, আর বোধহয় আসবে না।

ফিরে চলল বব। একটা ব্রিজ পেরিয়ে অন্যপাশে নেমে দ্রুতপায়ে হাঁটা শুরু করল। এক রাতের জন্যে অনেক হয়েছে। বাড়ি ফিরে এখন চাচাকে বিছানায় পেলেই হয়। জেগে উঠে তাকে ঘরে না দেখলে কপালে দুঃখ আছে।

বাড়ি ফিরে নিশ্চিন্ত হলো বব। বিছানায়ই আছে চাচা। লেপের নিচে নাক ডাকাচ্ছে। পা টিপে টিপে নিজের ঘরে এসে কাপড় ছেড়ে বিছানায় উঠল।

সে-রাতে ববের ঘুম আসতে অনেক দেরি হলো।

পরদিন সকালে মধ্যরাতের অভিযানের কথা কেউ কাউকে বলল না চাচা-ভাতিজা। আছাড় খেয়ে ধারাল পাথরে লেগে গাল কেটে গেছে ফগের। ঝোপের কাঁটাওয়ালা ডালে লেগে কপালে ছড়ে গেছে ববের। দুটো জখমই স্পষ্ট। কিন্তু এ নিয়ে কেউ কাউকে প্রশ্ন করল না। ক্লান্ত দেখাচ্ছে দু-জনকেই।

ফগের ধারণা, রহস্যটার ব্যাপারে আরও কিছু জানে কিশোর। তার কাছে মুখ খুলবে না কিছুতে, তবে ববের কাছে খুলতে পারে। তাকে পাঠানো দরকার। সরাসরি যেতে বললে সন্দেহ করে বসতে পারে, তাই চালাকি করে বলল, 'আজ তোর যেখানে ইচ্ছে যেতে পারিস। বাধা দেব না। তবে কথা দিতে হবে, কোন রকম দুষ্টামি করবি না।'

'করব না,' বলতে দেরি করল না বব। নাস্তা সেরেই বেরিয়ে পড়ল। কিশোরদের বাড়ি এসে তাকে পেল না। মেরিচাচীর কাছে জানতে পারল, সে মুসাদের বাড়িতে গেছে।

ছাউনিতে পাওয়া গেল গোয়েন্দাদের সবাইকে। আড্ডা দিচ্ছে। গতরাতের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছিল ওরা, ববকে দেখে থেমে গেল।

হাত নেড়ে ডাকল কিশোর, 'এই যে, বব, এসো, এসো। কাল রাতে যাওনি কেন? ঘুমিয়ে পড়েছিলে?'

'কে বলল যাইনি? গেছি তো। ভুল করে আরেক রাস্তা ধরে চলে গিয়েছিলাম। তাই পোড়োবাড়িটা খুঁজে পাইনি। তবে আলো দেখেছি ঠিকই।'

'আলো দেখেছ?' অবাক হলো মুসা। বুঝতে পারল না পোড়োবাড়ির কাছে না গেলে বব আলো দেখে কি করে! 'বলো তো কি রঙের?'

'কি রঙের মানে? আলো যে রঙের হয়।'

'ও বলতে চাইছে রঙিন ছিল কিনা,' রবিনও অবাক হলো। 'এই যেমন লাল, নীল, সবুজ?'

মাথা নাড়ল বব, 'নাহ্, স্বাভাবিক আলো বলেই মনে হলো।'

ব্যাপারটা কিশোরকেও অবাক করল। 'ডেভিলস হিলে যে যাবে এ কথা তোমার চাচাকে বলেছিলে?'

'না তো। চাচা সেই সন্ধে থেকে ঘুমাচ্ছিল।'

'তোমার মাথা, গাধা কোথাকার! কাল রাতে সে-ও গিয়েছিল পাহাড়ে। তুমি জানো না।'

'অসম্ভব! যেতেই পারে না!'

'আমি নিজে দেখেছি। অমাবস্যার অন্ধকারেও তোমার চাচার গলা শুনেই শুধু চিনতে পারব আমি।'

'কি বলো! সে ঘুমিয়ে পড়লে তবেই তো বেরিয়েছি আমি। অনেক রাতে ফিরে এসেও দেখি নাক ডাকাচ্ছে।'

'বেরোনোর আগে তার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখেছিলে বিছানায় আছে কিনা?'

'না। দরজা লাগানো ছিল।'

'নাক ডাকার শব্দ শুনেছ?'

থমকে গেল বব। চোখ বড় বড় করে ফেলল। 'না তো!'

'গলদটা এইখানেই। তোমাকে ফাঁকি দিয়েছে সে। চুপচাপ বেরিয়ে গেছে, যাতে তুমি টের না পাও। ফিরেও এসেছে তোমার আগে। কিন্তু জানল কি করে?'

'আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না!'

'তুমি তাকে এমন কিছু বলে ফেলোনি তো যাতে সন্দেহ করতে পারে?'

'না,' আবার মাথা নাড়ল বব।

'হুঁ। কিন্তু গেল কেন তাহলে? জানল কি করে পোড়োবাড়ির কাছে কাল রাতে কিছু একটা ঘটবে? জেনেছে যে তাতে কোন সন্দেহ নেই, নইলে ঝোপে লুকিয়ে বসে থাকত না।'

'বব, কিশোর যে নোটটা দিয়েছে তোমাকে, সেটা দেখে ফেলেনি তো তোমার চাচা?' জিজ্ঞেস করল ফারিহা।

'না। তবে একটা ব্যাপার হতে পারে। আমি ম্যাপ যখন দেখছিলাম, চুপচাপ পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল চাচা। পেন্সিল দিয়ে যে দাগ দিয়েছি, হয়তো দেখে ফেলেছে।'

মুখ কালো করে ফেলল কিশোর। 'তাই ঘটেছে! অসতর্ক হলে গোয়েন্দাগিরি করতে পারবে না। যাকগে, প্রথম প্রথম এমন ভুল হয়ই। তা কাল রাতে কি কি দেখলে?'

'ওই তো, ভুল নালা ধরে চলে গিয়েছিলাম অনেক দূর। নিচে দেখি খেত। তারপর আর না এগিয়ে একটা টিবিতে উঠে বসলাম। খানিক পর দেখি আলো। তারপর গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। কারা এসেছে দেখার জন্যে এগিয়ে গেলাম। লোকগুলোকে দেখতে পেলাম না। তবে তাদের পায়ের শব্দ শুনেছি। একজনের নামও জেনেছি, ডোনার। গুড নাইট বলার সময় নাম ধরে তাকে সম্বোধন করল অন্য লোকটা।'

এইটা গোয়েন্দাদের কাছে একটা খবর বটে। আগ্রহ নিয়ে শুনছে সবাই।

'তারপর?' জানতে চাইল কিশোর।

'তারপর আর কিছু ঘটেনি। আমিও বাড়ি ফিরে এলাম।'

'এ সব কথা তোমার চাচাকে বলেছ?'

'মাথা খারাপ! বললে রাতে না বলে বেরোনোর জন্যে পিটুনি খেতে হত। কথায় কথায় মারে। এই দেখো না, নোটবুকটা রাখতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলাম– চড় মেরে কান লাল করে দিয়েছে।'

'দেখিয়ে আর লাভ কি? যে রকম কাজ করেছ, তার সাজা পেয়েছ। তবে তোমার চাচাও খুব বদমেজাজী, এটাও ঠিক।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল বব। নাক চুলকাল। তারপর বলল, 'রহস্যটা নিশ্চয় খুব জটিল। নইলে অত রাতে পাহাড়ে যেত না চাচা।'

'কি জানি, কিছু তো বুঝতে পারছি না!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। গভীর রাতে গাড়িতে করে পাহাড়ে-লোকের আনাগোনা ভাবনায় ফেলে দিয়েছে তাকে। ঘটনাটা রহস্যময়। 'এক কাজ করতে পারো অবশ্য।'

'কি কাজ?' বকের মত সামনে গলা বাড়িয়ে দিল বব।

'দিনের বেলা আরেকবার পাহাড়ের ওখানটায় গিয়ে সূত্র খুঁজতে পারো। তদন্ত করতে হলে সূত্র চাই।'

'কি ধরনের সূত্র?' উত্তেজনায় চোখ বড় বড় হয়ে গেছে ববের।

মুচকি হাসল কিশোর। 'এই পোড়া সিগারেটের গোড়া, বোতাম, পায়ের ছাপ, এ সব আরকি। সত্যিকারের গোয়েন্দারা অপরাধের এলাকায় যে সব জিনিসের খোঁজ করে।'

'আজই যাব,' তুড়ি বাজাল বব। 'বিকেল তিনটেয়। খেয়েদেয়ে চাচা তখন নাক ডাকায়। কিছু পেলে এনে তোমাদের দেখাব। উঠি এখন।'

সাত

বব বেরিয়ে যেতেই কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'কি বুঝলে, কিশোর?'

'ব্যাপারটা রহস্যময়। মাঝরাতে পাহাড়ের ভেতর ওরকম একটা জায়গায় গাড়ি যাওয়াটাই অস্বাভাবিক। তার ওপর আলো নিভিয়ে।'

'আমরা যে অত রাতে গেছি, হয়তো কারও নজরে পড়েছে। তাই কি করতে গেছি দেখতে গেছে।'

'আমার তা মনে হয় না,' একমত হতে পারল না মুসা।

'তাহলে রহস্য ধরে নিতে পারি এটাকে,' রবিন বলল। 'নালার ধার ধরে গিয়ে দেখব নাকি কিছু আছে কিনা?'

'ববের সঙ্গে?' ফারিহার প্রশ্ন, 'সূত্র খুঁজতে যাব?' কিশোরের দিকে তাকাল সে।

'কি করব বুঝতে পারছি না। ববের ওপর ভরসা রাখা যায় না। ধমক দিলেই হয়তো তার চাচাকে সব বলে দেবে। ফগ জেনে গেছে, ডেভিলস হিলে কিছু একটা ঘটছে। জানার জন্যে ভাতিজাকে চাপ দিতেই পারে।'

'কি করবে তাহলে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'এক কাজ করতে পারি। কিছু আলতু-ফালতু সূত্র রেখে এসে চাচা-ভাতিজা দু-জনকেই বিপথে চালিত করতে পারি। সত্যি সত্যি কোন রহস্য থেকে থাকলে আর সেটার তদন্ত আমাদের করতে হলে আগে ওই দু-জনকে ঘাড় থেকে সরাতে হবে।'

'ঠিক বলেছ!' লাফিয়ে উঠল ফারিহা। 'তাই করব!'

তিনটের অনেক আগেই ডেভিলস হিলে যাওয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়ল ওরা। চমৎকার রোদেলা দিন। তবে খুব ঠাণ্ডা। পাহাড়ে ওঠার পরিশ্রম করতে গিয়ে অবশ্য শরীর গরম হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

একটা খাদের কাছে এসে কিশোর বলল, 'কাল রাতে এখানেই ছিল ফগ।'

'তাহলে এখানেই একটা রাখা যাক,' মাটিতে একটা বোতাম ফেলে দিল রবিন। গ্যারেজে ফেলে রাখা অনেক দিনের পুরানো কোট থেকে খুলে এনেছে। 'ফগ ভাববে ধস্তাধস্তিতে এটা ছিঁড়ে পড়ে গেছে।'

সামান্য সরে গিয়ে মুসা ফেলল একটুকরো কাগজ। একটা টেলিফোন নম্বর লেখা রয়েছে।

'কার নম্বর?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কারও না। কলমের মাথায় যা এসেছে লিখে দিয়েছি।'

'আঙুলের ছাপ লেগে যায়নি তো?'

'না। হাতে হাতমোজা পরে নিয়েছি।'

'বাহ্, বুদ্ধি খুলে যাচ্ছে।'

কিশোর ফেলল একটা সিগারেটের পোড়া টুকরো। চাচার অ্যাশট্রে থেকে তুলে এনেছে।

ফারিহা ফেলল একটা পুরানো রুমাল। এক কোণে ক লেখা। কার রুমাল জানে না। ক দিয়ে কার নামের শুরু, তা-ও বলতে পারবে না।

'দারুণ সব সূত্র,' বলল সে। 'ববের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারলে আনন্দে ডগমগ হয়ে যাবে তার চাচা। কিন্তু জিনিসগুলো জায়গামত থাকবে তো?'

'থাকবে,' কিশোর বলল। 'বাতাস নেই যে উড়িয়ে নেবে। বৃষ্টিও নেই। নষ্ট হবে না।'

'চলো, কেটে পড়ি,' রবিন বলল। 'বব চলে আসতে পারে।'

পাহাড়ের গোড়ায় দেখা হয়ে গেল ফগের সঙ্গে। সাইকেল নিয়ে চলেছে। চোখমুখ থমথমে। সবে শুয়েছিল, এই সময় একজন ফোন করে জানাল তার কুকুরটা হারিয়ে গেছে। 'জাহান্নামে যাও!' বলে দিতে ইচ্ছে করছিল ফগের। কিন্তু লোকটা যদি ক্যাপ্টেনের কাছে নালিশ করে, এই ভয়ে পারেনি। ছেলেমেয়েদের দেখে তাদের ওপর ঝালটা ঝাড়ার চেষ্টা করল, 'ঝামেলা! তোমরা এখানে কি করছ?'

'কেন, এখানে আসতে কারও মানা নাকি?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।

ফগকে দেখেই নাচতে নাচতে তার পায়ের কাছে চলে গেল টিটু। ঘুরতে শুরু করল গোড়ালির চারপাশে। কামড় বসানোর সুযোগ খুঁজছে।

'এই, কুত্তা সরাও!' ধমক দিয়ে বলল ফগ। লাথি মারতে গেল কুকুরটাকে।

টিটুও মহা ধড়িবাজ। লাফ দিয়ে সরে গেল।

'জলদি ভাগো এখান থেকে!' একটা চোখ কুকুরটার ওপর রেখে বলল ফগ। 'ডেভিলস হিলের কাছে আসবে না আর। ঝামেলা করবে না।'

'কেন, কিছু ঘটেছে নাকি?' নিরীহ ভঙ্গিতে বলল কিশোর। তার এই ভঙ্গিটা পিত্তি জ্বালিয়ে দেয় ফগের। এটা জানে বলেই আরও বেশি করে ওরকম করে কিশোর।

'ঝামেলা! যাও, ভাগো বলছি! নইলে রিপোর্ট করব!'

'কিসের অপরাধে, মিস্টার ফগ?' হেসে জিজ্ঞেস করল মুসা।

চড়িয়ে মুসার দাঁত ফেলে দেয়ার জন্যে হাত নিশপিশ করে উঠল ফগের। কিন্তু সে চেষ্টা করতে গেলে ভয়ানক বিপদে পড়বে। অগত্যা শুধু ধমক দিয়েই কাজ সারতে হলো, 'যাও, ভাগো!'

রেগে গেল টিটু। খেঁক খেঁক করে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফগের পায়ের ওপর।

আর থাকার সাহস পেল না পুলিশ কনস্টেবল। তাড়াতাড়ি সাইকেলে চেপে নিজেই 'ভেগে' পড়ল।

কয়েক মিনিট পর ববকে আসতে দেখা গেল ওই পথে।

কিশোর বলল, 'পাহাড়ে যাচ্ছ? সাবধান থাকবে, তোমার চাচার মেজাজ সাংঘাতিক খারাপ। দেখতে পেলে আস্ত রাখবে না।'

'থাকব,' কথা দিয়ে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল বব।

আট

দিনের আলোতে আসল নালাটা চিনতে ভুল করল না বব। পোড়োবাড়িটা দেখতে পেল। খাদের কাছে এসে তো মহাখুশি। মাটিতে পড়ে থাকা সূত্রের অভাব নেই। কুড়িয়ে নেয়ার মত যা যা পেল, সব তুলে নিয়ে পকেটে ভরতে লাগল।

সূর্য ডোবার আগে পর্যন্ত সূত্র খুঁজে বেড়াল সে। সন্ধ্যার আগে আগে বাড়ি ফিরে চলল। আরও খোঁজার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অন্ধকার হয়ে গেলে কিছু দেখতে পাবে না। সুতরাং তখন থেকেও লাভ নেই। তা ছাড়া দেরি করে বাড়ি ফিরলে চাচার পিটুনি খেতে হতে পারে।

বাড়ি এসে দেখল চাচা তখনও ফেরেনি। পকেট থেকে সূত্রগুলো সব বের করে টেবিলে রাখল। নোটবুকে নম্বর দিয়ে দিয়ে লিখল:

১। একটুকরো ছেঁড়া কম্বল
২। একটা বাদামী বোতাম
৩। একটা ছেঁড়া জুতোর ফিতে—লাল রঙ
৪। একটা দামী সিগারেটের গোড়া
৫। একটা খালি সিগারেটের প্যাকেট
৬। মরচে পড়া একটা টিনের কৌটা
৭। টেলিফোন নম্বর লেখা একটুকরো কাগজ
৮। এককোণে K লেখা একটা পুরানো রুমাল
৯। একটা পোড়া দিয়াশলাইয়ের কাঠি
১০। খুব ছোট একটা পেন্সিল, গোড়ায় লেখা E. H.

লেখা শেষ করে, পেন্সিলের গোড়া কামড়াতে কামড়াতে বেশ বিজ্ঞের ভঙ্গিতে সেটা আবার পড়তে লাগল সে। নিজেকে খুব বড় গোয়েন্দা মনে হচ্ছে।

বাইরে সাইকেলের ঘণ্টা বাজার শব্দ হলো। চাচা এসেছে। তাড়াতাড়ি নোটবুক আর সূত্রগুলো লুকিয়ে ফেলল বব। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

ঘরে ঢুকেই টেবিলের দিকে তাকাল ফগ। শূন্য টেবিল। জিজ্ঞেস করল, 'কি করছিলি?'

'কিছু না, চাচা।'

'জানালা দিয়ে দেখলাম বসে আছিস। খালি টেবিলের সামনে বসে ছিলি?'

'ছিলাম।'

'বিকেলে কোথায় গিয়েছিলি?'
'হাঁটতে।'
'কোথায়? ওই শয়তান ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে?'
'না। একা।'
সন্দেহ বাড়ছে ফগের। 'কোথায় গিয়েছিলি?'
'ডেভিলস হিলে। দারুণ জায়গা, চাচা।'
আর্মচেয়ারে বসে পড়ল ফগ। কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল ববের দিকে। বলল, 'দেখ, পুলিশের চাকরি করে করে চুল পাকিয়ে ফেলেছি। মিথ্যে বললে বুঝতে পারি। ওই বিচ্ছুগুলোর সঙ্গে তোর যোগাযোগ আছে। কিছু একটা করছিস তোরা। কি করছিস, সত্যি কথাটা জানতে চাই।'
চাচার চোখের দিকে তাকাতে পারল না বব। চুপ করে রইল।
'সেদিন বললি ডেভিলস হিলে রাতের বেলা রহস্যময় আলো দেখা যায়। বলিসনি?'
'বলেছি।'
'তাহলে সত্যি করে বল এখন, আর কি কি ঘটেছে?'
'কি-কি-কিছু ঘটেনি, চাচা!'
উঠে দাঁড়াল ফগ। আলমারির পেছন থেকে একটা লিকলিকে বেত বের করে আনল। ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে দোলাতে দোলাতে এগিয়ে এল। বলল, 'হ্যাঁ, এবার বল!'
ভয়ে নীল হয়ে গেল ববের চেহারা। বেত পড়ার আগেই কাঁদতে শুরু করল।
'কেঁদে কোন লাভ হবে না,' ফগ বলল। 'আসল কথা শুনতে চাই।'
ফোঁপাতে ফোঁপাতে বব বলল, 'আমি কি করব! কিশোর বলল, দুটো দল আছে পাহাড়ে। একটা ডাকাতদের, আরেকটা কিডন্যাপারদের।'
অবাক হয়ে গেল ফগ। চোখে অবিশ্বাস। এটা তার কাছে খবর বটে। 'তারপর?'
'আমাকে বলল, ডেভিলস হিলে নাকি আলোও দেখা যায়। কিন্তু আমি ওখানে তেমন কোন আলো দেখিনি, চাচা, কসম!'
চিন্তিত ভঙ্গিতে ববের দিকে তাকিয়ে রইল ফগ। ছেলেটার মাথায় এ সব কথা নিশ্চয় কিশোরই ঢুকিয়েছে। ববকে অবাক করে দিয়ে হাসল তার চাচা। বেতটা রেখে দিয়ে কাঁধ চাপড়ে দিতে দিতে কণ্ঠস্বর নরম করে বলল, 'শুরুতেই যদি সব বলে দিতি, তাহলে আর এ সব করতে হত না আমাকে। শোন, এখন থেকে কিশোররা কি করে না করে, কি বলে, সব এসে আমাকে জানাবি। কোন কথা গোপন করবি না। আমরা চাচা-ভাতিজায় মিলে রহস্যটার সমাধান করে ফেলব। আমি জানি, তুই খুব ভাল ছেলে। নিশ্চয় আমাকে সাহায্য করবি।'
চাচার এই হঠাৎ পরিবর্তন অবাক করল ববকে। তার কথা বিশ্বাস করতে পারল না। তবে আপাতত মার খেতে হলো না বলে হাঁপ ছাড়ল।
'বোস ওখানে,' কোমল গলায় বলল ফগ। 'আর কিছু বলবি আমাকে?'
'না,' মাথা নাড়ল বব। পকেট থেকে রুমাল বের করার সময় সূত্রগুলো ঠেকল হাতে। চাচা এগুলো দেখে ফেললে কি ঘটবে ভাবতে চাইল না সে। রুমাল

দিয়ে চোখ মোছার ছুতোয় তাড়াতাড়ি মুখ ঢেকে ফেলল, যাতে তার মুখ দেখে কিছু সন্দেহ করতে না পারে ফগ।

আর্মচেয়ারে বসে সিগারেট ধরাতে ধরাতে ফগ জিজ্ঞেস করল, 'আজ বিকেলে ডেভিলস হিলে গিয়েছিলি কেন?'

'বললামই তো, বেড়ানোর জন্যে,' ভোঁতা গলায় জবাব দিল বব। ইস্, এই জেরা যে কখন বন্ধ হবে!

বব যত চালাকিই করুক, ফগ তার চেয়ে চালাক। বুঝল, এ ভাবে চাপাচাপি করে সব কথা আদায় করতে পারবে না। তার সন্দেহ, শুধু শুধু টেবিলের সামনে বসে থাকেনি বব, কিছু একটা করছিল। নোটবুকে কিছু লিখছিল। ভাবল, থাক, এখন আর কিছু বলব না। ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ুক, তারপর তার নোটবুকটা দেখব।

ববকে আর কোন প্রশ্ন না করে খবরের কাগজটা নিয়ে তাতে মন দিল ফগ।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল বব। ঘড়ি দেখল। মাত্র সন্ধ্যা। বিছানায় যাবার এখনও অনেক দেরি। উসখুস করে চাচাকে বলেই ফেলল, 'চাচা, আমি একটু বেরোই? কিশোরদের ওখানে যাব। রহস্যটা নিয়ে আলোচনা করব ওদের সঙ্গে। নতুন কোন খবর দিতে পারে। যাব?'

'যেতে দিতে পারি, এক শর্তে। ওখানে যা যা কথা হবে, সব আমাকে বলতে হবে।'

'আচ্ছা, বলব।'

চাচার মতের কোন ঠিকঠিকানা নেই। কখন আবার আটকে দেয়, এই ভয়ে একটা মুহূর্ত দেরি করল না বব। কোট আর টুপিটা হাতে নিয়েই বেরিয়ে পড়ল।

নয়

ছাউনিতেই পাওয়া গেল গোয়েন্দাদের।

হুড়মুড় করে ঢুকল উত্তেজিত বব। বলল, 'অনেক সূত্র পেয়েছি! দশটা! দেখবে? দেখো!'

এক এক করে পকেট থেকে জিনিসগুলো বের করে রাখল সে।

ওর ফেলে আসা রুমালটা দেখে ফিক করে হেসে ফেলল ফারিহা। চোখ গরম করে তার দিকে তাকাল মুসা। ইঙ্গিতে চুপ থাকতে বলল।

উত্তেজনায় অতটা খেয়াল করল না বব। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাংঘাতিক সব সূত্র, তাই না? কাজ হবে এগুলো দিয়ে?'

'হতে পারে,' আরেক দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। জোর করে দমন করছে হাসি।

'কিন্তু একটা ভজকট হয়ে গেছে,' করুণ সুরে বলল বব।

'কি?'

'চাচাকে সব কথা বলে দিতে হয়েছে। কি জানি কেন সন্দেহ হলো চাচার। জেরা শুরু করল। বলতে চাইনি, কিন্তু একটা বেত বের করে আনল। না বললে

আজ পিঠের ছাল তুলে ফেলত। কি করব? বলে দিয়েছি।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল কিশোর। তারপর ববকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'থাক, অত মন খারাপ করার কিছু নেই। শুধু ফগর‍্যাম্পারকটই একটা ভয়াবহ জিনিস। তার ওপর যুক্ত হয়েছে বেত। হাতে পেয়েছে তোমার মত অসহায় একজন ভাতিজাকে। পরিস্থিতি কি হয়েছিল বুঝতেই পারছি।'

বব ভেবেছিল, তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে সবাই। কিন্তু কেউই কিছু বলল না, তার ওপর কিশোরের এই নরম আচরণে আশ্বস্ত হলো সে, উজ্জ্বল হলো মুখ। বলল, 'চাচা আমাকে কি ফন্দি করতে বলেছে জানো? বলেছে, স্পাইগিরি করতে। তোমাদের কাছে সব জেনে নিয়ে গিয়ে তাকে বলে দিতে। বলল, আমরা দু-জনে মিলে রহস্যটার সমাধান করব, বাহবা নেব ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে। কিন্তু আমি ঠিক করেছি, তাকে কিছুই বলব না। এই যে দেখো না, সূত্রগুলোর কথাই বলিনি। গোপন করে গেছি। আমি চাই, তোমরাই রহস্যটার সমাধান করো। বাহবা যদি কাউকে পেতে হয়, তোমরা পাও। আমি তোমাদের সঙ্গে থাকতে চাই।'

ববকে ঠকাতে চেয়েছিল বলে এইবার লজ্জা পেল কিশোর। রবিন, মুসা, এমনকি ছোট্ট ফারিহা পর্যন্ত লজ্জা পেল। ববের অনেক দুর্বলতা। সে ভীতু, বোকা, বেশি কথা বলে, বিরক্ত করে—সবই ঠিক, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নয়।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'সূত্রগুলো তোমার চাচাকে দেখালে না কেন?'

'বা-রে, এনেছি তোমাদের জন্যে। তাকে দেখাতে যাব কেন?' পকেট থেকে নোটবুকটা বের করল বব। পাতা খুলে সূত্রের তালিকাটা দেখাল।

'কাল রাতে যে রহস্যময় ঘটনাটা ঘটতে দেখেছ, এ সম্পর্কে তোমার চাচাকে কিছু বলেছ?'

'কোন ঘটনাটা?'

'ওই যে রহস্যময় গাড়ির শব্দ শুনলে?'

'না। শুধু বলেছি, পোড়োবাড়ির কাছে নাকি পাহাড়ে রহস্যময় আলো দেখা যায়। আমি কিছুই দেখিনি।'

'হুঁ। গোড়া থেকে আবার বলো দেখি সব। কোন কথা বাদ দেবে না।'

নতুন করে আবার সব বলল বব।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'লোকটার নাম ডোনারই তো? ঠিকমত শুনেছ?'

'একদম ঠিক। স্পষ্ট বলতে শুনেছি। ভুল হয়নি আমার।'

খাওয়ার সময় হয়ে গেল। মুসা আর ফারিহাকে ডাকতে এলেন মুসার আম্মা। আর থাকা যাবে না। ববের সঙ্গে রবিন আর কিশোরও বেরিয়ে এল।

রবিন চলে গেল ওদের বাড়ির দিকে। একসঙ্গে কিছুদূর এগোল কিশোর আর বব, তারপর দু-জন দু-দিকে।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই ডিম আর মাংস ভাজার গন্ধ নাকে এল ববের। ঘরে ঢুকে দেখে রান্না করছে তার চাচা।

ভাতিজাকে খুব খাতির-যত্ন করতে লাগল ফগ। প্রচুর ভাল ভাল খাবার তুলে দিল পাতে। তারপর মোলায়েম গলায় এক সময় জানতে চাইল, 'হ্যাঁ রে, বব, কিশোরদের সঙ্গে দেখা হলো?'

মুখ ভর্তি খাবারের জন্যে কথা বলতে অসুবিধে হলো ববের। গিলে নিয়ে বলল, 'হয়েছে।'
'কি বলল?'
'তেমন কিছুই না। জিজ্ঞেস করল, আমরা কদ্দূর কি করতে পেরেছি,' বানিয়ে বলে দিল বব।
'কিসের ব্যাপারে?'
'ডাকাতদের।'
'তুই কি বললি?'
'বললাম, এখনও কিছু করতে পারিনি। তবে চাচা বলেছে, আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি।'
'বোকামি করেছিস। এ কথা বলে দেয়া তোর উচিত হয়নি।'
'ইচ্ছে করেই তো বললাম, ওদের ভয় পাওয়ানোর জন্যে।'
'ভয় ওরা পাবে না, বরং সাবধান হয়ে যাবে। আর একটা সত্যি কথাও বলবে না তোর কাছে।'
'না, ওরা কথা দিয়েছে, বলবে।'
বব যে কিছু লুকাচ্ছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না ফগের। অকস্মাৎ রাগ হয়ে গেল। ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড় কষিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো, কি লুকাচ্ছে। জোর করে নিজেকে সামলাল সে। ছেলেটাকে স্পাই হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। আর তা করতে হলে মেজাজ খারাপ করা চলবে না। ওর বিশ্বাস অর্জন করতে হবে।
আর কিছু না বলে চুপ হয়ে গেল ফগ।
নীরবে খাওয়া শেষ করে উঠে চলে গেল বব। তার চাচা পত্রিকা নিয়ে বসল।
সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আছে বব। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।
নিঃশব্দে এসে তার ঘরে ঢুকল ফগ। হ্যাঙ্গারে ঝোলানো কোটের পকেট থেকে বের করে আনল নোটবুকটা। পাতা উল্টেই স্থির হয়ে গেল। স্পষ্ট করে লেখা আছে:

পাহাড়ে পাওয়া সূত্র

তার নিচে দশটা সূত্রের নাম।
রাগে জ্বলে উঠল ফগ। এ সব কথা তার কাছে লুকিয়েছে হতভাগাটা! ঘুম থেকে টেনে তুলে পিটাতে ইচ্ছে করল। সূত্রগুলো খুঁজে বের করতেও দেরি হলো না। সিগারেটের গোড়া, বোতাম আর ফোন নম্বরটা সবচেয়ে মূল্যবান মনে হলো।
জিনিসগুলো আবার জায়গামত রেখে দিয়ে ফিরে এল সে। এগুলো যে দেখে ফেলেছে ববকে বলবে না। তাহলে ভবিষ্যতে আর কোন সূত্র আদায় করতে পারবে না তার কাছ থেকে। ফোন নম্বরটা গ্রীনহিলসেরই মনে হলো। টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ফোন করল সে। জানা গেল, নম্বরটা মিগুয়ারো নামে এক বিদেশী বৃদ্ধের। একা একা বাস করেন। বাগান করার শখ। প্রচুর গোলাপ আর ক্রিসেনথিমাম জন্মে তাঁর বাগানে। নিরীহ এক ভদ্রলোক।
তবে তাঁর ওপর নজর রাখার সিদ্ধান্ত নিল ফগ। নিরীহ ভদ্রলোকের

ছদ্মবেশেই অনেক সময় অপরাধ করে অপরাধীরা। ওপরের চেহারাটা তার খোলস।

দশ

রাতের বেলা ভেবে ভেবে ঠিক করল কিশোর, পরদিন পাহাড়ের ভেতর একবার তদন্ত করতে যাবে। যে নালা ধরে বব গিয়েছিল, সেটার মাথায় কি আছে দেখবে।

সকালে মুসাদের বাড়িতে এসে সেটা জানাতে উত্তেজিত হয়ে উঠল সবাই। তখুনি রওনা দিতে চাইল।

কেবল ফারিহা জিজ্ঞেস করল, 'ববকে নেবে না?'

'নিতে অসুবিধে ছিল না,' কিশোর বলল। 'সে আমাদের ভালই চায়। কিন্তু সে যা জানবে ফগেরও জেনে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই নেয়া যাবে না।'

বেরিয়ে পড়ল ওরা। ব্রিজ পার হয়ে চলে এল অন্যপাশে। নালার ধার ধরে এগোল। আবহাওয়া ভাল না। থেকে থেকে তুষার ঝরছে। তার ওপর ঝোড়ো বাতাস। বনের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে নালাটা। শীতের পাতাঝরা গাছপালা দাঁড়িয়ে আছে কেমন প্রাণহীন বিবর্ণ হয়ে।

কিছুদূর এগোনোর পর বাঁয়ে মোড় নিল নালা। একটা ঢিবি চোখে পড়ল। নিশ্চয় এটাই সেই ঢিবি, রাতের বেলা যেটাতে লুকিয়ে বসেছিল বব। সেটার কাছাকাছি আসতে সামনে একটা কাঁচা রাস্তা চোখে পড়ল। একটা গাড়ি কোনমতে চলতে পারবে।

আরও সামনে কি আছে দেখার জন্যে রাস্তা ধরে এগোল ওরা।

সামনে এক জায়গায় বেশ ঘন হয়ে আছে গাছপালা। তার ফাঁক দিয়ে দেয়াল চোখে পড়ল। বনের মধ্যে এখানে কার বাড়ি? ব্যাপারটা কৌতূহলী করে তুলল ওদের। দেখার জন্যে এগোল।

বিশাল এক লোহার গেটের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। দুই পাশে পাথরের স্তম্ভ। একটা স্তম্ভের মাথায় বড় একটা ঘণ্টা ঝোলানো। গেটের পাল্লার ওপরে শিকের মাথাগুলো চোখা করে দেয়া, যাতে কেউ ডিঙাতে না পারে।

'বাড়িটাড়ি তো দেখছি না!' ফিসফিস করে বলল ফারিহা।

মুসাও উঁকিঝুঁকি মারছে। বিরাট এলাকা নিয়ে উঁচু দেয়ালে ঘেরা জায়গাটা। ভেতরে কোন বাড়িঘর নেই, কেবল ছোট একটা টিনের ছাপরা বাদে। কেমন ভূতুড়ে লাগল তার কাছে। ভয়ে ভয়ে বলল, 'চলো, এখান থেকে চলে যাই! জায়গাটা ভাল মনে হচ্ছে না!'

কিন্তু এসেছে যখন না দেখে যাওয়ার ইচ্ছে নেই কিশোরের। লোহার শিকের ফাঁকে নাক ঢুকিয়ে দিয়ে দেখছে। লম্বা গাড়িপথ চলে গেছে ভেতরের দিকে। দুই ধারে বড় বড় গাছ, অন্ধকার করে রেখেছে। কোন পাকা বাড়ি চোখে পড়ল না।

'বাড়ি থাকলেও গাছপালার আড়ালে,' আনমনে নিজেকেই বলল কিশোর। 'কার বাড়ি?'

গেট আটকানো। ঠেলেঠুলে লাভ হলো না। খুলল না পাল্লা। মনে হয় ওপাশ থেকে তালা দেয়া।

ঘন্টাটার দিকে তাকাল সে। বাজাবে নাকি? ঘরে কেউ আছে? যদি বেরিয়ে আসে কি কৈফিয়ত দেবে?

বানিয়ে বলে দেবে পথ হারিয়েছে—ভেবে ঘন্টার দড়ি ধরে টান দিল কিশোর।

শব্দ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। পরনে জিনসের শার্ট-প্যান্ট। পায়ে চামড়ার বুট। কোমরে চওড়া বেল্ট। চেহারাই বলে দিল বদমেজাজী লোক।

দূর থেকে চিৎকার করে বলল সে, 'কি চাই? ভেতরে আসতে পারবে না। ভাগো।'

আবার ঘন্টা বাজাল কিশোর।

এমন ভঙ্গিতে হেঁটে আসতে লাগল লোকটা, ভয় পেয়ে গেল ফারিহা। কিশোরের হাতে টান দিয়ে বলল, 'চলো, চলে যাই!'

কিন্তু কিশোরের চেহারায় ভয়ের কোন লক্ষণই নেই।

কাছে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল লোকটা। কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'ঘন্টা বাজাচ্ছ কেন ওরকম করে? বললাম না ঢুকতে পারবে না!'

'আমার চাচার খোঁজে এসেছি,' নিরীহ স্বরে বলল কিশোর। 'মিস্টার ব্রডসনের বাড়ি না এটা?'

'না।'

'সত্যি বলছেন?'

'তবে কি মিথ্যে!'

'তাহলে এটা কার বাড়ি? কে থাকেন?'

'কার বাড়ি জানার দরকার নেই তোমার। কেবল আমি থাকি। তোমাদের মত বিচ্ছুদের তাড়ানোর জন্যে। যাও এখান থেকে, জলদি!'

'বাগানটা খুব সুন্দর।' অনুনয় করল কিশোর, 'একটু দেখতে দিন না, প্লীজ!'

'দেখো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখানে বকবক করতে পারব না। চাবুকের বাড়ি খেতে না চাইলে যাও। নাকি কুত্তাগুলোকে ডাকব?'

'এখানে একা থাকতে আপনার ভয় করে না?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'বুঝেছি, চাবুকই আনতে হবে!' চোখ লাল করে ওদের দিকে তাকাল লোকটা।

কোন কথাতেই কাজ হবে না, ঢুকতে দেয়া হবে না, বুঝল কিশোর। বলল, 'আসলে পথ হারিয়ে ফেলেছি আমরা, সে-জন্যেই আপনাকে ডাকলাম। গ্রীনহিলসটা কোনদিকে বলতে পারবেন?'

পথ বলে দিল লোকটা। বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করলে ভাল হবে না—আরেকবার শাসিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ঘরের কাছে গিয়ে ফিরে তাকাল।

আর দাঁড়ানোর সাহস হলো না গোয়েন্দাদের। ফিরে চলল ওরা।

কিছুদূর এগোতে সাইকেলে চেপে একটা লোককে আসতে দেখল। ডাক পিয়ন।

সে কাছাকাছি আসতে হাত তুলল কিশোর। বলল, 'ক'টা বাজে বলতে পারবেন?'

সাইকেল থেকে নামল লোকটা। পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখেই বিরক্তিতে নাক কুঁচকাল। 'দূর! কাজের সময়ই যদি বন্ধ হয়ে থাকে, ভাল লাগে। এটা দিয়ে আর চলবে না। নতুন আরেকটা কিনতেই হবে।'

'ঘড়ি তো এখন সস্তা।'

'হ্যাঁ, কিনে নেব।'

'ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন? গেটওয়ালা বাড়িটাতে?'

'হ্যাঁ।'

'বদমেজাজী লোকটা আপনাকে ঢুকতে দেয়! কত অনুরোধ করলাম, বাগানটা দেখতে দিল না আমাদের!'

'গেটের বাইরে থেকেই চিঠি দিয়ে চলে আসি। আসলেই বদমেজাজী। ও ওখানকার পাহারাদার। বাচ্চা কিংবা অন্য কেউ যাতে ঢুকে গাছপালা নষ্ট করতে না পারে সে-জন্যে রাখা হয়েছে।'

'ও, মালিক তাহলে সে নয়?'

'না। মালিক ছিল এক বুড়ো। একবার শুনেছিলাম, বাড়িটা বিক্রি করতে চায়। তারপর কি হয়েছে, আর জানি না। একদিন দেখলাম, পাহারাদার এসেছে।'

'মালিক এখানে আসে না?'

'আমি তো অনেক বছর দেখি না। পাহারাদার লোকটাই কেবল থাকে। ওর নাম গিলিস। রোজ অনেক চিঠি আসে ওর নামে, এতখানি পথ সাইকেল মেরে আসতে হয় আমাকে, শুধু ওর একার জন্যে। কি করব। চাকরি করি যখন, আসতেই হবে।' আরেকবার ঘড়ির দিকে তাকাল ডাকপিয়ন। 'ক'টা বাজে বলতে পারলাম না তোমাদের, সরি।'

আবার সাইকেলে চেপে শিস দিতে দিতে চলে গেল সে।

সন্তুষ্ট মনে হলো কিশোরকে। হাসিমুখে বলল, 'কারও খবর জানতে হলে ডাকপিয়নের বাড়া লোক নেই। দারুণ একটা খবর জানিয়ে গেল, তাই না? বনের মধ্যে বিশাল এক দেয়ালঘেরা জায়গা, মালিক কখনও আসে না, একজন মাত্র লোক বাস করে, তার কাছে চিঠি আসে প্রতিদিন। সব কিছু মিলিয়ে অদ্ভুত মনে হয় না?'

কথা বলতে বলতে সরু পায়েচলা পথটা ধরে এগোল গোয়েন্দারা। নিশ্চিত হয়ে গেছে, আরেকটা রহস্য হাতে এসে গেছে ওদের, যার মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যাচ্ছে না!

এগারো

খবরটা ববকে জানানো হলো না। সে জানলেই যদি তার কাছ থেকে জোর করে

জেনে নেয় ফগ, এই ভয়ে।

বব যখন জানতে চাইল সূত্রগুলো দিয়ে কি করবে, বেকায়দায় পড়ে গেল কিশোর। মিথ্যে কথা বলে আর ধোঁকা দিতে মন চাইল না। বলল, 'আপাতত কিছু করার নেই। রোজ সকালে উঠে খবরের কাগজ দেখবে। ডাকাতির খবর বেরোলে তখন তদন্ত করতে যাবে। তোমার ভাগ্য ভাল হলে ডাকাতেরা লুটের মাল নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখতে পারে পোড়োবাড়িতে।'

বব বলল, 'তাহলে আগে যে সব ডাকাতি হয়েছে, সে-সব মালও নিশ্চয় এখন বাড়িটাতে আছে। যাব নাকি আজ রাতে দেখতে?'

'না, লাভ হবে না। আমার ধারণা, এতদিনে সরিয়ে ফেলেছে। নতুন করে আবার যা ডাকাতি করবে, সে-সব এনে রাখবে।'

তা-ও বটে, বিশ্বাস করল বব। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'তাহলে আর কি করব। এই ডাকাতির ব্যাপার নিয়ে একটা কবিতাই লিখে ফেলব বরং।'

'হ্যাঁ, তাই কোরো,' হেসে বলল মুসা। 'সময় কাটবে।'

'সময় কাটানোর কি আর কাজের অভাব? একটা না একটা কাজ দিয়েই রাখে চাচা। তোমাদের কাছে আসতে যে দেয় এখন, এই বেশি।'

আসতে কি আর সাধে দেয়? মতলব আছে! আমরা যা যা জানব, সব তোমাকে দিয়ে আমাদের কাছ থেকে বের করে নিতে চায়—বলতে ইচ্ছে করল কিশোরের। কিন্তু বললে ঘুরিয়ে ববকে বোকা আর ভীতু বলা হবে, দুঃখ পাবে সে, তাই চেপে গেল।

বেশিক্ষণ বসতে পারল না বব। চাচার ভয়ে। উঠে চলে গেল।

রহস্যটা নিয়ে আলোচনা শুরু করল গোয়েন্দারা।

তেমন কোন সূত্রই নেই হাতে। কেবল একটি মাত্র নাম—ডোনার।

মুসাকে ওদের টেলিফোন ডিরেক্টরিটা নিয়ে আসতে বলল কিশোর।

তাতে নাম খুঁজতে বসল সে আর রবিন।

মোট তিনজন ডোনার পাওয়া গেল। দুইজন ডোনার গ্রীনহিলসেই থাকে, বাকি একজন থাকে মাইল তিনেক দূরের একটা ছোট শহরে। একটা গ্যারেজের মালিক।

গ্রীনহিলসে যে দু-জন থাকে, আগে তাদের খোঁজ নিতে বেরোল গোয়েন্দারা। খোঁজ নেয়ার সবচেয়ে সহজ জায়গা হলো পোস্ট অফিস। পাহাড়ে সেদিন যে ডাক পিয়নের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাকে পাওয়া গেল অফিসে।

গ্রীনহিলসের দু-জন ডোনারের সম্পর্কেই খোঁজ দিতে পারল সে। একজন বুড়ো হয়ে মারা গেছে, তার বিধবা স্ত্রী এখন বাড়িতে একা থাকে। দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে, ওরা অনেক দূরে চলে গেছে। এক ছেলে ছিল, মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে। মহিলার জন্যে খুব আফসোস করল ডাক পিয়ন।

দ্বিতীয় ডোনার এখন গ্রীনহিলসে নেই। কোন কাজে নিউ ইয়র্ক গেছে। বাড়িতে স্ত্রী আছে, আর পাঁচ ছেলেমেয়ে। বদের গোড়া এককেটা। জ্বালিয়ে মারে মানুষকে। প্রায়ই চিঠি লেখে ডোনার। সেগুলো পৌঁছে দেয়ার জন্যে ওবাড়িতে যেতে হয় পিয়নকে। না যাওয়া লাগলেই খুশি হত সে। ডোনারের ছোট ছেলে

দুটো সবচেয়ে পাজি। সাইকেলের চাকার হাওয়া ছেড়ে দেয়, কিংবা ইচ্ছে করে স্ট্যাণ্ড থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। সব সময় শয়তানির তালে থাকে। সুযোগ পেলেই একটা না একটা কিছু করে বসে।

পিয়নকে ধন্যবাদ দিয়ে যার যার বাড়ি ফিরে গেল গোয়েন্দারা।

বিকেলে আবার মীটিং বসল। দুপুরে খেতে গিয়ে বাবার কাছ থেকে বনের ভেতরের দেয়াল ঘেরা জায়গাটা সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে এসেছে রবিন। মিস্টার মিলফোর্ড সাংবাদিক। অনেক খবরই রাখতে হয় তাঁকে। তিনি বলেছেন, বাড়িটাকে নাকি টোপাজ ফলি নামে চেনে লোকে। তৈরি হয়েছিল যুদ্ধের সময়। মালিকের নাম রেড সাইন, বিদেশে থাকেন। বাড়িটার কোন খোঁজখবর নেন বলে মনে হয় না।

এই তথ্য সন্দেহ আরও বাড়াল। খোঁজখবর না নিলে পাহারাদার কে রাখল?

আলোচনা করে ঠিক হলো, বাড়ির ব্যাপারে পরে তদন্ত করা যাবে। আপাতত প্রথম কাজ, ডোনারের খোঁজ করা। সেদিন রাতে গাড়ি নিয়ে পাহাড়ে গিয়েছিল কোন লোকটা, সেটা জানা। তিনজনের মধ্যে দু-জনের ব্যাপারে জানা হয়ে গেছে, সন্দেহের তালিকা থেকে ওদের বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছে। ঠিক হলো, পরদিন পাশের শহরে যাবে কিশোর, তৃতীয় ডোনারের ব্যাপারে খোঁজ নিতে। একাই যাবে সে। দল বেঁধে যাওয়ার দরকার নেই। ডোনার অপরাধী হয়ে থাকলে সাবধান হয়ে যেতে পারে। পর পর কয়েকটা জটিল রহস্যের সমাধান করে গ্রীনহিলসে মোটামুটি পরিচিত হয়ে গেছে গোয়েন্দারা। আগের ছুটিতে নেকলেসটা উদ্ধারের পর পত্রিকাতেও খবর বেরিয়েছিল।

পরদিন সাইকেল আর টিটুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কিশোর। ববের ছদ্মবেশ নিয়েছে সে। যাতে পত্রিকায় তার ছবি দেখে থাকলেও ডোনার চিনতে না পারে।

শহরে পৌঁছে রাস্তায় প্রথম যাকে জিজ্ঞেস করল, সে-ই বলে দিল কোনদিকে যেতে হবে। গ্যারেজটা দেখেই সাইকেল থেকে নেমে পড়ল কিশোর। চাকার হাওয়া ছেড়ে দিয়ে ঠেলে নিয়ে এগোল।

গ্যারেজের অনেক বড় গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। গাড়ি মেরামতে ব্যস্ত বেশ কয়েকজন মিস্ত্রী। তার দিকে ফিরেও তাকাল না।

কিশোরের বয়েসী একটা ছেলে, হোসপাইপ দিয়ে গাড়ি ধুচ্ছে। তার দিকেই এগিয়ে গেল সে। বলল, 'এই যে, শোনো, এখানে সাইকেল মেরামতের ব্যবস্থা আছে? টায়ারটা পাংচার হয়ে গেছে।'

'পাংচার আমিই সারি। কিন্তু এখন তো হবে না। একটু পরই গাড়িটা নিতে আসবে কাস্টোমার।' বলেই চট করে একটা কাঠের তৈরি অফিসের জানালার দিকে তাকাল ছেলেটা।

ওখানেই আছে ওর মনিব, বুঝে ফেলল কিশোর। বলল, 'জরুরী কাজে যাচ্ছিলাম, এই সময় টায়ারটা গেল! কি যে করি এখন!'

'কি করব, বলো? হাতে কাজ না থাকলে সেরে দিতাম। গাড়ির কাজ ফেলে সাইকেল সারতে গেলে মালিক বকবে।' আবার জানালার দিকে তাকাল ছেলেটা। 'ঝুড়িতে ওটা তোমার কুকুর বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

সাইকেলের বাস্কেট থেকে টিটুকে নামিয়ে দিল কিশোর।

দুষ্টুমি করে টিটুর গায়ে পানি ছিটিয়ে দিল ছেলেটা। কিছুই মনে করল না টিটু। মজা পেয়ে বরং গিয়ে ছেলেটার হাত চেটে দিল।

'গ্যারেজটা বেশ বড়ই মনে হচ্ছে,' চারপাশে তাকাতে তাকাতে বলল কিশোর। 'অনেক কর্মচারী। সবাই ব্যস্ত।'

'হ্যাঁ, বেশি ব্যস্ত।' গাড়ির দিকে হোস পাইপ ধরে রেখে বলল ছেলেটা, 'এখানকার আর কোন গ্যারেজের মালিক এত খাটায় না। একটু এদিক ওদিক হওয়ার উপায় নেই। বকা শুরু করে।'

'গ্যারেজে চাকরি করার খুব ইচ্ছে আমার। গাড়ির কিছু কিছু কাজ জানি। এখানে একটা চাকরি পাওয়া যাবে, বলতে পারো?'

'পেতে পারো। ফোরম্যানের নাম টোবারসন। তার সঙ্গে দেখা করো গিয়ে। একজন অ্যাসিসটেন্ট খুঁজছে। বসের অফিসেই বসে।' হাত তুলে কাঠের কেবিনটা দেখিয়ে দিল ছেলেটা।

'বস? কি নাম তার?'

'মিস্টার ডোনার। মাইলখানেক দূরে আরও একটা গ্যারেজ আছে তার। বেশি ঠেকা না থাকলে এখানে কাজ করতে এসো না। টিকতে পারবে না। কর্মচারীদের সঙ্গে গোলামের মত ব্যবহার করে।'

'তাই নাকি...'

এই সময় আরেকটা কুকুর ঢুকল গ্যারেজে। দেখেই রেগে গেল টিটু। দৌড়ে গিয়ে ওটার ঘাড় কামড়ে ধরল। শুরু হয়ে গেল হট্টগোল।

কাঠের দরজায় বেরিয়ে এল একজন লোক। ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'টনি, ওটা কার কুত্তা?'

'ওর, মিস্টার ডোনার!' ভয়ে ভয়ে হাত তুলে কিশোরকে দেখিয়ে দিল ছেলেটা।

'এই ছেলে, এখানে কি? কে তুমি?'

'কিশোর পাশা।'

'যে পাশাই হও, গ্যারেজে কুত্তা নিয়ে ঢুকেছ কেন? দাঁড়াও, পুলিশে খবর দিচ্ছি! অনেকক্ষণ থেকেই দেখছি দাঁড়িয়ে আছ। কাজ করতে দিচ্ছ না টনিকে।'

'কই, আমি তো কিছু করছি না। সাইকেলের টিউব পাংচার হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করছিলাম, সারাতে পারবে কিনা ও। পয়সা ছাড়া করাব না। যা বিল হয়, দেব।'

'তোমার পয়সা কে চায়? এটা মোটর গ্যারেজ, সাইকেলের নয়।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। অনেক মোটরের গ্যারেজেও সাইকেলের চাকা সারায় তো, তাই ভাবলাম এখানেও হতে পারে। খুব জরুরী কাজ ছিল আমার।' লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে অন্ধকারে একটা ঢিল ছুঁড়ল কিশোর, 'টোপাজ ফলিতে যেতাম। চেনেন নাকি?'

ঢিলটা জায়গামতই লাগল, ডোনারের চোখ দেখেই বুঝতে পারল কিশোর।

লোকটা চমকে গেল বলে মনে হলো। তবে মুহূর্তে সামলে নিল সেটা। বলল, 'না, চিনি না। শুনিওনি কখনও। কুত্তাটাকে নিয়ে বেরোও এখন...' টিটুর ওপর চোখ পড়তে থেমে গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল কিশোরের দিকে। 'কি নাম বললে তোমার?'

'কিশোর পাশা।'

'আর কুত্তাটার?'

'টিটু।'

'কোথায় থাকো?'

'গ্রীনহিলসে।'

দৃষ্টি কেমন বদলে গেল ডোনারের। একবার কিশোরের দিকে, আরেকবার টিটুর দিকে তাকাতে লাগল। ব্যাপার কি? চিনে ফেলল নাকি? হ্যাঁ, চিনেই ফেলেছে। তার পরের কথা থেকেই বোঝা গেল। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি সেই কিশোর পাশা নও তো, নিপা ম্যারিয়নের মুক্তোর হারটা যে খুঁজে বের করেছে?'

'হ্যাঁ, আমিই সেই কিশোর পাশা।'

'এখানে কোন মতলব নিয়ে আসোনি তো?'

'না না, মতলব কিসের? টায়ার পাংচার হলো, তাই...' ডোনারের চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল কিশোর। খোঁচা মারতে ছাড়ল না, 'মতলব বলছেন কেন? এখানে কিছু ঘটেছে নাকি?'

ডোনারের চোখে অস্বস্তি ফুটল। তাড়াতাড়ি বলল, 'কি আবার ঘটবে! যাও যাও, বেরোও এখন, কাজের ক্ষতি করছ!'

ঠিক জায়গাতেই এসেছে কিশোর, বুঝতে পারল। তার বিশ্বাস, এই ডোনারই সেই ডোনার, বনের মধ্যে রাতের বেলা যার নাম শুনেছে বব। ছদ্মবেশে এসেছে বলে খুশি হলো মনে মনে। পরে স্বাভাবিক চেহারায় তাকে দেখলে আর চিনতে পারবে না ডোনার।

সাইকেলের চাকায় হাওয়া দেয়ার যন্ত্র সঙ্গেই আছে। বাড়ি ফিরে যেতে অসুবিধে হবে না কিশোরের। ডোনারের যাতে সন্দেহ না হয়, সে-জন্যে চাকা মেরামতের ব্যাপারে আরেকবার ঘ্যান ঘ্যান করে, টিটুকে ডেকে নিয়ে বেরিয়ে চলে এল।

বারো

গ্রীনহিলসে ঢোকার মুখেই দেখা হয়ে গেল ফগের সঙ্গে। এক লোকের দুটো মুরগী হারিয়েছে, তার সন্দেহ চোরে নিয়েছে, তাই খবর দিয়েছে পুলিশকে।

বব-বেশী কিশোরের ওপর চোখ পড়তেই হাঁ হয়ে গেল ফগ। ব্যাঙের চোখের মত গোল গোল চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। 'ঝামেলা!' আনমনে বিড়বিড় করতে লাগল সে। 'ববটাকে রেখে এলাম বাড়িতে। এত তাড়াতাড়ি সাইকেল পরিষ্কার করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল! নাহ্, ছেলেটাকে একটা মুহূর্তের জন্যে আর

বিশ্বাস করা যায় না!'

হাত নেড়ে ডাকল সে, 'অ্যাই, বব, এদিকে আয়!'

ফগকে খেপানোর জন্যে দেখেও না দেখার ভান করল কিশোর। ধীরগতিতে সাইকেলে প্যাডাল করে এগিয়ে চলল।

রাগে, উত্তেজনায় তার নিজের সাইকেল কিনা সেটাও খেয়াল করল না ফগ। চিৎকার করে ডাকল, 'অ্যাই, এলি না!'

পাত্তাই দিল না কিশোর। সাইকেল চালিয়ে মোড়ের অন্যপাশে চলে এল।

পেছনে দৌড়ে এল ফগ।

নীরব হাসিতে ফেটে পড়ছে কিশোর। ফগের চোখের আড়াল হয়েই বাস্কেট থেকে নামিয়ে দিল টিটুকে।

কিছু বলা লাগল না, কি করতে হবে বুঝে গেছে টিটু। দৌড় দিল ফগের দিকে। তার কাছে এসে পায়ের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে কামড়ে দেয়ার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

'ঝামেলা! এটা আবার এল কোত্থেকে! যা, ভাগ! ভাগ!' কুকুরটাকে লাথি মারার চেষ্টা করল ফগ।

কিন্তু ভাগল না টিটু। দ্বিগুণ উদ্যমে তার চেষ্টা চালিয়ে গেল।

রাস্তায় ঝাড়ু দিচ্ছে ঝাড়ুদার।

পিছাতে পিছাতে ফগ গিয়ে পড়ল তার ঠেলাগাড়িটার ওপর। উল্টে পড়ে গাড়িটাকেও প্রায় উল্টে দিল। ময়লা আর্বজনা ছিটিয়ে গেল রাস্তায়।

গালি দিতে দিতে ঝাড়ু নিয়ে টিটুকে তাড়া করল ঝাড়ুদার। সরে গেল টিটু। ফগকে ভয় দেখানো অনেক হয়েছে। সন্তুষ্ট হয়ে আবার কিশোরের কাছে ছুটল সে।

আস্তে আস্তে সাইকেল চালাচ্ছে কিশোর। টিটু আসতে তাকে বাস্কেটে তুলে নিল।

রাগে, অপমানে মুখ টকটকে লাল হয়ে গেছে ফগের। কোমরের বেল্ট ঠিক করে, গা থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলে সোজা বাড়ি রওনা হলো। আজ বব হতভাগাটার চামড়া তুলে তারপর শান্তি।

একমনে কাজ করছে বব। সারাটা সকাল ধরেই খাটছে। ছাউনিটা সাফ করে ফেলেছে। তারপর চাচার সাইকেলটা পরিষ্কারে মন দিয়েছে। সেই কাজও প্রায় শেষ। এত খাটছে চাচাকে খুশি করার জন্যে। এর কারণ, চাচা যাতে তাকে বেরোতে বাধা না দেয়। কিশোরদের সঙ্গে জরুরী আলোচনা আছে তার। সকালের কাগজে একটা ডাকাতির খবর দেখেছে। ধরেই নিয়েছে, এই ডাকাতদের কথাই বলেছে কিশোর। কিশোরের ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা বিস্মিত করেছে তাকে। কি করে জানল, ডাকাতিটা হবে? কল্পনাই করতে পারছে না, না জেনে আন্দাজেই তাকে এ কথা বলে দিয়েছে কিশোর। প্রায়ই ডাকাতির খবর থাকে তো কাগজে। সুতরাং আরেকটা খবর বেরোলে অবাক হওয়ার কিছু নেই ভেবেই বলেছিল কিশোর। সেটা আর বুঝতে পারেনি বব।

পাশের বাড়ির মহিলা মিসেস হ্যাগারসনও রোদ দেখে বাগানে বেরিয়েছে

কাপড় রোদে দেয়ার জন্যে। অনেক কাপড় ধুয়েছে আজ। বেড়ার কাছে এসে ডাকল, 'এই যে ছেলে, কি নাম তোমার?'

ন্যাকড়া দিয়ে ডলে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল চকচকে করতে করতে বব জবাব দিল, 'উইলিয়াম ববর্‌যাম্পারকট।'

'ও। মিস্টার ফগের ভাতিজা নাকি তুমি? ভাল, ভাল, খুব ভাল। তোমার মত এত পরিশ্রমী ছেলে আর দেখিনি! সেই সকাল থেকে খেটেই চলেছ। এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই।'

প্রশংসায় ফুলে উঠল বব। দাঁত বের করে আন্তরিক একটা হাসি উপহার দিল মিসেস হ্যাগারসনকে।

দড়িতে ভেজা কাপড় ঝুলিয়ে দিয়ে ঘরে চলে গেল মহিলা।

গটমট করে ভেতরে ঢুকল ফগ। সোজা এগোল ছাউনির দিকে, যেখানে সাইকেল পরিষ্কার করছে তার ভাতিজা।

'ঝামেলা! মনে করেছ এ ভাবে ভান করে আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে! এই হতচ্ছাড়া, সাইকেল নিয়ে গাঁয়ের ভেতরে গিয়েছিলি কেন? আমাকে জিজ্ঞেস না করে আমার সাইকেল বের করেছিলি কোন সাহসে?'

বব তো আকাশ থেকে পড়ল। কি বলছে তার চাচা! 'কি বলছ তুমি! সারাটা সকাল ধরেই এখানে আছি। দেখো না, ছাউনিটা সাফ। সাইকেলটা ঝকঝকে।'

দেখল ফগ। অবাক হলো। সত্যিই সব সাফ করে ফেলেছে তার ভাতিজা। এতসব করে গাঁয়ে বেরোনোর সময় পেল কি করে হতভাগাটা?

'দেখ, বব, আমার সঙ্গে চালাকি করবি না বলে দিচ্ছি! আমি নিজের চোখে দেখেছি তোকে। ডাকলাম। ফিরে তাকিয়ে দেখলি আমাকে, তারপরেও থামলি না। সোজা চলে গেলি। এই বেয়াদবি আমি সহ্য করব না!'

'কসম, চাচা, সারাটা সকাল আমি এখানে ছিলাম! মুহূর্তের জন্যে বেরোইনি! সাইকেল নিয়ে গাঁয়ে যাওয়া তো দূরের কথা! নিশ্চয় ভুল হয়েছে তোমার!'

'আমি ভুল করেছি! আমি! ফগর্‌যাম্পারকট!' চেঁচিয়ে উঠল ফগ। 'খবরদার, আমার সঙ্গে চালাকির চেষ্টা করবি না! আমি নিজের চোখে দেখলাম...'

'কি হয়েছে, মিস্টার ফগ?'

প্রায় কানের কাছে কথা শুনে চমকে গেল ফগ। ফিরে তাকিয়ে দেখল বেড়ার ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে আছে মিসেস হ্যাগারসন। গম্ভীর হয়ে বলল, 'ফগর্‌যাম্পারকট!'

কিন্তু ভুল শোধরানোর ধারেকাছেও গেল না মিসেস হ্যাগারসন। বরং ইচ্ছে করেই ভুলটা করল আবার, 'মিস্টার ফগ, অহেতুক ধমকাচ্ছেন ছেলেটাকে! একটা মুহূর্তের জন্যেও বাগান থেকে বেরোয়নি ও। এত পরিশ্রমী ছেলে আর দেখিনি আমি।—এই বয়েসী ছেলেরা তো কাজ করতে চায় না, খালি ফাঁকি দেয়ার তালে থাকে। অথচ এই ছেলেটা কত ভাল। এত ভাল একটা ভাতিজা পাওয়ার জন্যে আপনার গর্ব করা উচিত, মিস্টার ফগ। আশ্চর্য! কাজ করেই চলেছে! একটা সেকেণ্ডের জন্যে নড়ল না! ছাউনি পরিষ্কার করল, সাইকেল পরিষ্কার করল, এখনও করেই চলেছে! ওকে আপনি কিছু বলবেন না, মিস্টার ফগ! তাহলে ভাল

হবে না! গাঁয়ের সবাইকে জানিয়ে দেব আপনি লোক ভাল না, পুলিশ হওয়ার উপযুক্ত না...'

মিসেস হ্যাগারসনের জিভকে যমের মত ভয় করে ফগ। ওই মহিলার সঙ্গে কথায় পারা তার কর্ম নয়। মানে মানে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কোন জবাব না দিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়াল সে।

ববকে বলল, 'দেখো ছেলে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে সব সময়। কখনও চুপ করে থাকবে না। গুরুজনের সঙ্গেও না। থাকলেই সুযোগ পেয়ে যায়। আরও অন্যায় চাপাতে থাকে।'

ববকে প্রচুর উপদেশ দিয়ে চলে গেল মিসেস হ্যাগারসন।

খানিক পর রান্নাঘর থেকে চাচার ডাক শোনা গেল, 'বব!'

ন্যাকড়া ফেলে দৌড় দিল বব। মিসেস হ্যাগারসন যতই অভয় আর সাহস দিয়ে যাক, বেতসমৃদ্ধ চাচাকে অগ্রাহ্য করার সাহস পেল না সে।

সাইকেল নিয়ে বেরোনোর কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে ববকে ডাকেনি এখন ফগ। তার সন্দেহ জেগেছে, এ সবের মূলে ওই কিশোর ছোঁড়াটার হাত আছে। মিসেস হ্যাগারসন যখন বলছে সারা সকাল বাগানে ছিল বব, তাহলে সত্যিই ছিল। জিভে যতই ধার থাকুক, কখনও মিথ্যে কথা বলে না মহিলা।

'কিশোরের সঙ্গে আজ দেখা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ফগ। 'নতুন কোন খবর দিয়েছে?'

'বাইরেই বেরোইনি, দেখা হবে কি করে? চাচা, ভাবছি বিকেলে বেরোব, অবশ্য তুমি যদি অমত না করো।'

'কেন, জরুরী কোন কাজ আছে?'

ডাকাতির খবর বেরোনোর কথাটা বলতে গিয়েও বলল না বব।

তার ভাবভঙ্গিতেই সন্দেহ করে ফেলল ফগ। বুঝল, কিছু একটা লুকাচ্ছে বব। তবে জানার জন্যে চাপাচাপি করল না। কথা বের করার হাজারটা উপায় আছে। দরকার মত বের করে নেবে। চুপ হয়ে গেল সে।

তেরো

দুপুরের খাওয়ার পর পরই বেরিয়ে পড়ল বব। চলে এল মুসাদের ছাউনিতে। সবাই আছে। আড্ডা দিচ্ছে। সকালে বব সেজে ফগকে কি রকম অপদস্থ করে এসেছে কিশোর, আলোচনার মূল বিষয় সেটাই। হাসাহাসি করছে সবাই। এই সময় ঢুকল বব। তাকে দেখে থেমে গেল আলোচনা।

কিছু বুঝতে পারল না বব। উত্তেজিত স্বরে বলল, 'আজ সকালের কাগজ নিশ্চয় দেখেছ! ডাকাতির খবরটা ছেপেছে! কিশোর, কি করে জানলে আগেভাগে? এতই শিওর ছিলে যদি পুলিশকে জানালে না কেন?'

'প্রমাণ ছাড়া কোন কথা বিশ্বাস করে না পুলিশ,' জবাব দিল কিশোর।

'লুটের মাল নিয়ে গিয়ে নিশ্চয় পোড়োবাড়িতে লুকিয়েছে। আজ রাতেই

যাব।'

'যাও। তবে তোমার চাচাকে বোলো না।'

'মাথা খারাপ! বললেই পিছে লাগবে। নয়তো আমাকে আটকে দেবে। গোয়েন্দাগিরি আর করা হবে না আমার। যাই। বেশি দেরি করতে পারব না। জলদি জলদি যেতে বলে দিয়েছে চাচা।'

সময়মত ডাকাতির খবরটা দিয়েছে বলে কিশোরকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল বব।

বাকি দিনটা কাটল তার মহা উত্তেজনায়। ব্যাপারটা লক্ষ করল তার চাচা। চুপ করে রইল। জিজ্ঞেস করল না কিছু। ভাতিজার ওপর নজর রাখল। সে কখন কি করে দেখলেই বোঝা যাবে।

কিন্তু সেটা বোঝার জন্যে রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো ফগকে। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে নিজের ঘরে চলে এল। বব ঘুমিয়ে পড়লে চুপি চুপি গিয়ে দেখে আসবে তার নোটবুকে নতুন কিছু লেখা হয়েছে কিনা।

কিন্তু ববও ঘুমাল না। সে অপেক্ষা করতে লাগল চাচার ঘুমানোর।

রাত বাড়ছে। গির্জার ঘড়িতে এগারোটা বাজল। উঠে পড়ল বব। কোট গায়ে দিল। গলায় মাফলার জড়াল। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা।

বারোটার সময় বেরোবে। আরও প্রায় এক ঘণ্টা বাকি। বিছানায় শুলে ঘুমিয়ে পড়তে পারে, এই ভয়ে চেয়ারে বসে রইল। নোটবুক বের করে তাতে লিখল:
জানুয়ারির ৩ তারিখে ডাকাতি হয়েছে। ডেভিলস হিলের পোড়োবাড়িতে লুটের মাল লুকিয়েছে ডাকাতেরা। রাত বারোটায় খুঁজে বের করতে যাব সেগুলো। লিখে রাখলাম এই জন্যে যে, যদি কোন বিপদে পড়ি, পুলিশ যাতে আমাকে গিয়ে উদ্ধার করতে পারে।

নিচে নিজের নাম সই করল।

এখনও অনেক সময় বাকি। কিছুতেই যেন এগোতে চাইছে না ঘড়ির কাঁটা। সময় কাটানোর জন্যে কবিতা লেখার চেষ্টা করল সে।

ফগ ভাবল, এতক্ষণে নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে বব। নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল তার শোবার ঘরের ভেজানো দরজার সামনে। পাল্লায় ঠেলা দিল। বব যে বসে বসে লিখছে, কল্পনাই করতে পারেনি সে।

খুট করে শব্দ হতেই ফিরে তাকাল বব। চাচাকে উঁকি দিতে দেখে চমকে গেল। তাড়াতাড়ি নোটবুকটা লুকানোর চেষ্টা করল।

চোখাচোখি হয়ে গেছে। উদ্দেশ্য আর গোপন করা যাবে না। সুতরাং স্ব-মূর্তি ধারণ করল ফগ। ঘরে ঢুকে কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি লিখেছিস?'

নোটবুক সহ হাতটা পেছনে নিয়ে গিয়ে কাঁপা গলায় বলল বব, 'কিছু না, চাচা!'

'আমি দেখলাম লিখছিস। মিথ্যে বলছিস কেন?' ববের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল ফগ। 'বাহ্, একেবারে সেজেগুজে আছে রাত দুপুরে! বেরোচ্ছিলি নাকি কোথাও?'

'না, শীত লাগছিল তো, তাই...'

'তাই জুতোও পরেছিস! মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা পাস না!' হাত বাড়াল, 'দেখি, কি লিখেছিস!'

হাত পেছন দিকে নিয়ে গিয়ে মরিয়া হয়ে বব বলল, 'অন্যের ডায়েরী দেখা অন্যায়, চাচা! ভীষণ অন্যায়!'

রেগে লাল হয়ে গেল ফগ। 'কি! আমাকে ন্যায়-অন্যায় শেখাতে আসিস! ওই মিসেস হ্যাগারসন তোর মাথাটা খেয়েছে! দাঁড়া, আজ মাথা ঠিক করে ছেড়ে দেব!'

এগিয়ে এসে নোটবুকটা কেড়ে নিল সে। পকেটে রেখে রান্নাঘর থেকে বেত নিয়ে এল। 'মুখে মুখে তর্ক করা আজ আমি বের করব তোর! দেখি, হাত পাত!'

হাত না পাতলে শরীরের অন্য জায়গায় বাড়ি পড়বে। ব্যথার কমতি নেই। অগত্যা একটা হাত বাড়িয়ে দিল বব। শপাং করে বেতের বাড়ি পড়তেই 'মাগ্গোহ্' করে ককিয়ে উঠল।

ফগ বলল, 'এটা মিথ্যে কথা বলার জন্যে! ওই হাত দেখি!'

আবার বাড়ি পড়ল।

ফগ বলল, 'এটা বেয়াদবির জন্যে! আজ ছেড়ে দিলাম। আর যদি করতে দেখি, পিঠের ছাল তুলে ফেলব!'

কাঁদতে কাঁদতে বব বলল, 'কেন যে বাবা আমাকে মরতে এখানে পাঠিয়েছিল! ভেবেছিলাম, চাচার কাছে বেড়াতে যাচ্ছি, কত মজাই না হবে! এমন জায়গায় মানুষ আসে! কাল সকালে উঠেই চলে যাব আমি!'

'যেখানে খুশি যা। নোটবুক পাবি না,' বলে বেরিয়ে এল ফগ। তার দৃঢ় বিশ্বাস বাইরে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়েছিল বব। তাই বাইরে থেকে দরজার ছিটকানি লাগিয়ে দিল, যাতে বেরোতে না পারে।

রাতের অভিযানের এখানেই ইতি। কি আর করবে? বিছানায় পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল বব।

ঘরে এসে নোটবুকটা খুলল ফগ। যে পাতায় সূত্রের তালিকা লেখা, তার পরের পাতাটা খুলেই হাত স্থির হয়ে গেল। নোটটা পড়ল। কপালে উঠল চোখ। তাহলে এই ব্যাপার! নিশ্চয় কিশোর দিয়েছে ববকে এই তথ্য। লুটের মাল উদ্ধার করে ক্যাপ্টেনকে খবর দিত ওরা। তিনি এসে ববের প্রশংসা করতেন। পুলিশ হয়েও কোন খবর জানত না বলে বকা দিতেন ফগকে। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে। এখনই যাবে মালগুলো উদ্ধার করতে। ববের ওপর রাগ আরও বাড়ল। তার নিজের ভাতিজা যে 'বদ' ছেলেমেয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারই সঙ্গে বেঈমানি করবে, ভাবতে পারেনি। থাক, আরও শাস্তি তোলা রইল ববের জন্যে। ভালয় ভালয় মালগুলো উদ্ধার করে ফিরে আসি—ভাবল সে, তারপর সকালে দেখাব মজা!

জামা-কাপড় পরে তখুনি বেরিয়ে পড়ল ফগ।

ভীষণ শীত। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওঠার সময় হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় শরীর যেন জমে যেতে চাইল। নীরব রাত্রি। কোথাও কোন শব্দ নেই। সেদিনকার রহস্যময় আলোও দেখা যাচ্ছে না আজ। আকাশে একফালি ঘোলাটে ভূতুড়ে

চাঁদ।

আবছা অন্ধকার আকাশের পটভূমিতে অস্পষ্ট ফুটে উঠল পোড়োবাড়ির অবয়ব। আরও সতর্ক হলো সে। ওখানে ডাকাতেরা থেকে থাকলে তার আগমন টের পেয়ে যেতে পারে, তাই যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগোচ্ছে।

খুব সাবধানে বাড়িটায় ঢুকল সে। একটা ইঁদুর দৌড়ে গেল। মাথার ওপর নড়ে উঠল একটা পেঁচা, তারপর ডানা মেলে ছায়ার মত নিঃশব্দে উড়ে এল, চলে গেল ফগের প্রায় গাল ছুঁয়ে, তাকে ভীষণ চমকে দিয়ে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ফগ। যখন বুঝল কেউ নেই, টর্চ জ্বালল। নির্জন একটা ধ্বংসস্তূপ। দেয়াল আর ছাতে অসংখ্য ফুটো, স্তূপ হয়ে আছে ইঁট-সুরকি। কাঠের মেঝেতেও ফোকরের অভাব নেই। পচে গেছে। পা দিতেই ভয় লাগে, কখন ভেঙে পড়ে।

একগাদা পুরানো বস্তা দেখা গেল কোণের দিকে। ফগের মনে হলো ওগুলোর নিচেই লুটের মাল লুকানো আছে। একটা একটা করে বস্তা তুলে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল সে। ধুলোর মেঘ উড়তে লাগল। বিশ্রী গন্ধ। নাকে ধুলো ঢুকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, হাঁচি আসতে চায়।

শেষ পর্যন্ত চেপে রাখতে পারল না সে। আর ফগের হাঁচি মানে ভয়াবহ ব্যাপার। বিকট শব্দে হ্যাঁচচোহ্ করে উঠল। আধ মাইলের মধ্যে কোন ডাকাত থেকে থাকলে আর পোড়োবাড়ির ত্রিসীমানায় আসবে না।

বস্তার নিচে কিছু পাওয়া গেল না। পুরানো কিছু বাক্স পড়ে আছে। সেগুলোতে খুঁজতে লাগল। শান্তি নষ্ট হওয়ায় রেগেমেগে বেরিয়ে এল কয়েকটা ইঁদুর। একটা তো এমন রাগা রাগল পুলিশ বলে আর রেয়াত করল না ফগকে, দিল আঙুলে কামড়ে। টর্চ দিয়ে বাড়ি মারল সে। ইঁদুরের গায়ে না লেগে বাড়িটা লাগল দেয়ালে। নিভে গেল টর্চ। শত টেপাটেপি করেও আর জ্বালানো গেল না। ঝামেলা! নিশ্চয় বাল্বটা গেছে! রাগ করে টর্চটাই দেয়ালে ছুঁড়ে মারল ফগ।

পকেটে দিয়াশলাই আছে। বের করে একটা কাঠি জ্বালল। আরেক কোণে আরও কতগুলো বস্তা পড়ে আছে। সেদিকে এগোল সে। আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতে ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিল পোড়া কাঠিটা। মেঝের পচা কাঠ ভেঙে গিয়ে একটা পা গেল ঢুকে। অনেক টানাটানি করে বের করতে হলো সেটা।

গা এতটাই গরম হয়ে গেল, কোট খুলে ফেলতে হলো। বস্তার গাদার কাছে পৌঁছে কাঠি জ্বেলে জ্বেলে খুঁজতে শুরু করল। কি আছে? গহনার বাক্স? টাকার বাক্স? শক্ত কি যেন আঙুলে লাগতে ধক করে উঠল বুক। গহনার বাক্স বলেই মনে হলো!

বস্তার ভেতর থেকে টেনে বের করল ওটা। অন্ধকারেই খুলল। ডালার ভেতরে হাত ঢোকাতে কি যেন ফুটল আঙুলে। উহ্ করে উঠল। কি আছে দেখার জন্যে কাঠি জ্বালতে বিরক্তি আর হতাশায় ছেয়ে গেল মন। পুরানো পেরেকে বোঝাই বাক্স।

হাল ছাড়ল না ফগ। পরের একটা ঘণ্টা সাধ্যমত খোঁজাখুঁজি করল। টর্চটা থাকলে অনেক সুবিধে হত। ধুলো পড়া পুরানো কম্বল, বস্তা, খবরের কাগজের

গাদা, কোন কিছুই বাদ দিল না। পুরানো বাক্সগুলোর ভেতরে, ভাঙা বাক্স উল্টে, দেয়ালের গর্ত আর ফুটোগুলোয় উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখল। পাওয়ার মধ্যে পেল অগণিত ইঁদুরের বাসা। ব্যস, আর কিছু না।

হাত দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে গিয়ে সারা মুখে কালিঝুলি লাগাল। ধুলোয় চটচটে হয়ে গেছে ঘামে ভেজা মুখ। অন্ধকারেই ভ্রূকুটি করল সে। বিড়বিড় করল, 'কিচ্ছু নেই এখানে! যত শয়তানি ওই কিশোর ছোঁড়াটার! ওকে আমি···ওকে আমি···'

কিশোরের কি ভয়াবহ অবস্থা করবে, বলা শেষ হলো না। মাথার ওপর তীক্ষ্ণ কিঁচকিঁচ শব্দ! থমকে গেল যেন হৃৎপিণ্ড। খাড়া হয়ে গেল চুল। স্থির হয়ে গেল হাত-পা। ঢোক গিলতেও ভয় লাগছে। কিসে করল ওই ভয়ানক শব্দ? গলা টিপে খুন করা হচ্ছে কাউকে?

গালে হালকা পরশ বোলাল কিসে যেন। পরক্ষণে কানের কাছে আবার সেই ভয়াবহ শব্দ। আর সহ্য করতে পারল না ফগ। ঘুরেই দৌড় মারল। একছুটে একেবারে বাইরে। সেখানে পৌঁছেও রেহাই নেই। কপাল মন্দ। সুরকির গাদায় হোঁচট খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ল ধুড়ুম করে।

হুতুম পেঁচার বাসায় ছানা। বাসায় হামলা হওয়ার ভয়ে মানুষ নামক আপদটাকে আক্রমণ করেছে সে। বাইরে বেরোনোর পরও ছাড়ল না। ফগ উঠে দাঁড়ানোর পর আরেকবার তার মাথার কাছে উড়ে এসে ঠোকর মারার চেষ্টা করল। তারপর যথেষ্ট ভয় দেখানো হয়েছে ভেবে ফিরে গেল বাসায়।

কিন্তু ফগ আর ফিরে তাকাল না পোড়োবাড়ির দিকে। বিশাল শরীর নিয়েও অস্বাভাবিক দ্রুত পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ছুটে নামতে লাগল দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। বুকের খাঁচায় পাগল হয়ে গেছে হৃৎপিণ্ডটা। ঘাম ঝরছে কপাল বেয়ে। কেন যে মরতে গিয়েছিল ডেভিলস হিলের পোড়োবাড়িতে! বব যেতে চেয়েছিল, তাকেই বরং যেতে দেয়া উচিত ছিল!

ঢালের নিচে নামার পর খেয়াল করল, ডান গোড়ালিটাতে ব্যথা। ঠিকমত পা ফেলতে পারছে না। কখন মচকে গেছে তীব্র উত্তেজনায় টেরই পায়নি।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি ফিরল সে। ময়লা কাপড়-চোপড় খুলে সিঁড়ির কাছে ফেলে রাখল। এই শীতের মধ্যেও প্রচুর পানি ঢালতে হলো হাত-মুখের কালি আর শরীরের অন্যান্য জায়গার ময়লা পরিষ্কারের জন্যে।

বিছানায় এসে যখন উঠল ফগ, শরীরটা প্রায় অবশ হয়ে গেছে।

চোদ্দ

সকালে নাস্তার টেবিলে মুখ গোমড়া করে রাখল চাচা-ভাতিজা দু-জনেই। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না। ফগের সারা শরীরে ব্যথা। গোড়ালির ব্যথা পুরোপুরি সারেনি। আঙুলে ইঁদুরের কামড়ের ক্ষত আর মরচে পড়া পেরেকের খোঁচা, দুটোই যন্ত্রণা দিচ্ছে। রাতের ব্যর্থতার কথা ভুলতে পারছে না সে। ভাবলেই রাগ হচ্ছে।

বব ভুলতে পারছে না তার চাচার নিষ্ঠুরতার কথা। নীরবে পরিজের প্লেটে চামচের খোঁচা দিচ্ছে সে, তুলে তুলে মুখে পুরছে।

এক সময় ফগ আদেশ দিল, 'যা তো, ডিমটা ভেজে নিয়ে আয়।'

জবাব দিল না বব। উঠলও না। তার খাওয়া খেয়ে যেতে লাগল।

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ফগের। গর্জে উঠল, 'কি হলো, উঠছিস না!'

'না,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল বব।

'কী!' আরও জোরে চিৎকার করে উঠল ফগ। 'বেয়াদব! বেতের বাড়ির কথা ভুলে গেছিস!'

'না, ভুলিনি। আর ভুলিনি বলেই তোমার আর কোন কথা শুনব না আমি। আজই বাড়ি চলে যাব। চাচার বাড়ি বেড়াতে এসে আক্কেল আর কম হয়নি!'

ভাতিজার এই বেয়াদবি হজম করতে কষ্ট হলো ফগের। তবে হুমকিতে ভয়ও পেল। ববের ওপর অত্যাচার করেছে, এটা তার ভাই আর ভাবী শুনলে নিশ্চয় ভাল ভাবে নেবে না। আর কিছু বলল না সে। নিজেই উঠে গেল ডিম ভেজে আনার জন্যে।

মুখে বললেও, এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কোন ইচ্ছে নেই ববের। কেউ নেই ওখানে। একা থাকা সম্ভব নয়। তা ছাড়া এখানকার রহস্যটারও কোন সমাধান হয়নি। একটা হুমকি দিয়ে দেখেছে কেবল, চাচার কি প্রতিক্রিয়া হয়। চাচা যে গতরাতে কিছু পায়নি, খালি হাতে ফিরেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পেলে ভোরে উঠেই তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিত। লুটের মাল নিয়ে ক্যাপ্টেনের কাছে রওনা হয়ে যেত। পায়নি বলেই মুখ কালো, মেজাজ খারাপ।

মুসাদের বাড়িতে এল বব। শুধু ফারিহাকে পেল। অন্য তিনজন গেছে কোরানসন ফার্মে, মুরগি আর ডিম কিনতে। মুসার আম্মা পাঠিয়েছেন।

ফার্মটা কোথায় জেনে নিয়ে তিন গোয়েন্দাকে খুঁজতে চলল বব।

গাঁয়ের ভেতরের রাস্তা ধরে এগোল সে।

পেছন থেকে একটা গাড়ি এগিয়ে এল।

মুখ তুলে তাকাল বব। গাড়িতে দু-জন লোক। তার পাশ দিয়ে চলে গেল গাড়িটা। কয়েক গজ সামনে দাঁড়িয়ে গেল। তাকিয়ে আছে পেছনের সীটে বসা লোকটা।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার। হাত নেড়ে ডাকল ববকে। সে কাছে গেলে জিজ্ঞেস করল, 'খোকা, পোস্ট অফিসটা কোন দিকে বলতে পারবে?'

'হ্যাঁ, পারব,' মাথা কাত করল বব। 'ওই যে, ওদিকে। বাঁয়ে মোড় নিয়ে পাহাড়ের দিকে সামান্য এগোলেই পেয়ে যাবেন...'

'এসো না, একটু দেখিয়ে দাও না আমাদের,' দরজা খুলে দিল ড্রাইভার। 'প্লীজ!'

দ্বিধা করতে লাগল বব।

পাঁচ ডলারের একটা নোট বের করে দোলাল পেছনের লোকটা। বলল, 'দেখিয়ে দিলে এটা পাবে।'

তখনই সন্দেহ করা উচিত ছিল ববের, ব্যাপারটা মোটেও স্বাভাবিক নয়। শুধু

পোস্ট অফিস দেখিয়ে দেয়ার জন্যে পাঁচ ডলার ব্যয় করতে চাইবে না কেউ।

আর দ্বিধা করল না বব। গাড়িতে উঠে বসল।

পোস্ট অফিসের কাছে থামল না ড্রাইভার। গতিও কমাল না। বরং আরও বাড়িয়ে দিয়ে বাড়িটা পার হয়ে চলে এল।

'আরে আরে, ছেড়ে এলেন তো!' বলে উঠল বব।

মুচকি হাসল ড্রাইভার, 'হ্যাঁ।'

'নামবেন না?'

'না।'

'কিন্তু আমাকে নিয়ে চলেছেন কোথায়?'

'সেটা গেলেই দেখবে। অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর শিক্ষা তোমাকে দেয়া হবে।'

'আমি নাক গলিয়েছি!' বব অবাক। 'কার ব্যাপারে? কিছু তো বুঝতে পারছি না!'

'তা-ও পারবে,' কথা বলল পেছনের লোকটা। তার নাম ডোনার, মোটর গ্যারেজের মালিক, এটা জানা নেই ববের। 'সব সময় অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো তোমার স্বভাব, কিশোর পাশা। এবার তোমাকে শায়েস্তা করা হবে ঠিকমত। সেদিন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিলে আমার গ্যারেজে, চাকা মেরামতের ছুতো করে, তাই না? উদ্দেশ্যটা কি বলে ফেলো তো?'

আকাশ থেকে পড়ল বব। ভয়ও পেল। বলে কি লোকটা! বলল, 'দেখুন, আপনারা ভুল করছেন। আমি কিশোর পাশা নই। ববর‍্যাম্পারকট। আমার চাচা পুলিশ।'

'তাই নাকি?' খিকখিক করে হাসল লোকটা। 'কিছু না জানার ভান করছ? লাভ হবে না। এ সব তোমার চালাকি। ভীষণ চালাক ছেলে তুমি, পত্রিকাতে পড়েছি।'

চুপ হয়ে গেল বব। কথা খুঁজে পেল না। প্রথমে পাহাড়ে আলো, তারপর পত্রিকায় ডাকাতির খবর, সব শেষে কিডন্যাপিং! কিশোরের প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে। ববের সন্দেহ রইল না আর, কিডন্যাপারদের হাতে পড়েছে। তবে তাকে কিশোর ভাবছে কেন লোকগুলো, বুঝতে পারল না।

ডোনারের গ্যারেজ থেকে কয়েক মাইল দূরে বড় একটা ছাউনিতে নিয়ে আসা হলো তাকে। বেরোতে বলা হলো। ছাউনির ভেতরে একটা কাঠের মই ওপরে আরেকটা ছোট কাঠের ঘরে উঠে গেছে। সেখানে উঠতে বাধ্য করা হলো।

ডোনার বলল, 'চিৎকার করবে না বলে দিলাম, খবরদার! মারা পড়বে তাহলে! খাবার, পানি, সবই দেয়া হবে তোমাকে। শয়তানি করলে কিছুই পাবে না। না খেয়ে থাকতে হবে তখন। এমন শিক্ষা দেব, কোন দিন যাতে আর কারও ব্যাপারে নাক গলানোর সাহস না পাও! দিনটা থাকো এখানে, রাতে বের করে আরও ভাল জায়গায় নিয়ে যাব।'

বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে চলে গেল লোকগুলো। খড়ের ওপর বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগল বব—ঘটনাটা হলো কি! মাথায় কিছু ঢুকছে না তার।

কিশোর ভেবে তাকে ধরে আনা হয়েছে। কিন্তু কেন? বুঝল, একমাত্র কিশোরই দিতে পারবে এর জবাব।

বেরোনোর চেষ্টা করল না সে। জানালা নেই, একটা মাত্র দরজা, তা-ও বাইরে থেকে লাগানো। চেষ্টা করেই বা লাভ কি? তা ছাড়া লোকগুলোর হুমকি উপেক্ষা করে কোন কিছু করার মত অত সাহসও নেই তার।

দেড়টার দিকে দরজা খুলে গেল। শুধু রুটি আর পানি দিয়ে গেল একটা লোক। আর কিছু না। খিদেয় তা-ই গোগ্রাসে গিলল বব।

সন্ধ্যা হলো। অন্ধকার নামার পর আবার খুলে গেল দরজা। খাবার দিয়েছিল যে লোকটা সে এসে ডাকল, 'এসো।'

মই বেয়ে নেমে এসে বব জানতে চাইল, 'কোথায় নেবেন?'

জবাব দিল না লোকটা।

আবার গাড়িতে তোলা হলো ববকে। সকালে যে দু-জনকে দেখেছিল, ওরাই আছে এখনও, তবে এখন সামনে বসেছে দু-জনেই। তাকে একা বসানো হলো পেছনে।

চলতে শুরু করল গাড়ি।

সারাটা দিন একলা বসে বসে ভেবেছে আর ভেবেছে বব। সে যে আটকা পড়েছে, এটা কোন ভাবে কিশোরদের জানানো দরকার। কিন্তু জানাবে কি ভাবে? গাড়িতে তোলার পর মরিয়া হয়ে উঠল সে।

পকেটে হাত দিতে গিয়েই হাতে ঠেকল জিনিসগুলো। পোড়োবাড়িতে পাওয়া সূত্রগুলো এখনও পকেটেই আছে। চকিতে একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। কিশোররা সবাই এগুলো দেখেছে। আবার দেখলে চিনতে পারবে। ববের বিশ্বাস, ও নিরুদ্দেশ হয়েছে শুনলে তাকে খুঁজতে বেরোবেই ওরা।

যে বুদ্ধি করতে চাইছে, তাতে আশা প্রায় নেই বললেই চলে। কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, জানে না। হয়তো গ্রীনহিলস থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া হবে। জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে দেখার চেষ্টা করল কোন পথে চলেছে চিনতে পারে কিনা। অন্ধকারে বুঝতে পারল না।

এই সময় গ্রীনহিলসের পোস্ট অফিসটা চোখে পড়ল তার। আলো দেখে চিনতে পারল। জানালাটা খুলতে পারলে হত। কিন্তু লোকটা কি বাধা দেবে?

খুলতে গেল বব।

সঙ্গে সঙ্গে ফিরে তাকাল ড্রাইভারের পাশের লোকটা, অর্থাৎ ডোনার। ধমক দিয়ে বলল, 'জানালা খুলছ কেন? চিৎকার করার ইচ্ছে?'

'না না,' জোরে জোরে মাথা নাড়ল বব। 'আমার বমি আসছে! জানালা খুলতে না দিলে গাড়িতেই বমি করে দেব!'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে মাথা ঝাঁকাল ডোনার, 'ঠিক আছে, খোলো! কোন চালাকি করবে না!'

তাড়াতাড়ি জানালার কাঁচ নামিয়ে মাথা বের করে ওয়াক ওয়াক শুরু করল বব। অভিনয় ভালই করছে। ধরতে পারল না লোকগুলো।

ধমক দিল লোকটা, 'খবরদার, এক ফোঁটা যেন ভেতরে না পড়ে!'

তাতে সুবিধেই হলো ববের। মুখ বাইরে বের করে রেখে এক এক করে ফেলতে লাগল বোতাম, সিগারেটের গোড়া, পেন্সিল, কম্বলের টুকরা, রুমাল। থেকে থেকেই ওয়াক ওয়াক করছে। ফলে কিছু সন্দেহ করল না লোকগুলো।

সব ফেলা শেষ হলে মাথা ভেতরে নিয়ে এসে আরাম করে সীটে হেলান দিল। অনেক বমি করে যেন এলিয়ে পড়েছে ক্লান্ত ভঙ্গিতে।

ফিরে তাকিয়ে ডোনার জিজ্ঞেস করল, 'ভাল লাগছে এখন?'

'হ্যাঁ,' কোনমতে জবাব দিল বব। নিজের বুদ্ধি দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেছে। ঠিক করে ফেলল, সুযোগ পেলেই ব্যাপারটা নিয়ে একটা কবিতা লিখে ফেলতে হবে।

পনেরো

ভীষণ রাগ হচ্ছে ফগের। সারাটা দিন উদ্বিগ্ন হয়ে ববের ফেরার অপেক্ষা করেছে। সেই কখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাতও অনেক। এখনও ফিরছে না বব। নিশ্চয় মুসাদের ওখানে আছে। চাচার সঙ্গে রাগ করে হয়তো ওখানেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উঠে পড়ল ফগ। কাপড় পরে মুসাদের বাড়ি রওনা হলো। ভাবছে, ভাই-ভাবীর আর পরোয়া করবে না। ধরে এমন ধোলাই দেবে, জনমের জন্যে শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দেবে। ডেঁপো ছোঁড়াদের মাঝে মাঝে শাস্তি না দিলে ঠিক থাকে না ওরা।

কিন্তু মুসাদের বাড়ি এসে ভাতিজাকে পেল না ফগ। ভাবল, ওরা লুকিয়ে রেখে মিথ্যে কথা বলছে। সে-জন্যে মুসার আম্মার সঙ্গে দেখা করল।

মুসা আর ফারিহাকে বার বার জিজ্ঞেস করলেন মিসেস আমান। শেষে নিশ্চিত হলেন, ববের খবর ওরা সত্যি জানে না।

এইবার চিন্তিত হয়ে পড়ল ফগ। হলো কি ছেলেটার? সত্যি সত্যি বাড়ি চলে যায়নি তো? না, তাহলে ব্যাগ-সুটকেস নিয়েই যেত। ওগুলো তার ঘরেই আছে। দেখেছে সে। তাহলে কোথায় গেল?

কিশোর আর রবিনদের বাড়িতেও খুঁজল ফগ। কিন্তু ওরাও ববের খবর বলতে পারল না।

যতটা রাগ নিয়ে বেরিয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি দুশ্চিন্তা নিয়ে বাড়ি ফিরে এল ফগ। এই রাতের বেলা ববকে কোথায় খুঁজতে যাবে, বুঝতে পারছে না।

সারারাত বাড়ি ফিরল না বব। সকাল ন'টার দিকে আর থাকতে না পেরে ওদের বাড়িতে ফোন করল। কেয়ার টেকার জানাল, বব যায়নি। আকাশ ভেঙে পড়ল যেন ফগের মাথায়। গেল কোথায় ছেলেটা? হাজার রকম বাস্তব-অবাস্তব কল্পনা মাথায় ঢুকতে লাগল তার। মনে মনে বলতে লাগল, বব, তুই চলে আয়! চলে আয়! আর কিচ্ছু বলব না তোকে! যত দুষ্টুমিই করিস, মাপ করে দেব! শুধু

তুই বাড়ি ফিরে আয়!

না, আর বসে থাকা যায় না। দরকার হলে ববের নিরুদ্দেশ সংবাদ ক্যাপ্টেনকে জানাবে। জানাতে এমনিতেও হবে। চব্বিশ ঘণ্টার বেশি কেউ নিখোঁজ থাকলে, সেটা পুলিশের এক্তিয়ারে চলে আসে। তাকে খোঁজার দায়িত্ব তখন পুলিশের।

বেরোতে যাবে ফগ, এই সময় বাজল টেলিফোন। ভাবল, নিশ্চয় ববের কোন খবর। থাবা দিয়ে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল সে।

ফোন করেছে কিশোর। বব এসেছে কিনা, জানতে চাইল।

মন এতটাই দুর্বল হয়ে গেছে ফগের, কিশোরের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করল না। বলল, 'না, আসেনি তো।'তোমরা কোন খবর পেয়েছ?'

'না।'

'আপনি কিছু করছেন না?'

'হ্যাঁ, খুঁজতে বেরোব ভাবছিলাম, এই সময় তুমি ফোন করলে। ক্যাপ্টেন রবার্টসনকেও খবরটা জানাতে হবে।' দ্বিধা করল ফগ। তারপর লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞেসই করে ফেলল, 'কিশোর, কি মনে হয় তোমার, এই ঘটনার সঙ্গে ডেভিলস হিলের আলো জ্বলার কোনো সম্পর্ক আছে? ববকে নাকি ডাকাত আর কিডন্যাপারদের কথা কি বলেছিলে?'

'তা তো বলেইছিলাম। আসলে আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। একটা অনুরোধ রাখবেন? এখুনি ক্যাপ্টেনকে খবরটা জানানোর দরকার নেই। একটা দিন সময় দিন আমাদেরকে, চেষ্টা করে দেখি কিছু করা যায় কিনা।'

জলে ডোবা মানুষের অবস্থা হয়েছে ফগের–খড়কুটো যা পায় তাই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। ববের নিরুদ্দেশের সংবাদটা ক্যাপ্টেনকে জানাতে ইচ্ছে করছে না তার। কিছু ঘটেছে কিনা, তিনি জিজ্ঞেস করবেনই। বাধ্য হয়ে তখন নিজের অতি শাসনের কথা বলতে হবে, ছেলেটাকে বেতের বাড়ি মেরেছে বলতে হবে। সেটা ভাল ভাবে নেবেন না ক্যাপ্টেন।

এ সব কথা ভেবে নিয়ে কিশোরকে বলল ফগ, 'ঠিক আছে, শুধু একদিন। আজ রাতের মধ্যে যদি খুঁজে বের করতে না পারো, কাল সকালে অবশ্যই রিপোর্ট করতে হবে ক্যাপ্টেনের কাছে। এর বেশি আর দেরি করা উচিত হবে না।'

এই প্রথম ফগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে লাইন কেটে দিল কিশোর. চারপাশ ঘিরে থাকা উৎকণ্ঠিত বন্ধুদের শোনাল খবরটা।

ষোলো

জরুরী মীটিঙে বসল গোয়েন্দারা। ফারিহাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কাল ঠিক কখন এসেছিল বব, ঘড়ি দেখেছ?'

'সাড়ে দশটা।'

'কখন ফিরবে বলেছিল কিছু?'

'না। তোমরা কোরানসন ফার্মে গেছ শুনে আর দেরি করেনি। তোমাদের খুঁজতে বেরিয়ে গেছে।'

'হুঁ,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'এবং তারপর থেকে আর কোন খবর নেই। সুতরাং প্রথমে এখন কোরানসন ফার্মের দিকেই যেতে হবে। সূত্র পেলে ওদিকেই পাওয়া যাবে।'

ফার্ম আর পোস্ট অফিসে একই রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। পথের ওপর পড়ে থাকা পেন্সিলের গোড়াটা প্রথমে মুসার চোখে পড়ল। পেছনে E. H. লেখা। ব্যাপারটা সতর্ক করে তুলল গোয়েন্দাদের। কয়েক মিনিট পর বাদামী বোতামটাও মুসাই কুড়িয়ে পেল। এরপর টিটুকে কাজে লাগিয়ে দেয়া হলো। ববের গন্ধ শুঁকে শুঁকে অন্য সূত্রগুলো বের করতে লাগল সে। বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে পথের পাশে কয়েক গজ দূরে ফেলে রেখেছে ফারিহার পুরানো রুমালটা, যেটার কোণে K লেখা রয়েছে। বুঝতে অসুবিধে হলো না ওদের, ববই ফেলেছে জিনিসগুলো। নিশ্চয় কিছু বোঝাতে চেয়েছে। সবগুলো না পেলেও তার ফেলে যাওয়া আরও কয়েকটা জিনিস কুড়িয়ে পেল ওরা।

বিশাল মাঠের ওপাশে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, 'আমার ধারণা টোপাজ ফলিতে আছে বব।'

'কি করে জানলে?' মুসার প্রশ্ন। 'ওখানকার রহস্যের কথা তো জানে না সে। কেন যাবে?'

'ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'এই সূত্রগুলোই তার প্রমাণ। গাড়িতে করে নেয়া হয়েছে। কিছুক্ষণ পর পর একটা করে জিনিস ফেলে গেছে আমাদের বোঝানোর জন্যে যে এই পথে নিয়ে গেছে তাকে। যতটা বোকা তাকে ভেবেছিলাম, ততটা সে নয়!'

'কিন্তু কে নিল তাকে? আর নিলই বা কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'সম্ভবত ডোনার,' জবাব দিল কিশোর।

ফারিহা বলে উঠল, 'আমি বুঝেছি কেন নিয়েছে! সেদিন ববের ছদ্মবেশে ডোনারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কিশোর। তাই রাস্তায় ববকে দেখে তাকেই কিশোর ভেবে ধরে নিয়ে গেছে ডোনার।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ফারিহার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। চাপড় মারল উরুতে। 'ঠিক বলেছ! ঘটেছে এইটাই!'

দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে এল। মাকে বলে বেরোয়নি। দেরি হলে বকবেন। তাই ফারিহাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে চলল মুসা। বাড়িতে জরুরী কাজ আছে, বলে দিয়েছে মা। তাই রবিনও রওনা হয়ে গেল। কিশোরের এ সব সমস্যা নেই। যখন খুশি গেলেই হবে। তাই টিটুকে নিয়ে এগোল সে, আরও একটু তদন্ত চালিয়ে দেখতে।

হাঁটতে হাঁটতে কোরানসন ফার্মের কাছে চলে এল ওরা।

ছোট একটা মেয়েকে একটা বাড়ির গেটে বসে পা দোলাতে দেখে এগিয়ে গেল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'এই, শোনো, কি নাম তোমার?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ঘাড় বেঁকিয়ে চোখ তেরছা করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে

রইল মেয়েটা। বোধহয় ভাবল প্রশ্ন করবে কিনা–আমার নাম খেঁদি না ভেঙচি, সেটা জেনে তোমার কি লাভ? তবে করল না। মনে হয় কিশোরের নিরীহ গোবেচারা ভঙ্গিটাই তাকে নরম করে দিল। বলল, 'মেরিনা।'

'আমার নাম কিশোর। আচ্ছা, মেরিনা, কাল সকালে এদিক দিয়ে একটা ছেলেকে যেতে দেখেছ? আমারই মত মোটাসোটা? নাম ববর‍্যাম্পারকট। পুলিশ কনস্টেবল ফগর‍্যাম্পারকটের ভাতিজা।'

'কার ভাতিজা সেটা বলতে পারব না, তবে দেখেছি। সোজা কোবানসন ফার্মের দিকে চলে গেল। তাড়াহুড়ো ছিল বোধহয়, জোরে জোরে হেঁটে গেল।'

'ফিরতে দেখেছ?'

'না।'

'তারপর আর কিছু দেখেছ?'

'সে যাওয়ার একটু পর বিরাট একটা গাড়ি এল গাঁয়ের দিক থেকে, আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তায়। আরেকটু হলে আমার গায়েই তুলে দিচ্ছিল।'

'গাড়িটা কি করল?'

'বলতে পারব না। দেখিনি। মোড়ের ওপাশে চলে গেল।'

মেয়েটাকে ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে চলল কিশোর। একটা নির্জন জায়গায় এসে পথের ওপর গাড়ির চাকা হঠাৎ ব্রেক করার চিহ্ন দেখল। চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল সেদিকে। মনে হলো, নিশ্চয় এখানেই ববকে দেখে গাড়িটা থামানো হয়েছিল। তারপর বাধা দেয়ার কেউ নেই দেখে হয়তো জোর করেই তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে। গাড়িটা সম্ভবত ডোনারের। দিনের বেলা লোকের চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে টোপাজ ফলিতে যাওয়ার ঝুঁকি নেবে না, তাই অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ববকে। রাতে ওখান থেকে বের করে এনে এই পথে ফলিতে নিয়েছে। ওই সময়ই সূত্রগুলো ফেলেছে সে।

আরও খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করল কিশোর। আর কিছু পাওয়া গেল না। বাড়ি ফিরে চলল।

খাওয়ার পর মুসাদের বাড়ি রওনা হলো সে। ছাউনিতে বসল ফারিহা আর মুসাকে নিয়ে। রবিন আসেনি। নিশ্চয় কাজ শেষ হয়নি তার।

'আজ রাতে টোপাজ ফলিতে যাব আমি,' ঘোষণা করল কিশোর। কেন যাবে, সেটা সবিস্তারে জানাল সে। তদন্ত করে কি কি জানতে পেরেছে, সব বলল।

রাতের বেলা ওরকম একটা ভয়ঙ্কর জায়গায় একা যাবে কিশোর, এটা মানতে পারল না ফারিহা। বলল, 'তারচেয়ে আরেক কাজ করো না কেন? পুলিশকে জানাও। ফগের ওপর ভরসা করতে না পারলে ক্যাপ্টেনকে বলা যায়।'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'এখনই কিছু জানাতে চাই না আমি। টোপাজ ফলিতেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওকে, এটা আমার অনুমান। ঠিক না-ও হতে পারে। শিওর না হয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলে ক্যাপ্টেনের কাছে ফালতু প্রমাণিত হতে চাই না।'

'ফারিহাকে নেয়া উচিত হবে না,' মুসা বলল। 'মা জানলে আস্ত রাখবে না আমাকে। কিন্তু আমি আর রবিন যেতে পারি তোমাকে সাহায্য করার জন্যে। কি

বলো?'

'তা পারো। কি করব, শোনো। একটা দড়ির সিঁড়ি নিয়ে যাব। আর কয়েকটা বস্তা। সিঁড়ির সাহায্যে গেট পেরোব। বস্তাগুলো ওপাশে ফেলে তার ওপর লাফিয়ে নামব। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

সতেরো

রাত সাড়ে দশটায় বেরিয়ে পড়ল কিশোর। একা। টিটুকে আটকে রেখে এসেছে তার ঘরে। সে যে বেরিয়েছে, এটা বুঝতে দেয়নি। তাহলে বেরোনোর জন্যে চেঁচামেচি শুরু করত। চাচা-চাচীকে জাগিয়ে দিত।

চাঁদ ওঠেনি তখনও। অন্ধকার। তাতে সুবিধে হলো তার। কারও চোখে পড়ার ভয় নেই।

নালার ওপরের সেই ব্রিজটা পেরোনোর পর গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আরও দুটো ছায়ামূর্তি। রবিন আর মুসা। এখানে এসে অপেক্ষা করার কথা ছিল। রবিনের কাঁধে একটা দড়ির সিঁড়ির বাণ্ডিল, ওদের গ্যারেজ থেকে জোগাড় করেছে। মুসার কাঁধে কয়েকটা চটের বস্তা।

'আসতে কোন অসুবিধে হয়নি তো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না,' জবাব দিল মুসা। 'মা-বাবা বেডরুমে। জানালা দিয়ে চুরি করে বেরিয়েছি। ভেতর থেকে জানালাটা আবার লাগিয়ে দিয়েছে ফারিহা।'

'গুড। চলো।'

নিঃশব্দে এগিয়ে চলল তিন গোয়েন্দা। টোপাজ ফলিতে এসে দেখল গেট বন্ধ। ছাউনিতে আলো জ্বলছে।

'লোকটা জেগে আছে। কোন রকম শব্দ করা যাবে না,' কিশোর বলল। 'সেদিন তো হুমকি দিল কুকুর লেলিয়ে দেবে। সত্যি আছে নাকি কুকুর?'

'কি জানি,' রবিন বলল, 'বোঝা তো যাচ্ছে না। থাকলে বিপদে পড়ব।'

'ঝুঁকি নিতেই হবে। না ঢুকলে বুঝব না বব আছে কিনা ভেতরে। তবে এদিক দিয়ে ঢোকা বোধহয় উচিত হবে না। লোকটা শুনে ফেলতে পারে।'

ঘুরে আরেক দিকে চলে এল ওরা।

আকাশ পরিষ্কার। তারার আলোয় দেয়ালের ওপরটা অস্পষ্ট চোখে পড়ে। একটা বড় গাছের ডাল দেয়ালের ওপর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সেটার সাহায্যে যে ভেতরে ঢোকা যায়, বোধহয় খেয়াল করেনি পাহারাদার, তাহলে কেটে ফেলত। তাতে দড়ির সিঁড়ি আটকাতে কষ্ট হলো না গোয়েন্দাদের। নিচে বস্তা ফেলা তো কোন ব্যাপারই না।

প্রথমে দেয়ালের অন্য পাশে নামল মুসা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রহরী কুকুর থাকলে হয় চেঁচিয়ে উঠবে, নয়তো ধরার জন্যে ছুটে আসবে। তাড়াহুড়ো করে আবার দেয়ালে উঠে পড়তে পারবে তখন সে।

কিন্তু কুকুরের সাড়া পাওয়া গেল না। কিশোরও গেট ডিঙাল। সব শেষে রবিন।

গাছের অন্ধকারে গা ঢেকে এগিয়ে চলল ওরা। কয়েকটা গাছ পর পর একটা গাছে চক দিয়ে বড় করে চিহ্ন এঁকে দিল কিশোর। যদি ওরা ধরা পড়ে এবং ফারিহার কাছ থেকে শুনে পুলিশ আসে এখানে খুঁজতে, তাহলে যাতে বুঝতে পারে ওরা এখানেই আছে।

বেশ কিছুটা এগোনোর পর বিশাল বাড়িটার অবয়ব ফুটে উঠতে লাগল গাছপালার আড়ালে। একটা আলোও নেই। অন্ধকার, নীরব রাতে কেমন ভূতুড়ে লাগছে। গায়ে কাঁটা দিল মুসার।

পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে সদর দরজার কাছে।

উঠে এল ওরা। পেরেক মেরে আটকে দেয়া হয়েছে পাল্লা, যাতে কেউ ভেতরে ঢুকতে না পারে। তারমানে পুরোপুরি নির্জন প্রাসাদ, কেউ আর এখন বাস করে না এখানে।

কিশোরের কানে কানে রবিন বলল, 'এখানে কোথায় রাখবে ওকে?'

'আছে কোথাও। এদিক দিয়ে ঢোকা যাবে না। এসো, আর কোন পথ আছে নাকি দেখি।'

যতটা না বড়, অন্ধকারে তার চেয়েও বড় লাগছে বাড়িটা। পাশ দিয়ে এগোনোর সময় মনে হলো শেষই আর হবে না। আলো জ্বলছে না, কোন শব্দ নেই। একেবারে যেন ভূতের বাড়ি।

বাড়ির পেছনে একটা পুকুর আছে। দুটো সিঁড়ি আছে বারান্দায় ওঠার জন্যে।

'আরিব্বাপরে, কত্তোবড় বাড়ি!' ফিসফিসিয়ে বলল রবিন।

'চুপ, কথা বোলো না!' মুসা বলল। 'শব্দটা শুনছ?'

'মনে হচ্ছে মাটির নিচে বড় কোন মেশিন চলছে!' কিশোর বলল।

সিঁড়ির পাশ কেটে ঘুরে আরও কিছুদূর এগোতেই দেখা গেল গ্যারেজ। আগে আস্তাবল ছিল। পরে গ্যারেজ বানানো হয়েছে। একটা দরজা খোলা। বাতাসে নড়ছে আস্তে আস্তে, আর তাতে মৃদু ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হচ্ছে।

দুই সহকারীকে নিয়ে সেটা দিয়ে ঢুকে পড়ল কিশোর। টর্চ জ্বেলে দেখতে লাগল। অনেক বড় গ্যারেজ।

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটল। ওদের সামনে অদ্ভুত শব্দ করে দেবে গেল মেঝের খানিকটা। এতটাই চমকে গেল কিশোর, টর্চ নেভানোর কথা ভুলে গেল। আরও দুই পা আগে বাড়ার পর ঘটনাটা ঘটলে গর্তেই পড়ে যেত সে।

ওর হাত খামচে ধরল রবিন, 'টর্চ নেভাও!'

নিভিয়ে দিল কিশোর।

'ব্যাপারটা কি?' ভয়ে গলা কাঁপছে মুসার।

'চলমান মেঝে,' জবাব দিল কিশোর। 'সরানোর যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে।'

কয়েকটা পিপার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ওরা। দেখতে লাগল, মেঝের ওই অংশটা আবার কখন উঠে আসে। আলো না জ্বেলেও বোঝা যাবে। মেঝেটা উঠে এলে বিশাল কালো ওই গহ্বরটা অদৃশ্য হয়ে যাবে।

কালো গর্ত মিলাল না, বরং আলোর আভাস দেখা গেল সেখানে। ধীরে ধীরে বাড়ছে। কথাও শোনা যাচ্ছে। তারপর বিচিত্র গুঞ্জন তুলে উঠে এসে আগের জায়গায় বসে গেল মেঝের দেবে যাওয়া অংশ। তাতে বসে আছে এখন তিনটে মোটরকার। সাইড লাইট জ্বলছে, হেডলাইট নিভানো। মেঝের ওই অংশটা যে এক ধরনের লিফটের কাজ করছে বুঝতে অসুবিধে হলো না গোয়েন্দাদের। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ওরা।

একটা কণ্ঠ শোনা গেল, 'সব ঠিক আছে? পাঁচ মিনিট পর পর বেরোবে। তারপর কি করতে হবে জানা আছে তোমার, ডগলাস।'

প্রায় নিঃশব্দে উঠে গেল গ্যারেজের প্রধান স্প্রিং ডোরটা। তেল দেয়া হয় নিয়মিত।

চলতে শুরু করল একটা গাড়ি। বেরিয়ে গেল গ্যারেজ থেকে। গাড়িপথ ধরে গেটের দিকে যাচ্ছে এটা না দেখলেও অনুমান করা যায়।

পাঁচ মিনিট পর বেরোল দ্বিতীয় গাড়িটা।

আরও পাঁচ মিনিট পর তৃতীয়টা।

আবার নামিয়ে দেয়া হলো গ্যারেজের দরজা। একজন মাত্র লোক দাঁড়িয়ে আছে এখন ঘরে। মোলায়েম স্বরে শিস দিতে শুরু করল।

মিনিট দুয়েক পর আবার নেমে গেল লিফট। ফোকর দেখা দিল মেঝেতে। তারপর নীরবতা এবং শুধুই অন্ধকার।

'দেখলে!' ফিসফিসিয়ে দুই সহকারীকে বলল কিশোর। 'গোলমাল সব মাটির নিচে। দেখতে চাইলে সেখানে নামতে হবে আমাদের।'

একমত হলো অন্য দু-জন। নামতে হলে দড়ি দরকার। এককোণে পাওয়া গেল মোটা দড়ি। সম্ভবত কোন গাড়ির পেছনে বেঁধে অন্য গাড়িকে টেনে আনার কাজে ব্যবহৃত হয়।

গ্যারেজের ওপরের কড়িকাঠে দড়ির একমাথা বেঁধে আরেক মাথা গর্তের মধ্যে নামিয়ে দিল ওরা। দড়ি বেয়ে এক এক করে নেমে এল নিচের অন্ধকারে। চাপা যান্ত্রিক শব্দ কানে আসছে। একপাশে কিছুদূরে মৃদু আলো দেখা যাচ্ছে। অন্ধকার চোখে সয়ে আসতেই চওড়া করিডর নজরে পড়ল। সেটা ধরে এগোল তিন গোয়েন্দা।

ঘুরে ঘুরে এগিয়েছে পথটা, অনেকটা ঘোরানো সিঁড়ির মত।

মুসা বলল, 'পাতালে নেমে যাচ্ছি নাকি আমরা!'

'পাতালে না হলেও অনেক নিচে,' কিশোর বলল। 'এটা দিয়েই উঠে আসে গাড়িগুলো, লিফটে গিয়ে দাঁড়ায়, লিফট তখন ওগুলোকে ওপরে পৌঁছে দেয়।'

করিডর শেষ হলো। সামনে বিশাল এক ওঅর্কশপ দেখা গেল। গাড়িতে বোঝাই হয়ে আছে ঘরটা। নানা রকম মেশিন চলছে। কোনোটা দিয়ে ঘষে গাড়ির গায়ের রঙ তোলা হচ্ছে, কোনোটা দিয়ে নতুন রঙ করা হচ্ছে। আরও নানা ধরনের মেশিন নানা কাজ করছে।

'কি হচ্ছে এখানে, কিশোর?' মুসার প্রশ্ন।

'গাড়ি রূপান্তরের কাজ,' জবাব দিল কিশোর। 'চুরি করে আনা হয়

গাড়িগুলো। এখানে এনে রঙ বদলে, আরও কিছু টুকিটাকি অদল-বদল করে নতুন রূপ দেয়া হয়। তারপর নিয়ে গিয়ে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল রবিন। 'বাবা বলছিল, বেশ কিছুদিন ধরে নাকি গাড়ি চোরদের উৎপাত খুব বেড়ে গেছে। চোরাই গাড়িগুলো একেবারে হাওয়া হয়ে যায়। কোথায় যায়, কি হয়, অনেক চেষ্টা করেও ধরতে পারেনি পুলিশ। এখন বুঝলাম, কি হয় ওগুলো।'

এখানে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কল্পনাও করতে পারল না তিন গোয়েন্দা, কয়েক বছর পর রকি বীচে গিয়েও গাড়ি চুরির প্রায় একই রকম একটা কেসের সমাধান করতে হবে ওদের।

আঠারো

এককোণের একটা ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল একজন লোক। তাকে দেখেই সতর্ক হয়ে গেল শ্রমিকরা। কেউ কেউ সালাম দিল।

'ওই লোকটাই ডোনার!' সহকারীদের শুনিয়ে নিজেকেই যেন বলল কিশোর, 'তাহলে সব কারসাজি ডোনার সাহেবেরই! আহা, টোপাজ ফলি উনি চেনেনই না! আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানলেন না! অথচ এখানে এসে চোরাই গাড়ির কি একখান রমরমা ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন!'

'যে গ্যারেজটায় দেখা করতে গিয়েছিলে,' মুসা বলল, 'ওটার কর্মচারীরাই এটাও চালাচ্ছে না তো?'

'মনে হয় না। তাতে জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয় আছে। সে-জন্যেই ওখানকার কাউকে এখানে কিংবা এখানকার কাউকে ওখানে রাখবে না ডোনার। তার আসল ব্যবসা এটাই, গাড়ি চুরির ব্যবসা। গ্যারেজগুলো হলো লোক দেখানো, যাতে পুলিশ তাকে সন্দেহ করতে না পারে।'

ঘণ্টা বেজে উঠল। কাজ বন্ধ করে পাশের একটা দরজা দিয়ে চলে গেল লোকগুলো। ডোনার সহ। বোধহয় পাশের ঘরে চা-নাস্তা, সিগারেট এ সব খেতে গেছে।

'এটাই আমাদের সুযোগ,' কিশোর বলল। 'সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেখতে হবে ওপরে কি আছে।'

নিঃশব্দে ঘোরানো সিঁড়িটার গোড়ায় চলে এল তিন গোয়েন্দা। খানিক আগে এটা দিয়েই নেমে এসেছিল ডোনার।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল ওরা। বেশ ছড়ানো একটা চাতালের মত আছে শেষ মাথায়। সামনে একসারি দরজা।

'আজব জায়গা!' কিশোর বলল। 'যুদ্ধের সময় তৈরি তো, নিশ্চয় গোপন কোন আস্তানা ছিল এটা। বোমাটোমা বানানো হত।'

বন্ধ দরজাগুলোর দিকে তাকাচ্ছে ওরা। ভয় লাগছে কখন কোন দরজা খুলে কে বেরিয়ে আসে ভেবে। চাতালের অন্য পাশে আরেকটা সিঁড়ি দেখা গেল, আরও

ওপরে উঠে গেছে।

'ওটা দিয়ে সম্ভবত বাড়ির নিচতলায় বেরোনো যায়,' অনুমান করল কিশোর। 'কি করব বুঝতে পারছি না–দরজাগুলো দেখব, নাকি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাব?'

ঠিক এই সময় তার কথার জবাবেই যেন কাশি শোনা গেল একটা দরজার ওপাশে। শব্দটা এত পরিচিত ওদের, চমকে উঠল। একেবারে ফগর‍্যাম্পারকটের কাশি।

'এখানে ঝামেলা এল কি করে!' দরজাটার দিকে এগোতে এগোতে বলল মুসা। বাইরে থেকে ছিটকানি লাগানো। পাল্লা খুলে ভেতরে উঁকি দিল সে। স্থির হয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে আছে বব র‍্যাম্পারকট। অবিকল চাচার মত করে কাশে।

ওদের দেখে লাফিয়ে বিছানায় উঠে বসল বব। উজ্জ্বল হলো চোখ। 'এসেছ! আমি জানতাম তোমরা আসবে! সূত্রগুলো ছড়িয়ে ফেলে এসেছিলাম রাস্তায়। দেখেছ নিশ্চয়?'

'দেখেছি,' জবাব দিল কিশোর। 'ওগুলো দেখেই তো এলাম।'

'খুব ভাল বুদ্ধি করেছিলাম, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'রবিন, বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। চোখ রাখো। কেউ আসে কিনা দেখো।' ববের দিকে ফিরল আবার। 'বব, একটা কাজ তো করেছ, আরও একটা করতে পারবে?'

'দিয়েই দেখো!' শির উঁচু করে বলল বব। শত্রুদের আড্ডায় আটকে থেকে খুব একটা ভয় পায়নি সে, বরং এই গোয়েন্দাগিরির খেলায় মজা পাচ্ছে, তার ভাবভঙ্গিতেই বোঝা গেল।

'শোনো,' কিশোর বলল, 'একটা সাংঘাতিক রহস্যের সমাধান করতে চলেছি আমরা। ডাকাতি আর কিডন্যাপিঙের চেয়ে অনেক বড় রহস্য। ইচ্ছে করলে তোমাকে বের করে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু তাহলে অপরাধীরা সাবধান হয়ে যাবে, পালাবে। তার চেয়ে যে ভাবে আছ, সে ভাবেই থাকো, বাইরে থেকে আটকে দিয়ে যাই তোমাকে। ওরা কিছু বুঝতে পারবে না। আমরা যত তাড়াতাড়ি পারি পুলিশ নিয়ে ফিরে আসব। থাকতে পারবে তো?'

'পারব। তবে ভয় লাগবে খুব। লোকগুলো মোটেও ভাল না। খালি মেরে ফেলার হুমকি দেয়।'

'মারধর করেনি তো?'

'না, তা করেনি।'

'ওরা যা বলে তাই করবে, তাহলে আর কিছু করবে না তোমাকে।'

'ঠিক আছে, যাও।'

'হীরো হয়ে যাবে তুমি, বব,' হেসে বলল কিশোর। 'পত্রিকায় খবর বেরোবে, ছবি বেরোবে তোমার। কেমন লাগবে?'

কিশোররা দেরি করলে পত্রিকায় ছবি ছাপার সুযোগটাই যেন হাতছাড়া হয়ে যাবে, তাই অস্থির হয়ে উঠল বব। অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল, 'জলদি যাও! ওরা চলে আসতে পারে! দরকার হয় আরও সাতদিন পড়ে থাকব এখানে, কু

পরোয়া নাই!'

দরজায় দেখা দিল রবিন। 'অ্যাই, জলদি বেরোও! কে জানি আসছে!'

মুহূর্ত দেরি করল না আর ওরা। বাইরে থেকে দরজায় আবার ছিটকানি তুলে দিল মুসা। চাতালের অন্য পাশে যে সিঁড়িটা আছে, ওটাতে এসে উঠল।

ওপর থেকেই দেখতে পেল, চাতালে উঠে এসেছে ডোনার। কোন দিকে না তাকিয়ে চলে গেল একটা দরজার দিকে। সম্ভবত ওই ঘরটাতে তার অফিস।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল গোয়েন্দারা। কিশোরের অনুমান ঠিক। মাটির নিচ থেকে প্রাসাদের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে উঠে এসেছে ওরা। টর্চ জ্বালল সে।

চারদিকে মাকড়সার জালের ছড়াছড়ি। ধুলো ছড়িয়ে আছে সবখানে। এক ধরনের ভাপসা গন্ধ, দীর্ঘদিন ধরে ঘর অব্যবহৃত আর বন্ধ থাকলে যা হয়।

ঘড়ি দেখল কিশোর। রাত প্রায় দুটো বাজে। বলল, 'কোনমতে গিয়ে এখন ক্যাপ্টেনকে খবরটা দিতে পারলেই হয়!'

কিন্তু বেরোনোর পথ খুঁজে পাওয়া গেল না। দরজা তো বন্ধই, জানালার পাল্লাগুলোও পেরেক মেরে আটকে দেয়া।

টর্চের আলোয় ভয়ঙ্কর লাগছে বড় বড় মাকড়সাগুলোর চোখ। কাঁপা গলায় মুসা বলল, 'আমার ভয় লাগছে! ভূতে গলা টিপে ধরবে!'

কিশোর বলল, 'যে দিক দিয়ে ঢুকেছি, সেদিক দিয়ে বেরোতে হবে! আর কোন পথ নেই!'

রবিন বলল, 'কিন্তু ওঅর্কশপের এত লোকের সামনে দিয়ে বেরোবে কি করে? কাজ সেরে লোকগুলোর না বেরোনো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।'

নিঃশব্দে আবার চাতালের কাছে নেমে এল ওরা। নির্জন। কেউ নেই। ববের ঘর থেকেও কোন শব্দ আসছে না। হীরো হওয়ার কল্পনায় বিভোর হয়ে আছে নিশ্চয় সে। তবে ভুল ভেঙেছে কিশোরের। তাকে যতটা ভীতু ভেবেছিল, ততটা সে নয়। বরং সাহসীই বলা চলে। কিংবা পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পারছে না বলে ওরকম শান্ত থাকতে পারছে।

কিশোরের নির্দেশে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে খানিকটা নেমে দেখে এল মুসা, ওঅর্কশপের লোকগুলো কি করছে। কাজ চলছে পুরোদমে। ডোনারও আছে ওখানে। তদারকি করছে।

অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। চাতালের অন্ধকার কোণে লুকিয়ে বসে রইল ওরা। সিঁড়ির দিকে চোখ।

হঠাৎ চমকে জেগে উঠল মুসা। ঘড়িতে দেখল সাড়ে পাঁচটা বাজে। তারমানে ঘুমিয়ে পড়েছিল। পাশে তাকিয়ে দেখে কিশোর আর রবিনও ঢুলছে।

ছ'টা বাজল। মাটির নিচের ঘরে একই রকম অন্ধকার, বাড়ছেও না, কমছেও না। বাইরে যে সকাল হচ্ছে এখানে তার কোন লক্ষণ নেই। কেউ এল না ওপরে, ওদের দেখল না। কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়ল কিশোর। এ ভাবে বসে থাকলে কখন যে বেরোনোর সুযোগ মিলবে, আদৌ মিলবে কিনা, কে জানে!

উঠে পড়ল সে। দুই সহকারীকে নিয়ে আস্তে আস্তে নামল সিঁড়ি বেয়ে।

সিঁড়ির গোড়ায় একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে এখন। মেরামতি শেষ হয়েছে ওটার। বাইরে বেরোনোর জন্যে রেডি। একটা বুদ্ধি এল তার মাথায়। পেছনে উঠে বসে থাকলে কেমন হয়? লরিটা বেরোলে ওটার ভেতরে থেকে ওরাও বেরোতে পারবে।

রবিনকে বলতে সে বলল, 'বুদ্ধি মন্দ না। তবে কেউ দেখে ফেললে মরব!'

'সে ভয় তো আছেই। এ ছাড়া আর কিছু করার নেই।'

অতএব সুযোগ থাকতে থাকতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে লরির পেছনে উঠে পড়ল তিনজনে। এই কোণটা অন্ধকার বলে কেউ দেখল না ওদের। আবার অপেক্ষা। কখন ছাড়ে লরি!

তবে এবার আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওদের। ড্রাইভার এসে উঠল কেবিনে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। চলতে শুরু করল গাড়িটা।

আরও দুটো ইঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো। তারমানে আরও দুটো গাড়ি বেরোতে যাচ্ছে।

ঘোরানো গলি দিয়ে এগিয়ে চলল তিনটে গাড়ি। লিফটের ওপর এসে উঠল। কয়েক সেকেণ্ড মৃদু গুঞ্জনের পর একটা জোরাল ঝাঁকুনিতে বুঝতে পারল গোয়েন্দারা, গ্যারেজে উঠে এসেছে লিফট। পাঁচ মিনিট পর পর গ্যারেজের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল তিনটে গাড়ি। লরিটা লিফটে আগে উঠলেও গ্যারেজ থেকে বেরোল সবার পরে।

গাড়িপথ ধরে এগিয়ে চলেছে লরি। ঘন গাছপালার নিচে এখনও জমাট বেঁধে আছে অন্ধকার। গাড়িতে করে বেরিয়ে যেতে পারত ওরা, তাহলে সহজ হত শহরে যাওয়া। কিন্তু গেটের কাছে চেকিং হতে পারে। তীরে এসে তরী ডোবানোর ঝুঁকি নিল না তিন গোয়েন্দা। গাড়ির গতি কম থাকতে থাকতে টপাটপ লাফিয়ে নেমে পড়ল পেছন দিয়ে।

কুকুর নেই। ভয় দেখিয়েছে পাহারাদার। না থাকাতে অবশ্য বেঁচে গেল তিন গোয়েন্দা, নইলে ভীষণ বিপদে পড়তে হত। নিরাপদে দড়ির সিঁড়ির সাহায্যে দেয়াল টপকে এল গোয়েন্দারা।

উনিশ

সারারাত ছটফট করেছে ফগ। মুহূর্তের জন্যে দু-চোখের পাতা এক করতে পারেনি। টেলিফোনের দিকে নজর। মনে হয়েছে, এই বুঝি বাজল ফোন। ববকে খুঁজে পাওয়ার খবর দিল কিশোর।

সাতটা বেজে গেল।...সাড়ে সাত...আটটা প্রায় বাজে বাজে, তখনও কোন খবর নেই কিশোরের। আর ভরসা রাখতে পারল না ফগ। সব ভয় আর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে ক্যাপ্টেনকে ফোন করার সিদ্ধান্ত নিল সে।

রিসিভার তুলতে যাবে, এই সময় থাবা পড়ল দরজায়। উত্তেজিত থাবা। ধক করে উঠল ফগের বুক। ওই যে এসে গেছে কিশোর! তিন লাফে দরজার কাছে

এসে দরজা খুলে দিল সে।

ঠিকই! কিশোর পাশাই দাঁড়িয়ে আছে। ভীষণ উত্তেজিত। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত চেহারা। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মুসা আর রবিন। ওদের অবস্থাও ভাল না।

ওদেরকে ঘরে এনে সব কথা শুনল ফগ। এই প্রথম ওদের বিরুদ্ধে যেয়ে নিজে বাহাদুরি নেয়ার চেষ্টা করল না। তাড়াতাড়ি চা-নাস্তা তৈরি করে ওদেরও দিল, নিজেও খেলো। বব ভাল আছে শুনে দুশ্চিন্তা অনেক কমেছে তার। পুরোপুরি কমবে, যখন গাড়িচোরদের কবল থেকে নিরাপদে বের করে আনতে পারবে।

এরপর অত্যন্ত দ্রুত ঘটতে শুরু করল ঘটনা। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে ক্যাপ্টেন রবার্টসনের অফিসে এল সে। সব কথা জানানো হলো ক্যাপ্টেনকে।

তক্ষুণি ব্যবস্থা নিলেন ক্যাপ্টেন। ছয় গাড়ি ভর্তি পুলিশ তৈরি হলো টোপাজ ফলিতে যাওয়ার জন্যে।

ক্যাপ্টেনও যাবেন। গোয়েন্দাদের বললেন, 'চলো, আগে তোমাদের বাড়ি পৌছে দিই।'

কিশোর বলল, 'আমরা টোপাজ ফলিতে গেলে কোন অসুবিধে আছে, স্যার?'

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন, 'আছে। এত টাকার বেআইনী ব্যবসা যারা করে, তারা বিপজ্জনক লোক। গোলাগুলি চলতে পারে। তোমাদের যাওয়া ঠিক হবে না। ওখানে যা যা ঘটবে সব বিস্তারিত জানাব তোমাদের।'

অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ি ফিরে যেতে রাজি হলো তিন গোয়েন্দা।

প্রথমে মুসাদের বাড়ি পড়ে। তাকে পৌছে দিয়ে তার মায়ের কাছে একগাদা কৈফিয়ত দিতে হলো ক্যাপ্টেনকে, যাতে শাস্তি পেতে না হয় মুসাকে।

তারপর রবিন, এবং সব শেষে কিশোরকে ওদের বাড়ি পৌছে দিলেন ক্যাপ্টেন। এরপর ডেভিলস হিলের উদ্দেশে রওনা হলো তাঁর গাড়ি।

পাহাড়ের গোড়ায় অপেক্ষা করছে ছয়টা পুলিশের গাড়ি। ক্যাপ্টেন আসতেই টোপাজ ফলির দিকে রওনা হলো গাড়ির বহর।

বাড়িটা ঘিরে ফেলল পুলিশ। মাটির নিচে থাকায় অপরাধীরা কেউ জানতেই পারল না কিছু। গাড়ির হর্নের শব্দে গেটের কাছে এসে পুলিশের গাড়ি দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল পাহারাদার গিলিসের। কিন্তু কিছু করার নেই। বসকেও খবর দিতে যেতে পারল না। খুলে দিল গেট। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হলো। তার সাহায্যেই মাটির নিচের ওঅর্কশপে নেমে এল পুলিশ।

একজন অপরাধীও পালাতে পারল না। সব ধরা পড়ল।

ববের ঘরের পাশে আরেকটা ঘরে পাওয়া গেল ডোনারকে। ঘুমাচ্ছিল। বিছানা থেকে টেনে তোলা হলো তাকে।

বব ঘুমায়নি। জেগে আছে। অপেক্ষা করছে, কখন আসবে পুলিশ, তাকে হীরো ঘোষণা করবে। তবে কাহিল হয়ে পড়েছে সে। বিশেষ করে খিদেয়।

'এই তাহলে ববর‍্যাম্পারকট,' হেসে বললেন ক্যাপ্টেন। ওকে অবাক করে দিয়ে হাত মেলালেন ওর সঙ্গে। 'হীরো বটে। ফগর‍্যাম্পারকট, এ রকম একজন ভাতিজা পেয়েছ বলে তোমার গর্ব করা উচিত।'

ফগের মনে পড়ল, এ কথা আরও একজন বলেছে–তার পাশের বাড়ির

ভদ্রমহিলা মিসেস হ্যাগারসন। কোন রকম দ্বিধা না করে মাথা ঝাঁকাল সে। বলল, 'ঠিক বলেছেন, স্যার!'

শুনে আরও অবাক হলো বব। তার চাচা এ কথা স্বীকার করেছে, বিশ্বাসই করতে পারছে না।

বন্দিদের নিয়ে মাটির নিচের ঘর থেকে বেরিয়ে এল পুলিশ। ছয়টা গাড়ি রওনা হয়ে গেল হেডকোয়ার্টারের উদ্দেশে। ফগ আর ববকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চললেন ক্যাপ্টেন।

বাড়ির সামনে এসে আরেকবার ববকে 'হীরো' বলে সম্বোধন করে, পিঠ চাপড়ে দিয়ে চলে গেলেন তিনি।

ববের হাত ধরল ফগ। তাকে বিস্মিত করে দিয়ে বলল, 'তুই একটা খুব ভাল ছেলে, বব। আয়, ঘরে আয়। আজ নিজের হাতে ডিম আর মাংস ভাজা করে খাওয়াব তোকে।'

'আর মারবে না তো?'

'ঝামেলা! বলে কি! আরও মারব! কত কষ্টে ফেরত পাওয়া গেল!'

'ঠিক আছে, আমিও আর তোমার নামে উল্টাপাল্টা কথা বলব না,' মুখ ফসকে বলে ফেলল বব।

'ঝামেলা! বলেছিস নাকি!'

নিচের দিকে তাকিয়ে রইল বব। কথাটা ফাঁস করে দিয়ে পস্তাচ্ছে। চাচার মেজাজ বোঝার ক্ষমতা তার নেই। এখুনি হয়তো ধমক দিয়ে উঠবে। মিনমিন করে বলল, 'আর বলব না, কসম!'

হাসল ফগ। ভাতিজার হাত ধরে টানল, 'আমিও আর মারব না তোকে! আয়, ঘরে আয়!'

তার ব্যাঙের চোখের মত গোল গোল চোখেও ছড়িয়ে গেল হাসি। দুর্লভ জিনিস। হ্যারিসন ওয়াগনার ফগর‍্যাম্পারকটের মুখে এ রকম নিষ্পাপ হাসি! দেখলে থ হয়ে যেত গ্রীনহিলসের কিশোর গোয়েন্দারা। পায়ে কামড়ে দেয়ার কথা ভুলে যেত টিটু।

****

বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

রাতদশটা।

ঢাকার উত্তরার অভিজাত এলাকা। কিশোরের মামা অবসরপ্রাপ্ত ডিআইজি আরিফুর রহমান চৌধুরীর বাড়ি। বসার ঘরে বসে জরুরী আলোচনা করছে তিন গোয়েন্দা কিশোর, মুসা ও রবিন।

বাইরে প্রবল ঝড়বৃষ্টি। এই অক্টোবরের শেষেও পুরোদমে ফ্যান চালাতে হয়। দিনের বেলা প্রচণ্ড গরম থাকে, সন্ধ্যার পর প্রায়ই নামে বৃষ্টি। ঢাকার এই আবহাওয়া দেখলে মনে হয় না কোনকালেও শীত পড়বে এখানে।

দশটা বাজল। ঘরে ঢুকল মোমেন মিয়া। বাড়ির দারোয়ান-কাম-কেয়ারটেকার সে। 'কিশোরভাই, একটা ছেলে দেখা করতে আসছে আপনের সঙ্গে।'

ভুরু কুঁচকাল কিশোর, 'এত রাতে? কে?'

'নাম কইল না। কইল, আপনের কাছেই খুইল্লা কইব সব। জরুরী কথা আছে নাকি।'

অবাক লাগল তিন গোয়েন্দার। কিশোর বলল, 'আচ্ছা যাও, নিয়ে এসোগে।'

মিনিটখানেক পরেই ঘরে ঢুকল ওদের চেয়ে দু'এক বছরের বড় এক কিশোর। লম্বা। সুদর্শন। এলোমেলো চুল। চুলে, মুখে পানির কণা লেগে আছে। রিকশা থেকে নামার সময় ভিজেছে।

হাতটা বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে, 'আমি অশোক। অশোক ব্যানার্জি।'

'আমি কিশোর পাশা,' অশোকের হাত ধরে ঝাঁকি দিল সে।

'জানি,' হাসল ছেলেটা। 'তুমি কিশোর পাশা। ও মুসা আমান। আর ও রবিন মিলফোর্ড। তুমি করেই বলে ফেললাম।'

'তা-ই তো বলবে,' হেসে জবাব দিল মুসা। 'আমরা তো আর তোমার গুরুজন নই। বয়েসেও বড় না।'

রবিনের সঙ্গেও হাত মেলাল অশোক। তারপর সোফায় বসল। 'নিশ্চয় অবাক হচ্ছো, তোমাদের কথা আমি জানলাম কিভাবে? বাংলাদেশের প্রায় সব কিশোরই–অন্তত যারা পত্রিকা পড়ে, তোমাদের কথা জেনে গেছে এতক্ষণে। পত্রিকায় তোমাদের সাক্ষাৎকারটা কিন্তু সাংঘাতিক হয়েছে, যা-ই বলো।'

এবার অনেক বড় পরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশে এসেছে তিন গোয়েন্দা। ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে অনেকেই, তাদের মধ্যে সেই দুর্ধর্ষ অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় বেদুইন বৈমানিক ওমর শরীফও আছে, যাকে সঙ্গে নিয়ে ওকিমুরো কর্পোরেশন

গঠন করেছে ওরা। ওদের উদ্দেশ্য, দেশে দেশে ছড়িয়ে দেবে ওকিমুরো কর্পোরেশনের শাখা অফিস। কিশোরের চাচা রাশেদ পাশা এক কথায় সহযোগিতা করতে রাজি হয়ে গেছেন। মেরিচাচীর তেমন মত নেই। তবে আপত্তিও করেননি। মুসা আর রবিনের বাবা-মাকেও রাজি করাতে তেমন বেগ পেতে হয়নি।

লন্ডনের অফিসটা খুলতে গেছে ওমর নিজে। আর তিন গোয়েন্দা চলে এসেছে ঢাকায়। বাংলাদেশের অফিসটা খুলতে। বাংলাদেশে শুধু ওকিমুরো কর্পোরেশনের অফিসই খুলবে না তিন গোয়েন্দা, একটা টিভি চ্যানেল খুলতেও আগ্রহী। নামও ঠিক হয়ে গেছে: প্রিয় টেলিভিশন, সংক্ষেপে 'প্রিয়টিভি'।

তিন গোয়েন্দার ইচ্ছে, চ্যানেলটা ছোটদের জন্যে খোলা হবে। ছোটরা এতে বেশি বেশি করে অংশ গ্রহণ করবে। প্রথম দিকে সবই ছোটদের অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে। জনপ্রিয় হলে পরে বড়দের কথাও ভাববে।

আরিফ সাহেব ওদের এ পরিকল্পনায় মহাখুশি। উৎসাহিত তো করছেনই, বলে দিয়েছেন তাঁর সাধ্যমত সহযোগিতা তিনি করে যাবেন। আপাতত ওকিমুরো কর্পোরেশনের ঢাকা অফিসটা তাঁর বাড়িতেই খোলা হয়েছে। 'প্রিয়টিভি'র জন্যে বাড়ি খোঁজা হচ্ছে।

'ইস্, মনে মনে কত যে খুঁজেছি তোমাদের,' অশোক বলল। 'আমেরিকার ঠিকানা জানলে কবেই চিঠি দিতাম।'

'তা কারণটা কি?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'আমাদের এত খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন?'

'গোয়েন্দাদের যে কারণে খুঁজে বেড়ায় মানুষ। একটা সাংঘাতিক বিপদে পড়ে তোমাদের কাছে এসেছি।' কিশোরের হাত জড়িয়ে ধরল অশোক, 'আমাকে বাঁচাও, ভাই!'

কিশোর বলল, 'সমস্যাটা কি, সেটা তো আগে বলবে। তারপরে না বাঁচানোর প্রশ্ন।'

'আমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছিল,' অশোক বলল।

একটা মুহূর্ত চুপ করে অশোকের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'চা দিতে বলব?'

মাথা নাড়ল অশোক। 'না।'

'অন্য কিছু দিতে বলব?'

'উঁহু। যে কারণে এসেছি, সেটা বরং বলি। অনেক লম্বা কাহিনী। তোমাদের সময় আছে তো?'

লম্বা কাহিনী শুনে আগ্রহ বেড়ে গেল তিন গোয়েন্দার। কিশোর বলল, 'আছে।'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল অশোক। তারপর বলতে লাগল, 'আমার সমস্ত সর্বনাশের মূল আমার এক অদ্ভুত শখ। তালাচাবি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি।'

'তালাচাবি আবার শখ হয় নাকি কারও?' না বলে পারল না মুসা।

'হয় না, কিন্তু আমার হয়েছিল,' অশোক বলল। 'খেসারতও দিতে হয়েছে সেজন্যে। হোস্টেলে থাকতাম। একদিন রুমের চাবি ভেতরে রেখে দরজা লাগিয়ে

দিয়েছিলাম। খোলার জন্যে চাবিওলাকে ডেকে আনি। ওই সময়ই আমার মাথায় ঢোকে, আবার যদি কোনদিন তালা আটকে যায় তাহলে নিজের তালা নিজেই খুলব। শুরু হলো প্র্যাকটিস। নিজের ট্যালেন্ট দেখে নিজেই অবাক হয়ে যাই। উৎসাহ বাড়ে। নানা রকম তালা কিনে এনে সেগুলো চাবি ছাড়া খুলতে থাকি। তালা খোলার বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠি। তালার জাদুকর বনে যাই। কথাটা ছড়িয়ে পড়ে সারা স্কুলে। এ কান ও কান হতে হতে কথাটা এক ভয়ানক ডাকাতের কানেও চলে যায়। আমাকে ফাঁদে ফেলার পরিকল্পনা করে সে।

'যেদিনকার ঘটনা, প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। বাড়ি ফেরার জন্যে ট্যাক্সি ডাকতে যাব, এই সময় সামনে এসে দাঁড়ায় একটা গাড়ি। যেচে পড়ে প্রায় জোর করেই লিফট দেয় লোকটা আমাকে। খানিকদূর যাওয়ার পর দেখি সামনে গাড়ির লাইন লেগেছে। রাস্তা আটকে গাড়ি চেক করছে পুলিশ। ড্রাইভার আমাকে বসতে বলে কি হচ্ছে দেখে আসার ছুতোয় গাড়ি থেকে নেমে যায়।

'সামনের গাড়িগুলোকে চেক করে করে ছেড়ে দিতে থাকে পুলিশ। এগোতে থাকে গাড়ির লাইন। পেছনের গাড়িগুলো ক্রমাগত হর্ন দিতে থাকে। আমি ভাবলাম, ড্রাইভার নিশ্চয় ল্যাট্রিন-ট্যাট্রিনে গেছে। সেজন্যে দেরি হচ্ছে। ড্রাইভ করতে জানি। তবে ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। নিজেই ড্রাইভ করে নিয়ে এগোই। ভেবেছিলাম, পুলিশ ব্যারিকেড পার হয়ে রাস্তার পাশে ড্রাইভারের অপেক্ষা করব। কিন্তু তা আর ঘটেনি। গাড়ির নম্বর দেখে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ। থানায় নিয়ে যায়। জানতাম না, গাড়িটা ছিল চোরাই গাড়ি। ওটাকে ধরার জন্যেই রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়েছিল পুলিশ। চোরাই মালসহ ধরা পড়ি। গাড়ির স্টিয়ারিঙে আমার হাতের ছাপ। যে লোকটা আসল চোর সে আর ফেরেনি। তবে তার ছাপও পাওয়া গেছে স্টিয়ারিঙে। আমার কথা বিশ্বাস করল পুলিশ। আমাকে ছেড়ে দিল।

'কিন্তু একবার কাউকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেলে সে দোষী না হলেও তার সামাজিক অবস্থান যে কোথায় নেমে যায় সেটার প্রমাণ পেতে থাকলাম। স্কুল কর্তৃপক্ষ আমার কোন কথা শুনল না। আমাকে স্কুল থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। আমার না করা অপরাধের দায় আমার বাবাকেও বহন করতে হলো। চাকরিস্থলে তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে থাকল সহকর্মীরা, যেন দোষটা তারই।

'বাড়িতে দরজা দিয়ে মনমরা হয়ে পড়ে রইলাম ঘরের মধ্যে। আমার এ ভাবে পড়ে থাকা সহ্য করতে পারল না মা। একদিন অনেক বকাঝকা করে বাইরে পাঠাল। বলল, খানিক ঘুরে আয়। বেরোলাম। আসল শয়তানটার সঙ্গে সেদিনই প্রথম দেখা হলো আমার।

'আমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখছিল তার চর। সেই ড্রাইভারটা। বাড়ি থেকে বেরোতে আমার পিছু নিল সে। রাস্তায় নির্জন একটা জায়গায় দেখা করল। তাকে দেখে প্রচণ্ড রেগে উঠলাম। কিন্তু লোকটা রাগল না। প্রায় জোর করেই আমাকে নিয়ে গেল মস্ত এক অফিসে। দেখা হলো ওর বস্ কারুণ শিকদারের সঙ্গে। অকপটে স্বীকার করল কারুণ, ইচ্ছে করেই গাড়ি চুরির প্ল্যান করে আমাকে ফাঁসিয়েছে সে। কারণ, আমাকে নাকি তার প্রয়োজন আছে। নকুল শ্যাম আর

কারণ শিকদার মিলে আমাকে পটানো শুরু করল...'

'নকুল শ্যামটা কে?' বাধা দিল কিশোর। 'ওই ড্রাইভারটা নাকি?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল অশোক। 'দু'জনে মিলে নানাভাবে পটাতে লাগল আমাকে। বোঝাল, কোথাও আমি কোন ভাল চাকরি পাব না। পুলিশে ধরেছিল শুনলে কেউ আমাকে কাজ দেবে না। তবে কারণ আমাকে কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারে। জোর করে কিছু টাকা আমার হাতে গুঁজে দিল সে। বলল এটা রাখো। তোমার চাকরি পাক্কা। আমার যখন প্রয়োজন হবে, তোমাকে খবর দেব। জিজ্ঞেস করলাম, চাকরিটা কি? বলল, পরে জানাব। বাড়ি নিয়ে গিয়ে ড্রয়ারের মধ্যে ফেলে রাখলাম টাকাগুলো। ছুঁতেও ঘৃণা হচ্ছিল।'

'তোমাকে খবর দিয়েছিল কারণ?' রবিনের প্রশ্ন।

'দিয়েছিল।'

'নিশ্চয় ডাকাতি করার জন্যে,' কিশোর বলল।

অশোক অবাক। 'তুমি জানলে কি করে?'

'তালা খোলার ওস্তাদ তুমি, তোমাকে প্ল্যান করে ফাঁসানো, আগে থেকে মোটা টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে রাখা–সব মিলিয়ে সেদিকেই কি টার্গেট করে না?'

মাথা দোলাল অশোক, 'হ্যাঁ, হয়তো তা-ই করে। কিন্তু আমি গাধা তখন কিছু বুঝতে পারিনি। যাই হোক, দিন কয়েক পরে কারণের ডাক এল। আমাকে দিয়ে ঢাকার একটা অনেক বড় গহনার দোকান থেকে প্রায় বিশ কোটি টাকার হীরা-জহরত আর গহনা ডাকাতি করাল। যে সেফে ওগুলো রাখা ছিল, ওটাতে ইলেকট্রনিক তালা লাগানো। মালিক কোনদিন কল্পনাই করেনি, ওই তালা খুলে ফেলতে পারবে কেউ।

'ডাকাতি করতে হবে শুনে কোনমতেই রাজি হতে চাইনি। কারণ আমাকে পিস্তল দেখাল। আমি বললাম, পিস্তলের ভয় আমি করি না। মেরে ফেললে ফেলুক, তা-ও ডাকাতি আমি করতে পারব না। কারণ আমাকে ভয় দেখাল, ওর কথা না শুনলে আমার বাবাকে গুলি করে মারবে সে। বলল, আমার বোনকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে। আমি রাজি না হলে ওকে নারী পাচারকারীদের কাছে বেচে দেবে। আমার বোনকে যে ধরে নিয়ে গেছে সেটা প্রমাণের জন্যে বাড়িতে ফোন করাল আমাকে দিয়ে। মা ফোন ধরে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানাল, জয়িতা বাড়ি ফেরেনি। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলাম। অন্ধকার রাস্তায় বাবার গুলিবিদ্ধ লাশটা পড়ে আছে কল্পনা করে শিউরে উঠলাম। রাজি হয়ে গেলাম ওর কথায়।'

'পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত ছিল তোমার,' রবিন বলল।

'ভুলটা তো ওখানেই করেছি। তা ছাড়া মনে করেছিলাম, গাড়ি চুরির মিথ্যে অপরাধে হলেও তো একবার থানায় গেছি, আমার কথা বিশ্বাস করবে না পুলিশ।'

'সব কথা খুলে বললে নিশ্চয় বিশ্বাস করত। কারণের অফিসটা দেখিয়ে দিতে পারতে তুমি। নকুল শ্যামকে চেনাতে পারতে।'

'পারতাম। কিন্তু প্রমাণ করতাম কিভাবে কৌশলে ওরাই আমাকে ফাঁসিয়েছে?'

'প্রমাণ পুলিশই জোগাড় করে ফেলত।'

'তখন আসলে অত কথা ভাবিইনি।'

'এখন আর ওসব বলে লাভও নেই,' কিশোর বলল। 'যা ঘটানোর তো ঘটিয়েই ফেলেছে।' অশোকের দিকে তাকাল সে, 'হ্যাঁ, তারপর? ডাকাতিটা করলে। মালগুলোর কি হলো?'

'সেটা বলতেই তো এলাম,' অশোক বলল। 'পানি খাওয়াও।'

দুই

লাফ দিয়ে উঠে ফ্রিজ থেকে পানি আনতে ছুটল মুসা। ফিরে এল পানি, কোকের বোতল আর গ্লাস নিয়ে। অশোকের সামনে রাখল।

প্রথমে পানি খেল অশোক। তারপর কোক ঢালল গ্লাসে। চুমুক দিতে দিতে আবার আগের কথায় ফিরে গেল, 'ডাকাতির মাল নিয়ে কিভাবে পালাব আমরা, আগেই ঠিক করে রেখেছিল কারুণ। ঢাকা থেকে গাড়িতে করে চলে যাব চিটাগাং। পতেঙ্গা বন্দর থেকে দূর সাগরে যাওয়ার উপযোগী বড় ট্রলারে করে সাগর পাড়ি দিয়ে মিয়ানমারে ঢুকব। ওখানকার চোরাই মার্কেটে জিনিসগুলো বিক্রি করে দিতে নাকি অসুবিধে হবে না কারুণের।

'নকুল আর আমি ছাড়াও কারুণের দলে চতুর্থ আরও একজন লোক ছিল, আমির সওদাগর নামে এক আধবুড়ো সারেং। চোরাচালান সহ ছোটখাট নানা অপরাধে কয়েকবার জেল খেটেছে। আগেই তাকে টাকা দিয়ে চিটাগাং পাঠিয়ে দিয়েছিল কারুণ, সেকেন্ডহ্যান্ড একটা ট্রলার কিনে রেডি হয়ে থাকার জন্যে। কঠোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল, সে ছাড়া ট্রলারে দ্বিতীয় যেন আর কোন লোক না থাকে।

'পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে বহু কষ্টে চিটাগাং পৌছুলাম। ট্রলারেও উঠলাম। ছেড়ে দিল ট্রলার। মাঝ সাগরে পৌছানোর পর শুরু হলো বিপত্তি। বাদ সাধল সাগর। ঝড়ে পড়লাম আমরা। পথ হারিয়ে চলে গেলাম আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের দিকে।

'দ্বীপ থেকে প্রায় মাইল পঞ্চাশেক দূরে থাকতে এক রাতে নকুলকে হাল ধরতে বলল কারুণ। গভীর রাতে ধাক্কা দিয়ে ট্রলার থেকে আমির সওদাগরকে উত্তাল সাগরে ফেলে দিল সে।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'তারমানে খুন করল?'

'হ্যাঁ,' কোকের গ্লাসে চুমুক দিল আবার অশোক। 'ব্যাপারটা নকুল আর আমি দু'জনেই দেখে ফেললাম। নকুল বলল, চেপে যাও। কিন্তু চুপ থাকতে পারলাম না। লোকটাকে কেন খুন করল, কারুণকে জিজ্ঞেস করলাম। হেসে বলল কারুণ, ভালই তো করলাম। যত বেশি লোক থাকবে, ভাগের মাল তত কমবে। যত খাটাখাটনি আমরা করলাম, পুলিশের তাড়া আমরা খেলাম, শুধু শুধু বুড়োটাকে ভাগ দিতে যাব কোন্ দুঃখে? এত পাষণ্ড লোক জীবনে দেখিনি। বললাম, তাই বলে মেরে ফেললেন! তা ছাড়া সারেং নেই, আমরা এখন মিয়ানমারে যাব কি করে? আবারও হাসল কারুণ। বলল, এতদিন ট্রলারে থেকে কি ঘোড়ার ঘাস

কেটেছি? ট্রলার চালানো শিখে ফেলেছি আমি। নকুলও মোটামুটি মন্দ পারে না।
'কিন্তু কথাটা যে ঠিক বলেনি কারুণ, সেটা বোঝা গেল কয়েক ঘণ্টা যেতে না যেতেই। নির্জন একটা দ্বীপের কিনারে ডুবো চরায় ধাক্কা লাগিয়ে বসল নকুল। ট্রলারের তলা গেল ভেঙে। অল্প পানিতে কাত হয়ে ভেসে রইল ওটা।
'নকুলকে অনেক গালাগাল করল কারুণ। হাত উঁচিয়ে বার বার মারতে গেল। কিন্তু তাতে তো আর সমস্যার সমাধান হবে না। দ্বীপে নামতে বাধ্য হলাম আমরা। কারুণ সঙ্গে করে নিয়ে গেল ডাকাতি করা হীরা-জহরতের ব্যাগটা।
'দ্বীপে একটা ঘর চোখে পড়ল। ছোট্ট কেবিন। তীরের কাছেই। বন্ধ দরজায় থাবা দিলাম। কারও সাড়াশব্দ না পেয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। কেউ নেই, তবে মানুষের বাস করার জন্যে প্রয়োজনীয় সব জিনিস আছে। ঘরে একটা ছোট চৌকি। তাতে বিছানা পাতা। তাক ভর্তি খাবার-দাবার। একটা তাকে কয়েক টিন বীয়ারও রাখা।'

'তারমানে স্বপ্ন দেখছিলে তোমরা, তাই না?' মুসা বলল।
'না, স্বপ্ন না, বাস্তব। এমনকি একটা কেরোসিনের চুলাও ছিল ঘরে। ঝড়ে পড়ার পর ট্রলারে আর রান্না করার সুযোগ হয়নি। তাই কেবিনের মধ্যে খাওয়াটা খুব জমল আমাদের সেদিন। তারপর বেরোলাম জায়গাটা ঘুরে দেখতে। ছোট্ট দ্বীপ। মাইল তিনেক লম্বা, সিকি মাইল চওড়া। পাথরে ভর্তি। যেখানে সেখানে বড় বড় গাছ আর ঝোপঝাড়ের জঙ্গল। দ্বীপটার একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো, তীরের প্রায় চতুর্দিকেই উঁচু পাড়, কোথাও কোথাও পাহাড়ের মত উঁচু, কিন্তু মাঝখানটা নিচু। উত্তর আন্দামানের মূল ভূখণ্ড ওখান থেকে বেশি দূরে না। দেখা যায়। কিন্তু যেতে হলে নৌকা লাগবে। দূরে বেশ কিছু নৌকা, ট্রলার ছড়ানো-ছিটানোভাবে চোখে পড়ল। সাগরে মাছ ধরছে। আগুন জ্বেলে সঙ্কেত দেয়ার কথা বললাম। কারুণ বলল, পরে।
'দ্বীপে পাখি ছাড়া আর একটা মাত্র প্রাণী প্রচুর পরিমাণে দেখলাম। শিয়াল। সাগরের মাঝখানে ওখানে ওই দ্বীপের মধ্যে শিয়াল এল কোথা থেকে সেটাও এক অবাক করার মত বিষয়। রূপকথার মত লাগছে না?'
'না, লাগছে না,' কিশোর বলল। 'বলে যাও।'
'রাত হলো। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। কারুণ আমাদের বস্। সুতরাং ঘরের একমাত্র বিছানাটায় শুলো সে। নকুল আর আমি মেঝেতে। পরদিন সকালে আরেকটা খুনের দিকে মোড় নিল পরিস্থিতি। নাস্তার পর বাইরে বেরোলাম। আমার সাথে বেরোল নকুল। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, বুঝতে পারছ কিছু? কিছু লক্ষ করেছ? ব্যাগটা লুকিয়ে ফেলেছে কারুণ। সমস্ত মাল সে একাই মেরে দেয়ার মতলব করেছে। আমাদেরও ভাগ দেয়ার ইচ্ছে নেই তার। ও একটা কেউটে সাপ। সুযোগ পেলেই খুন করবে আমাদেরকে ও, দেখো, আমির সওদাগরের মত।
'নকুলের কথা অবিশ্বাস করতে পারলাম না। আমি নিজেও এই কথাটাই ভাবছিলাম। কি করা যায় জিজ্ঞেস করলাম নকুলকে। নকুল বলল, নিজেকে যতটা চালাক বলে জাহির করে ও, ততটা আসলে নয়। ব্যাগটা কোথায় লুকিয়েছে জানি

আমি। মাটিতে গর্ত করে যখন রাখছিল ওটা, লুকিয়ে থেকে দেখেছি।

'বললাম, দেখলে কি হবে? আনতে তো যেতে পারব না। কারুণের কিছু করতে পারব না আমরা। ওর কাছে পিস্তল আছে। নকুল বলল, আনতে যাচ্ছেটা কে? ও আমাদের খুন করার মতলব আঁটছে যখন, আমরাই বা ওকে ছাড়ব কেন? ও যখন ঘুমিয়ে থাকবে মাথায় বাড়ি মেরে দেব ঘিলু বের করে। মালগুলো তখন আমরা দু'জনে ভাগাভাগি করে নেব।

'নকুলের মিষ্টি কথায় ভুললাম না। বুঝলাম, কারুণকে মারার পর নকুল আমাকেও ছাড়বে না। পুরো মাল সে একাই মেরে দিতে চাইবে। নকুলের কাছ থেকে জেনে নিলাম কোন্ জায়গাটায় মাল লুকিয়েছে কারুণ।

'নিজেকে বাঁচানোর পথ খুঁজতে লাগলাম। নকুল ঘরে চলে যেতেই এক দৌড়ে গিয়ে ব্যাগটা গর্ত থেকে তুলে নিয়ে একটা শিয়ালের গর্তে ভরে ফেললাম। এমন করে মাটি চাপা দিয়ে রাখলাম যাতে কিছু বোঝা না যায়। কারুণ যে গর্তে ব্যাগ রেখেছিল সেটাকেও আবার আগের মত করে মাটি দিয়ে বুজিয়ে রাখলাম।'

দম নেয়ার জন্যে থামল অশোক।

আগ্রহে ফেটে পড়ছে শ্রোতারা।

তারপর কি হলো, মুসা যখন জিজ্ঞেস করতে যাবে, আবার বলতে শুরু করল অশোক, 'খানিকক্ষণ দ্বীপের এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করে, কেবিনে ফিরে এসে দেখি তুমুল ঝগড়া বাধিয়েছে কারুণ আর নকুল। নকুলের আঙুলে একটা হীরা বসানো সোনার আংটি। সেটা দেখেই খেপেছে কারুণ। চোর বলে গালাগাল দিচ্ছে। নকুল যতই বলছে, ব্যাগে শুধু আংটিটাই বের করেছিল সে, আর কিছু নেয়নি, রাগ ততই চরমে উঠছে কারুণের। বিশ্বাস করছে না। শেষে পিস্তল বের করে চিৎকার করে উঠল, বেঈমান! চোর! তোকে আমি ছাড়ব ভেবেছিস! নকুলের বুক সই করে ট্রিগার টিপে দিল সে। ওখানেই পড়ে মরে গেল নকুল।'

আনমনে মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে বলল কিশোর, 'বড় ভয়ানক লোকের পাল্লায় পড়েছিলে তুমি!'

'তা তো পড়েইছিলাম,' বিষণ্ণকণ্ঠে বলল অশোক। 'নইলে কি আর আজ এই দশা হয় আমার! যাই হোক, নকুলকে মেরে আমার দিকে ফিরল কারুণ। শাসাল, বেঈমানের কি শাস্তি দিই আমি নিজের চোখেই দেখলে। অতএব সাবধান। চলো এখন, লাশটাকে বনের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসি। শিয়ালে খেয়ে ফেলুক।'

'কি ভয়ঙ্কর!' শিউরে উঠল মুসা। 'লোকটা মানুষ না পিশাচ!'

'তারপর কি করল শোনো না,' অশোক বলল। 'লাশের ঠ্যাং ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চলল সে। মরা কুত্তা যেভাবে ফেলে দিতে যায় মানুষ। আমি ধরছি না দেখে গালাগাল শুরু করল। কি আর করব। নকুলের দুই হাত ধরে উঁচু করলাম তাকে। ফেলে দিয়ে আসার আগে তার আঙুল থেকে আংটিটা খুলে নিয়ে পকেটে রেখে দিলাম। কারুণ সেটা দেখল না। কিংবা দেখলেও না দেখার ভান করে থাকল। বলল, চলো তো দেখে আসি, চোরটা আর কি কি জিনিস সরিয়েছে।

'আমাকে নিয়ে গর্তের কাছে গেল সে। মাটি খুঁড়ে ব্যাগটা না দেখে পাগল

হয়ে গেল। গালাগাল করে মরা নকুলের চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করতে লাগল। সে ধরেই নিল, ওই ব্যাগ নকুলই সরিয়েছে। খেঁকিয়ে উঠল আমার দিকে তাকিয়ে, হাঁ করে দেখছ কি? খোঁজো না। খুঁজে দেখো কোথায় লুকিয়ে রেখে গেছে শয়তানটা। এরপর কি ঘটত কে জানে, তখনকার মত বেঁচে গেলাম কেবিনের মালিক ফিরে আসার কারণে।

'লোকটার নাম রজন মুনিআপ্পা। আন্দামানে বাড়ি। দু'জন লোককে দ্বীপে দেখে অবাক হলো সে। কারূণ বলল, ট্রলার ডুবে যাওয়াতে দ্বীপে উঠতে বাধ্য হয়েছে। তাতে রজনের সহানুভূতিই পেলাম আমরা। রজন জানাল, দ্বীপটা সে সরকারের কাছ থেকে লীজ নিয়েছে। মাছের মৌসুমে শুঁটকি বানায় এখানে। শিয়ালগুলো তারই। পোষা শিয়াল। বনের মধ্যে খোলা ছেড়ে রাখে। প্রথমে এনেছিল এক জোড়া। অনুকূল জায়গা পেয়ে বংশ বাড়াতে বাড়াতে এখন অনেক হয়ে গেছে। এটাও তার জন্যে বেশ ভাল একটা ব্যবসা হয়েছে। এ জাতের শিয়ালের খুব কদর। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চিড়িয়াখানাগুলোতে সাপ্লাই দেয় মোটা টাকার বিনিময়ে। শুঁটকির মৌসুম ছাড়া এখানে থাকে না সে। তবে মাঝে মাঝে খাবার নিয়ে আসে শিয়ালগুলোর জন্যে। কারণ দ্বীপে কাঁকড়া, ঝিনুক, পাখির ছানা বা ডিম যা পায়, তাতে হয় না ওগুলোর।

'শিয়ালের খাবার দিয়ে আন্দামানে ফিরে যাওয়ার সময় কারূণ আর আমাকে তার বোটে করে নিয়ে যেতে চাইল রজন। ও-ভাবে যাওয়ার ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হলো কারূণকে, নইলে সন্দেহ করে বসত রজন। মেইনল্যান্ডে ফিরে গিয়ে নিশ্চয় পুলিশকে জানাত। গোপনে আমাকে বলল, এক হিসেবে বরং ভালই হলো। ওখানে গিয়ে আরেকটা ট্রলার ভাড়া করে নিয়ে ফিরে আসব।

'কিন্তু আন্দামানে গিয়ে কারূণের সঙ্গে আর থাকলাম না। প্রথম সুযোগেই পালালাম। চলে গেলাম পোর্ট ব্লেয়ারে। হীরার আংটিটা বিক্রি করে ভাড়ার টাকা জোগাড় করলাম। মানুষ পাচারকারীদের সহায়তায় চোরাপথে ঢুকে পড়লাম বাংলাদেশের সীমানায়।'

'পাসপোর্ট নেই তোমার?'

'আছে। কিন্তু বৈধপথে ঢোকার সাহস পাইনি। পুলিশ যদি জেরা শুরু করত, কোথায় গিয়েছিলাম, কেন গিয়েছিলাম, জবাব দিতে পারতাম না। তা ছাড়া চোরের মন পুলিশ পুলিশ। ইচ্ছেয়ই হোক আর অনিচ্ছেয়ই হোক, ডাকাতের দলে থেকে তাদের সহায়তা যে করেছি, তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। যাই হোক, ঢাকায় ফিরে এসেও বাড়ি ফিরলাম না। বাবার মুখোমুখি আমি হতে পারব না। বাড়িতে ফোন করে জেনে নিয়েছি আমার বোন ফিরেছে কিনা। জানলাম, ফিরেছে। ওকে আসলে কিডন্যাপ করেনি শয়তান কারূণ। স্কুল থেকে বান্ধবীর বাড়ি চলে গিয়েছিল। মা জানত না বলে দুশ্চিন্তা করছিল। সে-খবরটা ঠিকই জেনে নিয়ে কারূণকে জানিয়েছিল নকুল শ্যাম। মিথ্যে কথা বলে আমাকে ভয় দেখিয়েছিল।'

'হুঁ, কাকতালীয় ভাবে হলেও পরিস্থিতিটা তার পক্ষে চলে গিয়েছিল,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তাহলে তুমি এখন কোথায় আছো?'

'হীরার আংটি বিক্রির টাকা কিছু অবশিষ্ট আছে আমার কাছে। চকবাজারের সস্তা এক বোর্ডিং হাউসে লুকিয়ে আছি।'

চুপ করল অশোক। ঢকঢক করে এক গ্লাস পানি খেল। গ্লাসধরা হাতটা কাঁপছে তার।

সবাই চুপ। কেউ কোন কথা বলছে না।

কিশোরের দিকে তাকাল অশোক। 'আমার কথা বিশ্বাস করোনি?'

'প্রতিটি শব্দ করেছি,' জবাব দিল কিশোর । 'এ ধরনের ঘটনা ঘটে। কিন্তু আমাদের কাছে এসেছ কেন? আমরা কি করতে পারি?'

'তোমরাই পারো,' অশোক বলল। 'জিনিসগুলো তুলে এনে মালিককে ফিরিয়ে দিতে চাই।'

'পুলিশকে জানালেই পারো। মালিক যদি কেস তুলে নেয়, পুলিশ তখন সহানুভূতির দৃষ্টিতেই দেখবে ব্যাপারটা। তা ছাড়া পুলিশের সাহায্য নিলে সুবিধেও হবে তোমার। সহজেই দ্বীপে যেতে পারবে, জিনিসগুলো বের করে আনতে পারবে, কারুণও বাধা দেয়ার সাহস পাবে না।'

'কিন্তু তাতে আমার লাভটা কি হবে? প্রথমত, আমি যে দোষী নই, সেটা প্রমাণ করা কঠিন হবে। পুলিশকে যদি সন্তুষ্ট করতে পারিও, তারা আমার সঙ্গে দ্বীপে যায়, লোকে ভাববে পুলিশ আমাকে ধরে চাপ দিয়ে আমার পেট থেকে কথা আদায় করেছে। আমাকে তখন আরও বেশি করে ডাকাত ভাবতে থাকবে। কিন্তু আমি যদি নিজে নিজে মালগুলো উদ্ধার করে এনে মালিককে দিই, মালিক তখন পত্রিকার মাধ্যমে আমার নির্দোষিতা প্রমাণের চেষ্টা করবেন। আমার স্কুলের স্যারেরা বুঝতে পারবেন আসলে আমি দোষী ছিলাম না। বাবা-মা, পাড়া-প্রতিবেশীরা সবাই তখন আমার কথা বিশ্বাস করবে। যে কালিটা আমার গায়ে লেগেছে, ধুয়ে মুছে যাবে। কি, ঠিক বলিনি?'

'তা কিছুটা বলেছ। তবে পুলিশকে জানালেই ভাল হত। যাকগে। এখন আমরা কি করতে পারি?'

'তোমরা আমার সঙ্গে চলো। জিনিসগুলো বের করে আনতে আমাকে সাহায্য করো। আমি জানি, তোমরা সঙ্গে থাকলে কারুণ আমার কিছু করতে পারবে না।'

হাসল রবিন। 'আমাদের ওপর এত আস্থা?'

'হ্যাঁ। কারুণের চেয়ে অনেক বড় বড় অপরাধীকে দমন করতে পুলিশকে সাহায্য করেছ তোমরা, অনেক কঠিন সমস্যা থেকে অনেককে বাঁচিয়েছ। তা ছাড়া, পুলিশ আমাকে যতটা না করবে, তারচেয়ে অনেক বেশি বিশ্বাস করবে তোমাদের কথা।'

এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। তারপর বলল, 'তোমার কি মনে হয়, কারুণ আবার যাবে সে-দ্বীপে?'

'যাবে তো বটেই। তবে কখন যাবে সেটা বলতে পারব না।'

'কিশোর, এখনও বসে আছিস তোরা! ঘড়ি দেখেছিস ক'টা বাজে?' দরজার কাছ থেকে শোনা গেল কিশোরের মামীর কণ্ঠ। এত রাত পর্যন্ত ছেলেগুলো কি করছে দেখতে এসেছেন তিনি।

ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল সবার।

মুসা বলল, 'খাইছে! রাত দুটো বেজে গেছে!'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অশোকও আঁতকে উঠল। 'ওরিবাব্বা! তোমাদের ঘুমের বারোটা বাজালাম।'

'ও কিছু না,' হাসল কিশোর। 'এ রকম ঘুম নষ্ট করে অভ্যাস আছে আমাদের।'

'ও কে?' অশোককে দেখালেন মামী।

'আমাদের বন্ধু, মামী,' জবাব দিল কিশোর। 'অশোক ব্যানার্জি। পত্রিকায় আমাদের ছবি দেখে দেখা করতে ছুটে এসেছে।'

উঠে দাঁড়িয়ে মিসেস আরিফকে সালাম দিল অশোক।

'কিছু খাইয়েছিস ওকে?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন মামী। 'না খালি পেটেই রেখে দিয়েছিস?'

'জ্বী, কোক খেয়েছি,' অশোক জবাব দিল।

'ও তো পানি। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে তোমার। এত রাতে তো আর বাড়ি ফিরতে পারবে না। দেখি, রান্নাঘরে ঠাণ্ডা যা আছে, গরম করে দিচ্ছি।'

'না না, শুধু শুধু কষ্ট করতে যাচ্ছেন আপনি। আমার কিছু লাগবে না...'

'লাগবে তো বটেই। রাত জাগলে খিদে বেশি লাগে।' মামী চলে গেলেন রান্নাঘরের দিকে।

'তাহলে কি ঠিক করলে?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল অশোক। 'যাবে আমার সঙ্গে?'

'দেখি, ভাবতে দাও। সকালে জানাব।'

'যা-ই জানাও, সেটা যেন হ্যাঁ হয়।'

'যদি যাইও, জোগাড়যান্ত্রি করতে তো সময় লাগবে। তুমি এ ক'দিন থাকবে কোথায়?'

'কেন, চকবাজারের বোর্ডিংটাতেই থাকব। তোমাদের চিনিয়ে দেব। প্রয়োজনে আমার সাথে দেখা করতে পারবে।'

তিন

পাঁচ দিন পরের ঘটনা।

'ওই যে, স্মিথ আইল্যান্ড!' বলে উঠল মুসা। প্লেনের ককপিটে বসা সে। হাতে জয়স্টিক ধরা। পাশে বসা কিশোর। 'ওটাই ল্যান্ডফল আইল্যান্ড।'

'ম্যাপ অবশ্য তা-ই বলছে,' কিশোর বলল। মধ্য আন্দামানের একটা অখ্যাত বিমানঘাঁটি থেকে শেষ উড়েছে ওরা। ভাড়া করা এই ছোট বিমানটা নিয়ে। বহু পুরানো বিমান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের মারলিন। সেজন্যে কম ভাড়াতে পেয়েছে।

পেছনের মেইন কেবিনে বসা রবিন আর অশোককে খবরটা জানিয়ে এল

সে। এটাই ওদের গন্তব্য।

'মানিয়াফুরা গ্রামটা এখন খুঁজে বের করতে হবে,' মুসা বলল। 'অশোক বলেছিল না, ওখানে ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড আছে। তবে কতটা ভাল হবে কে জানে!'

'তবু তো আছে,' কিশোর বলল। 'আন্দামানের ট্যুরিস্ট ব্যবসাটা জমজমাট বলেই এ সব সুবিধাগুলো পাওয়া যাচ্ছে, নইলে তো মান্ধাতার আমলের বোট ছাড়া গতি ছিল না।'

আন্দামানের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছেছে গতকাল। এবার আর অবৈধ পথে আসেনি অশোক। তাই পাসপোর্ট ব্যবহার করতে পেরেছে। ওখান থেকেই মারলিনটা ভাড়া করেছে ওরা। হাসুয়াম ট্র্যাভেলস নামে বড় একটা কোম্পানি আছে ওখানে। মোটা টাকা জামানত রেখে ট্যুরিস্টদের কাছে ছোট বিমান, বোট এ সব ভাড়া দেয়।

খরচাপাতি সব জোগাচ্ছেন গহনার দোকানের মালিক নাজির আবদুল্লাহ। অশোক সেরাতে কথা বলার পরদিন দোকানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছে তিন গোয়েন্দা। খুলে বলেছে সব ঘটনা। নাজির সাহেব ভদ্রলোক। বুঝেছেন সব। বিশ্বাস করেছেন। বলেছেন, মালগুলো ফেরত পেলে কেস তুলে নিতে রাজি আছেন তিনি। অশোকের শাস্তি মকুফ করার জন্যে সব রকম চেষ্টা করবেন কথা দিয়েছেন। এমনকি এই অভিযানের সমস্ত খরচ বহন করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বিশ কোটি টাকা অনেক টাকা। গোয়েন্দাদের সঙ্গে তাঁর নিজেরও আসার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত কাজের ঝামেলায় শেষ মুহূর্তে নিজের ফ্লাইট ক্যান্সেল করেছেন। দলপতি হিসেবে সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন কিশোরের ঘাড়ে।

ভোরবেলা পোর্ট ব্লেয়ার থেকে যাত্রা করেছে গোয়েন্দারা। পথে লং আইল্যান্ডে নেমেছে। সেখানে ট্যাংকে তেল ভরে নিয়ে আবার ওড়াল দিয়েছে। গন্তব্য স্মিথ আইল্যান্ড। কখনও আন্দামানের উপকূল, কখনও ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে এসেছে ওরা। এখন চলছে উপকূল ঘেঁষে। নামবে মানিয়াফুরা গ্রামে। অশোকের কথামত এর কাছাকাছিই পাওয়া যাবে রাতুন দ্বীপ, যেখানে শিয়ালের গর্তে লুকিয়ে রেখেছে ডাকাতি করা গহনার ব্যাগ।

স্মিথ আইল্যান্ডের ওপর পুরো এক চক্কর দেয়ার পর সাগরের কিনারে এক জায়গায় বেশ কিছু বাড়িঘর চোখে পড়ল। ওটাই মানিয়াফুরা, অশোক জানাল। ল্যান্ড করার প্রস্তুতি নিল মুসা।

সাগরের কিনারে পানির কাছ থেকে আধমাইল মত ভেতরে সাদা একচিলতে সমতল জায়গা দেখা গেল। ওটাই যে রানওয়ে বোঝা গেল শেষ মাথায় বিমান রাখার বড় একটা ছাউনি আর উঁচু লোহার পাইপের মাথায় নিশান উড়তে দেখে।

সাবধানে সাদা চিলতেটার এক মাথায় প্লেন নামাল মুসা। পাকা রানওয়ে নয়। তবে মাটি খুব সমান বলে অসুবিধে হলো না। ছাউনিটার দিকে ছুটে গেল প্লেন।

কাছাকাছি পৌঁছতেই ছাউনির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ইউনিফর্ম পরা একজন লোক। থেমে যাওয়া প্লেনের কাছে এসে দাঁড়াল। গোয়েন্দারা নামতেই

হাত বাড়িয়ে দিল। ইংরেজিতে বলল, 'আমি মুরিয়া চৌহান। হাসুয়ান কোম্পানির মানিয়াফুরা ইনচার্জ। তোমাদের আসার খবর পেয়েছি। হেড অফিস থেকে রেডিওতে জানানো হয়েছে আমাকে। তোমাদেরকে সব রকম সহায়তা করার নির্দেশ রয়েছে আমার ওপর। তুমি নিশ্চয় কিশোর পাশা?'

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে কিশোর, এ অঞ্চলের অনেকেই ইংরেজি জানে। ব্যবসার খাতিরে শিখেছে। বিভিন্ন দেশের ট্যুরিস্ট আসে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। হাসল সে। মাথা ঝাঁকাল। হাতটা বাড়িয়ে দিল চৌহানের দিকে।

নিজেই মুসা, রবিন আর অশোকের সঙ্গে পরিচয় করে নিল চৌহান। লোকটা বেশ আন্তরিক। হাসিখুশি। কিশোরের দিকে ফিরল আবার সে। 'পথে কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

'না। শান্তিতেই এসেছি।'

'প্লেনের দায়িত্ব এখন আমার। তোমরা স্বাধীন। কি করতে চাও?'

ছাউনির কাছে দাঁড়ানো একটা হেলিকপ্টার দেখাল কিশোর। 'ওটাও নিশ্চয় আপনাদের কোম্পানির?'

'হ্যাঁ।'

আনমনে নিজেকেই যেন বোঝাল কিশোর। 'ভালই হলো। কাজে লাগানো যাবে।' চৌহানের দিকে ফিরল। 'এখানে কতদিন ধরে আছেন?'

'তিন বছর।'

'জায়গাটা তো তাহলে ভালমতই চেনা আপনার।'

'তা তো বটেই।'

'আমরা শখের গোয়েন্দা, হেডঅফিস থেকে কি সেটা জানানো হয়েছে?'

'তা হয়েছে। এখানে কি তদন্ত করতে নাকি? অবশ্য বলতে না চাইলে নেই।'

'না না, না বলার কিছু নেই। তা ছাড়া মনে হচ্ছে আপনার সাহায্য আমাদের দরকার হতে পারে।'

'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলবে! এসো না আমার অফিসে। কফি খাওয়া যাবে।'

হাসি ফুটল মুসার মুখে। 'কফির সঙ্গে যদি টফিও দেন তাতেও আমার আপত্তি নেই। একটানা প্লেন চালাতে চালাতে খিদেটা বেশ চাগিয়ে উঠেছে।'

হাসল চৌহান। 'এসো এসো।'

ছোট অফিস। তবে চেয়ারগুলো ভাল। আরাম করে বসল ওরা। স্টোভে কফির কেটলি চাপাল চৌহান। বিস্কুট বের করে দিল।

খেতে খেতে কিশোর বলল, 'দু'চার দিন থাকতে হতে পারে আমাদের। এখানে থাকা-খাওয়ার জায়গা আছে? হোটেল-টোটেল?'

'ট্যুরিস্ট স্পট যখন, জায়গা তো থাকবেই। কৃষ্ণ রারাতুঙ্গার বোর্ডিং হাউস-কাম-জেনারেল স্টোর-কাম-পোস্ট অফিস। মিসেস মুনিয়া রারাতুঙ্গা রাঁধেও বেশ ভাল। তোমাদের অসুবিধে হবে না।'

'অসুবিধের কথা ভাবলে আর এই দূর মুল্লুকে আসতাম না,' হেসে বলল কিশোর। 'যাকগে। বোর্ডিং হাউসটা দেখাবেন? সীট বুক করে ফেলতাম।'

'চলো, যাই। অফিসে আপাতত কোন কাজ নেই আমার। তোমাদের সঙ্গে ঘুরতে বরং ভালই লাগবে।'

হাঁটতে হাঁটতে কিশোর বলল, 'ভাবছি, রাতুন দ্বীপটায় এক চক্কর দিয়ে আসব। চেনেন তো নিশ্চয়।'

'ওই তো,' হাত তুলে সাগরের মাঝের কালো স্তূপের মত একটা জিনিস দেখাল চৌহান।

'এত কাছে হবে তা ভাবিনি। আচ্ছা, কারুণ শিকদার নামে কারও সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আপনার?'

'না। তবে কিছুদিন আগে ওই নামের একটা লোক এসে উঠেছিল মানিয়াফুরায়, এ খবর পেয়েছি। কেন, কিছু করেছে নাকি?'

'করেছে। দুই-দুইটা খুন। ওর কথা সব পরে বলব আপনাকে। আরেকজনকে তো নিশ্চয় চিনবেন, তিন বছর ধরে আছেন যখন। রজন মুনিআপ্পা। চেনেন?'

মুখের ভঙ্গি বদলে গেল চৌহানের। 'চিনতাম। এখানেই বাড়ি ছিল।'

'এখন কোথায় গেল?'

'পরপারে। মারা গেছে।'

থমকে দাঁড়াল কিশোর। চৌহানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। 'মারা গেছে!'

'রাতুন আইল্যান্ডে যে লোকটা শুঁটকি বানাত, শিয়াল পুষত, তার কথা বলছ তো?'

'হ্যাঁ। কিভাবে মারা গেল? বুড়ো হয়েছিল বলে তো মনে হয় না।'

'ফেরেনি যখন, ধরে নিতে হবে মারাই গেছে। সাগরে ডুবে। এ সব অঞ্চলে বোট নিয়ে বেরিয়ে দীর্ঘদিন যদি কেউ না ফেরে, সবাই ধরে নেয় সে মারা গেছে।'

'খুলে বলবেন?'

'ওর একটা মোটর বোট ছিল। ভোররাতে সেটা নিয়ে বোধহয় দ্বীপে গিয়েছিল। ফেরেনি আর। কেউ তাকে আর দেখেনি। সাগরে উল্টে থাকতে দেখা গেছে তার বোটটা। হয়তো কুয়াশার মধ্যে পড়েছিল। চোরাপাথরে ধাক্কা লেগে উল্টে গেছে বোট। স্রোতে ভেসে গেছে সে। অনেক কিছুই ঘটে থাকতে পারে।'

'অ!' নিচের ঠোঁটে ঘনঘন দু'তিনবার চিমটি কাটল কিশোর। 'খুন-খারাবি নয় তো?'

'মনে হয় না,' মাথা নাড়ল চৌহান। 'ধনী লোক ছিল না রজন। এমন কিছু তার ছিল না যেটার জন্যে কেউ খুন করতে পারে তাকে। লোকও খুব ভাল ছিল। কোন শত্রু ছিল না তার।'

'দ্বীপে কি একা গিয়েছিল নাকি সে?'

'হ্যাঁ। শুঁটকির মৌসুম ছাড়া সাধারণত একাই বেরোত সে, শিয়ালগুলোকে খাবার দিয়ে আসতে।'

'এ ঘটনার পর রাতুন দ্বীপে গেছে আর কেউ?'

'আমার জানামতে যায়নি। রজনের ছোট ভাই সজন, অবিবাহিত নিঃসন্তান

ভাইয়ের সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। পোর্ট ব্লেয়ারে থেকে ব্যবসা করে। ভাইয়ের নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ শুনে একবার এসেছিল। দু'তিন দিন থেকে চলে গেছে। রজনের এখানকার বাড়িটা খালিই পড়ে আছে এখন।'

'আপনি কখনও রাতুন দ্বীপে গেছেন?'

'উঁহু।'

'জেলেরা যায় না? আমি বলতে চাইছি, সাগরে বেরিয়ে মাছ ধরে ফেরার পথে কোন কারণে কেউ নামে না ওই দ্বীপে?'

'নামা তো দূরের কথা, ওটাকে এড়িয়েই চলে বরং সবাই। সব সময় ভয়ানক স্রোত বয়ে যায় দ্বীপের পাশ দিয়ে, সামান্য বাতাসেই তখন উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়তে থাকে দ্বীপের পাথুরে দেয়ালে—এ সবই শোনা কথা। তা ছাড়া যখন তখন ঘন কুয়াশা সৃষ্টি হয়। সেটা অবশ্য এ অঞ্চলের সবখানেই হয়। ওই কুয়াশার মধ্যে দ্বীপের ত্রিসীমানায় যেতে চায় না কেউ। স্রোতের টানে গিয়ে দ্বীপের দেয়ালে ধাক্কা খেলে বড় বড় জাহাজও চুরমার হয়ে যাবে।'

'হুঁ, সাংঘাতিক জায়গা! শিয়াল চুরি করতে যায় না কেউ? যে ধরনের শিয়ালের কথা শুনলাম, তার চামড়ার অনেক দাম।'

'উঁহু। আর গেলেও গোপনে যাবে। চোরে কি আর সেটা মানুষকে জানিয়ে বেড়াবে যে জানব।'

মানিয়াফুরা গ্রামটা ছোট গ্রাম। ট্যুরিস্ট আসে বলে উন্নতির ছোঁয়া লাগছে। তবে তা-ও খুবই সামান্য। সাগরে পাথর ফেলে একটা জেটি বানানো হয়েছে। কয়েকটা মাছধরা নৌকা আর ট্রলার ঢেউয়ে দুলছে শেষ মাথায়। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে আসে ট্যুরিস্টরা। সেজন্যে হাসুয়ান কোম্পানি প্লেন নামার ব্যবস্থা করেছে। শীঘ্রি একটা মোটেল খোলারও ইচ্ছে আছে ওদের।

গাঁয়ের প্রান্তে সাগরের পাড়ে নারকেল গাছে ঘেরা একটা বাঁশ আর কাঠের তৈরি বাড়ি দেখাল চৌহান। নারকেল পাতার ছাউনি। বলল, 'রজনের বাড়ি।'

কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাড়িটা দেখল কিশোর। তারপর আবার পা বাড়াল।

চৌহান বলল, 'রাতুন দ্বীপের ব্যাপারে খুব আগ্রহ তোমার। নিশ্চয় কোন কারণ আছে?'

'আছে,' জবাব দিল কিশোর। 'আর সেজন্যেই আমাদের এখানে আসা। ওখানে আমাদের যেতেই হবে। কি করে যাই, বলুন তো? উড়ে যাওয়াটা কোন ব্যাপারই না বুঝতে পারছি, কিন্তু ল্যান্ড করার জায়গা পাওয়া যাবে?'

'প্লেন ল্যান্ড করার জায়গা আছে নাকি জানি না। হেলিকপ্টারে করে যেতে পারো। যদি বলো, নিয়ে যেতে পারি।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'ধন্যবাদের কিছু নেই,' হাসল চৌহান। 'তোমাদেরকে সব রকম সাহায্য করার নির্দেশ আছে আমার ওপর, তখনই তো বললাম।'

'ওরকম একটা দ্বীপে কেন যেতে চাই, জানার নিশ্চয় খুব কৌতূহল হচ্ছে আপনার?'

'সত্যি কথা বলব? হচ্ছে। কিন্তু কেউ যদি কোন কথা নিজে থেকে বলতে না চায় তার কাছে জানতে চাওয়াটা অভদ্রতা।'

'আপনাকে সব বলব। কারণ আপনার সাহায্য আমাদের দরকার হবে।'

'সেটা তোমার ইচ্ছে। কিছু না বললেও সর্বাত্মক সাহায্য পাবে আমার কাছ থেকে।'

জেটির দিকে মুখ করা বড় একটা কাঠের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল চৌহান। 'এটাই কৃষ্ণ রারাতুঙ্গার বোর্ডিং হাউস। চলো, পরিচয় করিয়ে দেব। তারপর অফিসে যেতে হবে আমাকে। নিরাপদেই যে পৌঁছেছ তোমরা, জানাতে হবে হেড অফিসকে।'

'ঠিক আছে, মিস্টার চৌহান...'

'আমাকে শুধু মুরিয়া বললেই চলবে। কিংবা চৌহান। যেটা সহজ লাগে। মিস্টার-ফিস্টারের দরকার নেই।'

'ওকে, চৌহান,' হাসল কিশোর। লোকটার আন্তরিকতা খুব ভাল লাগছে তার। 'ঠিক ছ'টার সময় চলে আসবেন। আমাদের সঙ্গে রাতের খাবার খাবেন। তারপর বারান্দায় বসে সাগর দেখতে দেখতে সব বলব আপনাকে।'

গোয়েন্দাদের নিয়ে বোর্ডিং হাউসে ঢুকল চৌহান।

ছোটখাট, হাড্ডিসর্বস্ব একজন মাঝবয়েসী মানুষকে বসে থাকতে দেখা গেল হাতলওয়ালা কাঠের চেয়ারে। অনেক লম্বা নাক লোকটার। মাথা ভর্তি চুল। বেখাপ্পাই লাগে। কিন্তু হাসিটা বড়ই সুন্দর। কৃষ্ণ রারাতুঙ্গা।

চার

'কেমন আছো, কৃষ্ণ,' চৌহান বলল। 'কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে এলাম তোমার সঙ্গে পরিচয় করাতে। বহুদূর থেকে এসেছে ওরা। বাংলাদেশ। কয়েক দিন থাকবে। ঘর খালি আছে নাকি তোমার?'

'আছে তো বটেই। তোমার বন্ধু আমারও বন্ধু। কিন্তু ঘর তো সব সিঙ্গল বেডের চৌকি। থাকতে কষ্ট হবে না তো?'

'আরে নাহ্,' হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিল কিশোর। 'শোয়ার জায়গা যে পেলাম, সেটাই কত না। আবার বাছাবাছি।'

'নাও হয়ে গেল তোমাদের থাকার জায়গা,' গোয়েন্দাদের বলল চৌহান। 'থাকো তোমরা। চলি। দেখা হবে।'

'ওহ্হো,' কিশোর বলল, 'আমাদের ব্যাগ-সুটকেসগুলো তো সব প্লেনে রয়ে গেছে।' মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল, 'চলো, যাই আবার।'

'তোমাদের আর যাওয়া লাগবে না,' চৌহান বলল। 'আমি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেব।'

বেরিয়ে গেল চৌহান।

এতক্ষণে পুরো ঘরটা দেখার সুযোগ পেল কিশোর। মাঝারি আকারের

হলরুমের মত একটা কাঠের ঘর। কাঠের চেয়ার-টেবিল। একধারে বারও আছে। দেয়াল ঘেঁষে কাঠের তাকে দেশী-বিদেশী কিছু মদের বোতল সাজানো। নানা দেশ থেকে বহু ধরনের লোক আসে এখানে। তাদের জন্যে রেখেছে।

কফি দেবে কিনা জিজ্ঞেস করল রারাতুঙ্গা।

মাথা নাড়ল মুসা, 'উঁহুঁ, খেয়ে এসেছি। বরং পানি দিন। গলা শুকিয়ে গেছে।'

'ডাবের পানি খাবে? খুব ভাল লাগবে।'

'দিন।'

চাকরকে ডেকে ডাব কেটে এনে দেয়ার হুকুম দিল রারাতুঙ্গা।

একটা লম্বা কাঠের টেবিল ঘিরে সাজানো চেয়ারগুলোতে বসল ওরা। সময় নষ্ট না করে তথ্য জোগাড়ের চেষ্টা শুরু করে দিল কিশোর। রারাতুঙ্গাকে বলল, 'এখানে একটা কাজে এসেছি আমরা। ঠিক বেড়াতে নয়। কারুণ শিকদার নামে কারও সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার?'

মুহূর্তে সতর্ক হয়ে গেল রারাতুঙ্গা। সরু হয়ে এল চোখের পাতা। 'তোমার কিছু হয় নাকি?'

'না না, তা হতে যাবে কেন।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রারাতুঙ্গা। 'শুনে খুশি হলাম।'

'কেন?'

'ওর মত একটা শয়তানের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক নেই বলে। তোমাদেরকে ভাল ছেলে মনে হচ্ছে। ও তো একটা খটাশ। ছুঁচোর চেয়ে খারাপ।'

হাসল কিশোর। 'ছুঁচো প্রাণীটা কিন্তু খারাপ না। তবে দুর্গন্ধ বেরোয়।'

'কারুণের তারচেয়ে বেশি দুর্গন্ধ। যাই হোক, ওকে খুঁজতে এসে থাকলে লাভ হবে না। পাবে না এখানে। নেই। ফিরবেও না কোনদিন।'

'তারমানে জ্বালিয়ে রেখে গেছে আপনাদের?'

'জ্বালিয়েছে মানে! সাতদিন ধরে ছিল। ঘরে থেকেছে, আমার খাবার খেয়েছে, টাকাও ধার নিয়েছে। তারপর কোন কিছু না জানিয়ে, আমার কোন পাওনাই না চুকিয়ে, চুরি করে একদিন কেটে পড়েছে।' প্রচণ্ড রাগে জানালা দিয়ে থুতু ফেলল রারাতুঙ্গা। 'কিন্তু ওরকম একটা লোককে খুঁজতে এলে কেন?'

'পুলিশও খুঁজছে ওকে। আপনাকে পরিচয়টা দিয়েই রাখি, আমরা শখের গোয়েন্দা।'

'অ, তাই বলো,' খুশি হলো রারাতুঙ্গা। 'তাহলে তো তোমাদেরকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখো, ধরতে পারো নাকি ছুঁচোটাকে। আমার সাধ্যমত সাহায্য আমি করব।'

'আপাতত কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে সহায়তা করুন,' সুযোগটা হাতছাড়া করল না কিশোর।

'বলো?'

'কারুণ এখানে কিভাবে এসেছিল আপনি জানেন?'

'রজন ওকে নিয়ে এসেছিল এখানে। আমাকে বলেছিল লোকটাকে চেনে না সে। দু'দিন নিজের বাড়িতে রেখেওছিল। ব্যবসার কাজে মিলারস টাউনে যাওয়ার

কথা ছিল রজনের। কারুণকে তখন আমার এখানে থাকতে বলে সে। দিন কয়েক চলার জন্যে তাকে কিছু টাকাও দিয়েছিল।'

'এখানে যখন ছিল সময় কাটাত কি করে কারুণ?'

'বেশির ভাগ সময়ই ঘুরে বেড়াত। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল, তার এক কিশোর বন্ধুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে-ও নাকি তার সঙ্গে নৌকাডুবির শিকার হয়েছিল। কারও কাছ থেকে একটা বোট ধার নেয়া যায় কিনা, সে-চেষ্টা চালাচ্ছিল। চিঠিও লিখেছিল কয়েকটা।'

'কার কাছে জানেন?'

'না। জিজ্ঞেস করিনি। তবে সে নিজেই জানিয়েছে ঢাকায় তার এক বন্ধুকে লিখছে টাকা পাঠানোর জন্যে। ওই টাকা এলে আমার টাকা দিয়ে দেবে বলেছিল।'

'টাকা এসেছিল?'

'জানি না। ও আগ বাড়িয়ে কখনও কিছু বলত না, নিজের সম্পর্কেও না, কোন কিছুর ব্যাপারেই না।'

'হুঁ!'

'কোন দেশী লোক ও?'

'জানি না। ইনডিয়ানও হতে পারে, বাংলাদেশীও হতে পারে। খারাপ লোক সব দেশেই থাকে।'

'তা ঠিক,' রারাতুঙ্গা বলল। 'একদিন ঘুরতে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে গেল। আর ফিরল না। মিথ্যুক, চোর কোথাকার।'

'কোথায় গেছে কোন ধারণাই নেই আপনার?'

'না। কেউ তাকে যেতে দেখেনি। এমনভাবে চোরের মত পালিয়ে চলে গেছে। তবে তাতে আমার দুঃখ নেই। বরং শয়তান লোক, আগেভাগেই যে চলে গেছে সেটাই বাঁচোয়া। যত বেশি দিন থাকত, তত ক্ষতি করত।'

'ওর ব্যাপারে আর কেউ কিছু জানে?'

এক মুহূর্ত ভাবল রারাতুঙ্গা। মাথা ঝাঁকাল। 'মনে হয় জানতে পারে, নাইয়ার বাঙ্গো। ও এখানকার স্থানীয় লোক নয়। কোনখান থেকে এসেছে তা-ও ঠিক করে কেউ বলতে পারে না। ইন্দোনেশিয়ান হবে সম্ভবত। মিশ্র রক্তও হতে পারে। গাঁয়ের বাইরে একটা ডেরা বেঁধে বাস করে। বহু বছর ধরে আছে। টাকা পেলে যে কোন কাজ করে দিতে রাজি। ওর চোখে সবই পড়ে। ওর সঙ্গে কথা বলে দেখব।'

অন্য প্রসঙ্গে গেল কিশোর। 'আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো—রজন মুনিআপ্পার কি হয়েছে বলে আপনার ধারণা?'

মাথা নাড়তে নাড়তে রারাতুঙ্গা জবাব দিল, 'বলা কঠিন। যাওয়ার কথা ছিল মিলারস টাউনে। কিন্তু কেন যেন মত বদলে রাতুন দ্বীপে চলে গিয়েছিল। হয়তো শিয়ালের খাবারে টান পড়বে ভেবে ওগুলোকে খাবার দিতেই গিয়েছিল। ভোরবেলা আলো ফোটার আগে রওনা দিয়েছিল বলে সেদিন ওকে যেতে দেখেনি কেউ। ওর বোটটা ঘাটে ছিল না, সবাই তাই ধরে নিয়েছিল দ্বীপেই গেছে। এ

ছাড়া বোট নিয়ে আর কোথাও যাওয়ার কথা নয় তার।'
'কি ঘটে থাকতে পারে বলে অনুমান করেন?'
'ওখানে সাগরের যা অবস্থা, যা খুশি ঘটতে পারে।'
'রাতুন দ্বীপে আটকা পড়েনি তো?'
'মনে হয় না। খারাপ কিছুই ঘটেছে ওর। রজনকে আর কোনদিন ফিরে পাব না আমরা। বেচারা। সত্যিই খুব ভাল লোক ছিল।'
কিশোরদের মালপত্র নিয়ে ঘরে ঢুকল একটা লোক। এ ধরনের কাজে এলে বেশি জিনিস বহন করে না ওরা। তাই একজনের পক্ষে নিয়ে আসা কঠিন হয়নি।
আপাতত আর কোন প্রশ্ন নেই। ওদেরকে ঘরে পৌঁছে দিল রারাতুঙ্গা। বলল, হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম নিতে। খাবার রেডি করে ডাক দেবে।
সময়মতই হাজির হয়ে গেল মুরিয়া চৌহান। খাওয়া রেডি হয়ে গেছে ততক্ষণে। লণ্ঠনের মৃদু আলোয় লম্বা টেবিলে খেতে বসল সবাই। বেশির ভাগই মাছ। তবে চমৎকার রান্না। গোগ্রাসে গিলল ওরা। সবশেষে এল কফি। আন্দামানে কফির চাষ হয়। তাজা কফির স্বাদই আলাদা।
কফি খেতে খেতে চৌহানকে কারুণের সব কথা খুলে বলল কিশোর। শেষে বলল, 'আমার বিশ্বাস, বেশি দূরে যায়নি কারুণ। আশেপাশেই কোথাও রয়েছে।'
চুপ করে রইল চৌহান। স্তব্ধ হয়ে গেছে।
কিশোর বলল, 'তৃতীয় আরও একটা খুন হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আর সেই খুনটাও আপনাদের এলাকাতেই হয়েছে।'
'কার কথা বলছ? রজন?'
'হ্যাঁ।'
'কারুণকে সন্দেহ করছ?'
'হ্যাঁ। এতক্ষণ কারুণের চরিত্র সম্পর্কে যা শুনলেন, তাতে ওর ওপর সন্দেহ যাওয়াটা স্বাভাবিক না?'
মাথা ঝাঁকাল চৌহান। অশোকের দিকে তাকাল। আবার ফিরল কিশোরের দিকে, 'তাহলে সেই ডাকাতির মালই উদ্ধার করতে এসেছ তোমরা। বোটে যাবে না হেলিকপ্টারে?'
'হেলিকপ্টারটা হলেই সুবিধে হয়।'
'ঠিক আছে। পাবে।'
'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। দ্বীপে যাবেই কারুণ, তাতে কোন সন্দেহই নেই আমার। ডাকাতির মাল উদ্ধার করে আনার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠবে সে।'
'আমারও তাই মনে হয়,' চৌহান বলল। 'ঠিক আছে, আমি এখন যাই। কাল সকালে চলে যেয়ো। হেলিকপ্টারে করে তোমাদেরকে দ্বীপে পৌঁছে দেব।'
'ক'টার সময় গেলে ভাল হয়?'
'যখন খুশি তোমাদের। তবে যত সকাল সকাল যেতে পারো।'
'সেই ভাল,' কিশোর বলল। 'আলো ফুটলেই চলে যাব।'
উঠে দাঁড়াল চৌহান। 'যাই। অনেকক্ষণ থাকলাম। হেড অফিস থেকে আবার কোন সময় যোগাযোগ শুরু করে কে জানে। সকালে দেখা হবে।'

ঘরের একপ্রান্তে নিচুস্বরে কথা বলছিল ওরা। অন্য প্রান্তে বসা রারাতুঙ্গার কানে গেছে কিনা বোঝা গেল না। চৌহান বেরিয়ে যেতেই টেবিল পরিষ্কার করতে এল সে। জানাল, 'নাইয়ার বাঙ্গোর সঙ্গে কথা বলেছি আমি। ঝুপড়িতেই ছিল ও। তেমন কিছু বলতে পারল না। তবে কারুণকে মানিয়াফুরা ছেড়ে চলে যেতে দেখেছে সে।'

'কিভাবে গেল? কোনদিকে?' জানতে চাইল কিশোর।

'হেঁটে গেছে। দক্ষিণে। বনের ভেতর দিয়ে পাহাড়ে যাওয়ার পুরানো একটা পায়েচলা পথ আছে।'

'কি আছে ওদিকটায়?'

'কিছু না। অন্তত দশ মাইল পর্যন্ত কিছুই নেই। তারপর একটা খাঁড়ি আছে। জায়গাটার নাম রায়নাফুরা। কিছু বস্তি আছে। সামুদ্রিক মাছ টিনজাত করার একটা কারখানা আছে ওখানে।'

'তারমানে ওখান থেকে বেরোনোরও পথ আছে?'

'আছে। আবহাওয়া ভাল থাকলে পনেরো দিন পর পর মিলারস টাউন থেকে স্টীমার আসে। প্যাসেঞ্জার থাকলে নামিয়ে দিয়ে যায়। ফেরার পথে মাছ, শুঁটকি এ সব নিয়ে যায়।'

'তারমানে কারুণ ওই পথে সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে?'

'তা পারে। এখান থেকে বেরোনোর সবচেয়ে সহজ পথ ওটাই।'

'মিলারস টাউনের নাম জানে নাকি কারুণ?'

'না জানলেও জেনে নিতে কতক্ষণ। রজনও নিশ্চয় বলেছিল ওকে। ওখানে একটা এয়ারফীল্ড আছে, ব্রিটিশ আমলের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বানানো। ট্যুরিস্ট আর ডাক আনা-নেয়ার কাজেই মূলত ব্যবহার হয়।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল কিশোর। 'মিলারস টাউনের সঙ্গে চৌহান যোগাযোগ করতে পারবে?'

'তা তো পারবেই। রেডিওর সাহায্যে। ওখানে পুলিশ ফাঁড়িও আছে। তাদের সঙ্গেও কথা বলা সম্ভব। মানিয়াফুরায় পুলিশের দায়িত্বও অনেকটা চৌহানই পালন করে। কোন কিছু হলেই রেডিওতে জানিয়ে দেয় পুলিশকে। পুলিশ তখন নিজে আসে, কিংবা অন্য কোন ব্যবস্থা নেয়।'

'থ্যাংকস, রারাতুঙ্গা,' কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'অনেক সাহায্য করলেন আপনি।'

রারাতুঙ্গা চলে গেলে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল কিশোর। নিচের ঠোঁটে তার ঘনঘন চিমটি কাটা দেখেই বোঝা গেল সেটা। মিনিট দুয়েক পর মুখ তুলে তাকাল অশোকের দিকে। 'চৌহানের বাড়িতে যেতে পারবে এখন? অন্ধকারে অসুবিধে হবে?'

'না হবে না।'

'তাহলে চলে যাও। চৌহানকে বলবে মিলারস টাউনের পুলিশের সাথে যেন কথা বলে। ওকে ওখানে দেখা গেছে কিনা খোঁজ নিতে বলবে। তোমাকে পাঠাচ্ছি, তার কারণ, পুলিশ যদি কারুণের চেহারার বর্ণনা জানতে চায় তুমি

দেখেছ, তুমি দিতে পারবে। আমরা কেউ পারব না। চৌহানকে বলবে সকালের মধ্যে জবাব চাই আমি।'

উঠে দাঁড়াল অশোক।

'ইচ্ছে করলে রবিন কিংবা মুসাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো,' কিশোর বলল।

'না, তার দরকার হবে না। মানিয়াফুরা আমার পরিচিত। সহজেই চলে যেতে পারব।'

অশোক বেরিয়ে গেলে দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। 'আমরা এখন কি করব?'

'ঘুমাব,' নির্দ্বিধায় বলে দিল মুসা। 'ভোরে উঠেই তো আবার বেরোতে হবে।'

'ঠিক,' রবিনও মুসার সঙ্গে একমত।

একমত কিশোরও।

পাঁচ

পরদিন আলো ফোটার আগেই বিছানা ছাড়ল গোয়েন্দারা। এয়ারপোর্টে রওনা হলো। গিয়ে দেখল তৈরি হয়ে বসে আছে চৌহান।

সাগরের দিক থেকে হাওয়া আসছে। বাতাসে শীত শীত ভাব। শীতের গরম কাপড় পরতে হয়েছে।

আবহাওয়ার অবস্থা জানতে চাইল কিশোর।

'ভালই,' চৌহান বলল। 'মোটামুটি।'

সাগরের ওপর পাতলা ধূসর কুয়াশার স্তর। মাছধরা নৌকাগুলোকে কেমন ভূতুড়ে লাগছে।

'ওই যে কুয়াশা,' হাত তুলে বলল মুসা।

'ওই কুয়াশাকে খারাপ বলা যাবে না,' চৌহান বলল। 'তবে এখানকার আবহাওয়ার মতিগতির কোন ঠিক নেই। কখন যে কি ঘটিয়ে ফেলবে বোঝা মুশকিল।'

'তাড়াতাড়ি চলুন তাহলে,' কিশোর বলল। 'অবস্থা ভাল থাকতে থাকতেই পাড়ি দিয়ে ফেলি। মিলারস টাউনের খবর কি?'

'খোঁজ নিয়েছি। কারণ ছিল ওখানে কিছুদিন। তার কয়েকজন বন্ধুর নাকি একটা বোট নিয়ে আসার কথা ছিল।'

'গিয়েই বন্ধু পেয়ে গেল। চমৎকার! বোটটা এসেছিল?'

'হ্যাঁ। সেটাতে চড়তে শেষ দেখা গেছে ওকে। স্মিথ আইল্যান্ডের দিকে চলে গেছে হয়তো।'

'ওখানে যাবে কেন?' নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর। চৌহানকে জিজ্ঞেস করল, 'নাম কি ওটার? কি ধরনের বোট?'

'মাতাঙ্গা। মোটর ক্রুজার।'

'ওর বন্ধুরা কারা জানতে ইচ্ছে করছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

'নিশ্চয় ওরাও কারণের মত একই চিজ।'

'ঠিকই বলেছ,' মাথা ঝাঁকাল চৌহান। 'এটা ভেবে দেখিনি। যাকগে। যা খুশি করুকগে ওরা। আমাদের কাজ আমরা করি। চলো।'

'হ্যাঁ, চলুন।'

হেলিকপ্টারটা ফোর-সীটার। পেছনে বসল মুসা আর রবিন। অশোকের পাতলা শরীর বলে দু'জনের মাঝখানে ঢুকতে পারল কোনমতে। তবু ঠাসাঠাসি করেই বসা।

ওড়াল দিল কপ্টার। প্লেনে করে আসার সময়ই নিচের প্রাকৃতিক পরিবেশটা দেখেছিল গতকাল তিন গোয়েন্দা। উত্তর আন্দামানের বেশির ভাগটাই ঘন জঙ্গলে পূর্ণ। পাহাড়-পর্বত টিলা-টক্কর প্রচুর। মাছ আর শুটকি ছাড়াও এখান থেকে দামী কাঠ, নারকেল, নারকেলের ছোবড়া, চা, কফি, রবার রপ্তানী হয়। সেগুন কাঠের জঙ্গল, নারকেলের জটলা দেখা যাচ্ছে ওপর থেকে। পাহাড়ের ঢালে চা বাগান। রবার আর কফি গাছগুলো ওপর থেকে অত পরিষ্কার নয়। সাগরে অসংখ্য মাছধরা নৌকা, ট্রলার, জাহাজ ঘোরাফেরা করছে। রাতেই প্রধানত মাছ ধরা হয়। সকালের দিকে এখন জলযানগুলো বন্দরের দিকে ফিরে যাচ্ছে সেই সব মাছ পাইকারদের কাছে কিংবা মাছ বিক্রেতা কোম্পানিগুলোর কাছে বিক্রি করতে।

রাতুন দ্বীপে পৌঁছতে সময় লাগল না। পাখি ছাড়া আর কোন প্রাণী চোখে পড়ল না ওদের। ওপর থেকে মস্ত একটা লম্বাটে বাসনের মত লাগছে দ্বীপটাকে। এখানে ওখানে পানি জমে থাকতে দেখা গেল। সেগুলো ডোবা না জলাভূমি বোঝা গেল না। মাটি অতিরিক্ত নরম হলে হেলিকপ্টার নামানো ঝুঁকিপূর্ণ।

বাসনের পেটের কাছে পানিশূন্য একটা জায়গায় হেলিকপ্টার নামাল চৌহান। মাটি কেমন বোঝার চেষ্টা করল। চাকার নিচে নরম কাদামাটি টের পেলেই উঠে পড়বে। তবে মাটি মনে হলো শক্তই। পাথুরে।

দরজা খুলে লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে গেল কিশোর। লাফালাফি করে, পা দিয়ে ঠুকে মাটি পরীক্ষা করে দেখে ইঞ্জিন বন্ধ করতে ইশারা করল চৌহানকে।

ইঞ্জিনের শব্দ থেমে গেলে চৌহানকে বলল, 'মাটি আপাতত শক্তই আছে। তবে বৃষ্টি নামলে কি হবে বলা কঠিন। তখন বিপদ হতে পারে। চতুর্দিকের পাহাড় থেকে পানি গড়িয়ে নেমে আসে নিচের দিকে, বোঝাই যায়। এই যে, সবখানে জলজ শ্যাওলা জন্মে রয়েছে।'

'কি করব তাহলে?'

জবাব দেয়ার আগে অশোকের দিকে তাকাল কিশোর। 'শিয়ালের গর্তটা কতদূরে?'

'মাইলখানেক হবে। বেশিও হতে পারে।'

চৌহানকে বলল কিশোর, 'আপনি ইচ্ছে করলে অপেক্ষা করতে পারেন। জিনিসগুলো বের করে নিয়ে আসি আমরা। কিংবা চলেও যেতে পারেন। পরে এসে আমাদের নিয়ে যাবেন।'

'কতক্ষণ লাগবে তোমাদের?'

'ঠিক বলা যাচ্ছে না। এলাম যখন, রজন মুনিআপ্পাকেও খুঁজব আমরা। তার

কেবিনে যাব। তার নিখোঁজ হওয়ার রহস্যটা ভেদ করতে হবে।'

'ও, তাহলে তো দেরিই হবে,' চৌহান বলল। 'তবে ঠিক চিন্তাই করেছ। ওর কি হয়েছে, সত্যিই জানা দরকার।'

'নাকি আমাদের সঙ্গে আসবেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

এক মুহূর্ত ভাবল চৌহান। 'নাহ্। হেড অফিস থেকে নির্দেশ আসতে পারে। ট্যুরিস্টরাও কখন কে চলে আসে ঠিক নেই। আমি বরং চলেই যাই। তোমাদের নিতে দুপুর নাগাদ ফিরে আসব। এই বারোটার দিকে। কি বলো?'

'সেই ভাল।'

চৌহান বাদে নেমে পড়ল সবাই। আবার ঘুরতে শুরু করল হেলিকপ্টারের রোটর। বিশাল একটা গঙ্গা ফড়িঙের মত শূন্যে উঠল মেশিনটা। একটা ঝাঁকি দিয়ে গতি বাড়িয়ে দিল। বিচিত্র ভঙ্গিতে কোনাকুনিভাবে কাত হয়ে উড়ে গেল সাগরের দিকে।

হাত নেড়ে তাকে বিদায় জানাল গোয়েন্দারা।

অশোকের দিকে ফিরল কিশোর। 'চলো। পথ দেখাও।'

'গর্তটার কাছে যাব সোজা?'

'হ্যাঁ।'

'আমি ভেবেছিলাম পথে একবার কেবিনটা দেখে যাওয়ার কথা বলবে। বেশি দূরে না অবশ্য।'

'বেশ, তাহলে তাই করা যাক। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাগটা তুলে নেয়া দরকার। ভাবছি, এতখানি পথ এলাম যেটার জন্যে, সেটা আছে তো জায়গামত?'

'আছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই,' গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল অশোক। 'যদি না শিয়ালের গহনা পরার শখ হয়।'

তার রসিকতায় হাসল না কিশোর। 'গুপ্তধন উদ্ধারের অভিজ্ঞতা নেই তো তোমার, তাই জানো না। কোনভাবেই যেন সহজে হাতে আসতে চায় না এ ধরনের জিনিস, যেন ভূতে আসর করে থাকে, খালি অঘটন ঘটে।'

'এবারে ঘটবে না। আমি বলে দিলাম, দেখো।'

কেউ আর কিছু বলল না। সমতলভূমির প্রান্তসীমায় সবচেয়ে কাছের বনটার দিকে এগিয়ে চলল অশোক। জায়গাটা এত নরম কাদায় ভরা, বড় বড় গাছগুলো শিকড় গেড়ে দাঁড়িয়ে আছে কি করে সেটাই আশ্চর্য। জলজ শ্যাওলার বাড়াবাড়িই বলে দেয় মাটির সামান্য নিচেই পানি রয়েছে। মাটির ওপরেও যেখানে সেখানে বৃষ্টির পানি জমে থাকার মত করে পানি জমে রয়েছে। পানি ভেঙে যেতে হচ্ছে ওদের।

'ভাগ্যিস এখানে প্লেন নিয়ে আসিনি আমরা,' রবিন বলল। 'নামলে আর উঠতে পারতাম না।'

'বলা যায় না,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। 'একেবারে নিচের দিকে রয়েছি তো আমরা, তাই জলা আর কাদা পাচ্ছি। ওপরের দিকটায় নিশ্চয় শুকনো। শক্ত। প্লেনে বোঝাটোঝা বেশি না থাকলে হয়তো নামা যাবে।'

বনের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। একটা পায়েচলা পথ বেছে নিল অশোক।

রাস্তাটা ঢালু হয়ে উঠে গেছে দ্বীপের বাসনের মত কানার দিকে।
কিছুদূর এগোনোর পর পাতলা হয়ে এল গাছপালা। ঢালের গায়ে এক টুকরো খোলা জায়গায় কাঠের তৈরি কেবিনটা চোখে পড়ল। সাগরের দিকে মুখ করা।
কাছে যেতে যেতে আচমকা দাঁড়িয়ে গেল অশোক।
'কি হলো?' জানতে চাইল কিশোর। 'কোন সমস্যা?'
'বুঝতে পারছি না,' ধীরে ধীরে বলল অশোক। 'আমরা সেবার চলে যাওয়ার পরেও কেউ এসেছিল এখানে।'
'কি করে বুঝলে?'
কেবিনের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা খাবারের খালি টিন, বাক্স, মদের বোতল দেখাল অশোক। খাওয়ার পর নিতান্ত অবহেলায় জানালা কিংবা দরজা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে।
'দ্বীপের মালিক নিজেই হয়তো এসেছিল,' রবিন বলল।
মাথা নাড়ল অশোক। 'উঁহু। রজন মোটেও নোংরা স্বভাবের ছিল না। সব কিছু গোছগাছ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখত। বাড়ির পাশে এ ভাবে জঞ্জাল বানিয়ে রেখেছে সে, বিশ্বাস হচ্ছে না।'
'চলো, ঢুকে দেখা যাক,' এগিয়ে গেল কিশোর। সাবধানে জানালার কাছে এসে ভেতরে উঁকি দিল। কাউকে না দেখে দরজার দিকে এগোল। ঠেলা দিতেই খুলে গেল পাল্লা। তালা নেই। দল বেঁধে ভেতরে ঢুকল সবাই।
ঘরের মধ্যে একবার চোখ বুলিয়েই চিৎকার করে উঠল অশোক, 'রজনের কাজ হতেই পারে না! কি নোংরা!'
জিনিসপত্রের অবস্থা দেখে একটা শুয়োরের খোঁয়াড় মনে হচ্ছে কিশোরের। মেঝের সর্বত্র কাদামাখা জুতোর ছাপ। জুতো পায়ে চেয়ারেও উঠেছিল কেউ। চুলার সামনে ছাই আর কয়লা ছড়ানো। খাবারের আলমারির দরজা হাঁ হয়ে খোলা। তাকগুলো শূন্য।
'কিছুই নেই,' বিড়বিড় করে বলল অশোক। 'কিচ্ছু না। অথচ আগেরবার যখন এসেছিলাম খাবারে বোঝাই ছিল। ঘরটা ছিল ঝকঝকে তকতকে।'
'নেকড়ের পাল হামলা চালায়নি তো?' মুসার প্রশ্ন।
'দূর, এখানে নেকড়ে আসবে কোত্থেকে?' কিশোর বলল। 'শিয়ালই বাইরে থেকে আনা হয়েছে। তা ছাড়া নেকড়েবাঘে সিগারেট খায় না।' মাটিতে পড়ে থাকা পোড়া সিগারেটের গোড়া দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'অশোক, রজন কোন ব্র্যান্ডের সিগারেট খেত?'
'কোন ব্র্যান্ডেরই না। সিগারেটই খেত না।'
নিচু হয়ে গোড়াটা তুলে নিল কিশোর। বাড়িয়ে দিল অশোকের দিকে, 'দেখো তো, এটা চিনতে পারো নাকি?'
'কারণ!' ফিসফিস করে বলল অশোক। 'এই দুর্গন্ধে ভরা ভয়ানক কড়া ব্র্যান্ড কারণের প্রিয়!'
'তারমানে তুমি ভাবছ কারণ এসেছিল এখানে?' মুসার প্রশ্ন।
'তা ছাড়া আর কে?' জবাব দিল কিশোর। 'আর একাও আসেনি সে। জুতোর

ছাপগুলো দেখো। আলাদা রকম।'

'নিশ্চয় গুপ্তধন খুঁজে বেড়াচ্ছে,' মুসা বলল।

'মিলারস টাউন থেকে বোট নিয়ে সোজা এখানে চলে এসেছে। কিন্তু কথা হলো, তুলে নিয়ে যায়নি তো ওগুলো? অশোক, জলদি চলো। কোথায় লুকিয়েছ, দেখাও।'

অশোকের মুখে উদ্বেগ। শঙ্কার ছায়া। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। এক সারিতে তার পেছনে চলল পুরো দলটা।

কিছুদূর এগোনোর পর পাথরের একটা ছোট স্তূপ দেখিয়ে অশোক বলল, 'প্রথমে ওখানে লুকিয়েছিল কারণ।'

'এগিয়ে যাও,' তাগাদা দিল কিশোর। 'ওটা দেখার দরকার নেই।'

আবার এগোল অশোক। কিছু গাছের জটলা, দু'চারটা উঁচুনিচু ঢিপি পেরোনোর পর যেন হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

'কি হলো?' জানতে চাইল কিশোর।

হাত তুলে দেখাল অশোক। 'ওখানে...ওই জায়গাটায় লুকিয়েছিলাম...!' কথা বেরোতে চাইছে না যেন মুখ দিয়ে।

একটা ঢালু জায়গার ওপর আটকে গেছে যেন চার জোড়া চোখ। মাটির ভাঙন, ছড়ানো পাথর, উল্টে থাকা ঝোপঝাড় আর গাছের শিকড়ই বলে দিচ্ছে ধস নেমেছিল ওখানে।

'ধ-ধ-ধস...' তোতলানো শুরু করল অশোক।

'দেখতেই তো পাচ্ছি,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল কিশোর। 'শিয়ালের গর্তটার যতটা সম্ভব কাছাকাছি যাও।'

'গ-গ-গর্তটা কোথায় ছিল, তাই তো বুঝতে পারছি না এখন!'

'খাইছে! কি হবে তাহলে?' বিড়বিড় করল মুসা।

অশোকের দিকে তাকাল কিশোর। 'তারমানে, তুমি বলতে চাইছ ওই ধস নামা মাটির স্তূপের নিচে কোথাও হারিয়ে গেছে জিনিসগুলো?'

'হ্যাঁ।'

'মন খারাপ করে লাভ নেই। ধস নামার জন্যে তুমি দায়ী নও।'

'কিন্তু এ রকম কিছু ঘটবে...'

তিক্ত হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। 'বলেছিলাম না, কোন গুপ্তধনই সহজে হাতে আসতে চায় না!'

ছয়

চিন্তিত ভঙ্গিতে ধস নামা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থেকে ঘনঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কয়েকবার কিশোর। তারপর অশোককে জিজ্ঞেস করল, 'শিয়ালের গর্তটা কোথায় ছিল, একেবারেই বুঝতে পারছ না?'

'চেষ্টা করলে হয়তো পারব,' জবাব দিল অশোক। 'গাছপালাগুলো উল্টে

গিয়েই সর্বনাশটা করেছে। একেবারে বদলে দিয়েছে জায়গাটার চেহারা।'

'হুঁ। ভাল একটা ঝামেলায় পড়লাম। আজ আর খোঁজার সময় নেই। সঙ্গে শাবল-কোদালও নেই আমাদের যে খুঁড়ে দেখব।'

'কারণ যদি আসে?'

'এলে কি হবে? কোথায় খুঁজবে? গর্তটা কোথায় আছে জানা ছিল তোমার, তা-ও চিনতে পারছ না এখন। আর ও তো জানেই না। সুতরাং সুবিধার দিক থেকে তার চেয়ে এগিয়ে রয়েছি আমরা।'

মুসা বলল, 'তা ছাড়া কেবিনের খাবার তো সব সাফ করে ফেলেছে। খাবার আনতে কিছু সময়ের জন্যে হলেও অন্য কোথাও যেতে হবে তাকে।'

'হ্যাঁ, সেটাও একটা কথা,' কিশোর বলল। 'তবে ভাল একটা ঝামেলায় পড়লাম। এই মাটি-পাথর আর গাছপালার স্তূপ সরানো সোজা কথা নয়।' ঘড়ি দেখল সে। 'চৌহানের আসার সময় হয়েছে। চলো। সব শুনলে সে-ও সাহায্য করতে পারবে আমাদেরকে।'

'কি জানি!' রবিন আর বিশেষ ভরসা করতে পারছে না।

'মানে?'

'আবহাওয়ার পরিবর্তন টের পাচ্ছো? সাগরের দিকে তাকিয়ে দেখো।'

ভূমিধসের দিকে মনোযোগ থাকায় অন্য কোনদিকে নজর দিতে পারেনি এতক্ষণ কিশোর। ঘুরে তাকাল সাগরের দিকে। সাদা কুয়াশার চাদর সব কিছু ঢেকে দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। পেছনের কোন কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না।

'সর্বনাশ! জলদি চলো!' দ্রুত হাঁটতে শুরু করে দিল সে। 'চৌহানেরও নিশ্চয় চোখে পড়েছে এই কুয়াশা। সময় হওয়ার আগেই তাহলে আমাদের তুলে নিতে চলে আসতে পারে।'

ছুটতে শুরু করল ওরা। কিন্তু কুয়াশার সঙ্গে পারল না। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল কুয়াশা। ওরা একশো গজ পেরোনোর আগেই, কেবিনটা চোখে পড়ার আগেই, ভেজা কুয়াশা ঘিরে ফেলল ওদের।

'সাবধান!' কিশোর বলল। 'বেশি কিনারে যেয়ো না। কিনার দিয়ে নিচে পড়ে গেলে শেষ। একে অন্যের হাত ধরে রাখো।'

হাত ধরাধরি করে লম্বা একটা মানব-শিকল তৈরি করে এক সারিতে এগোল ওরা। সাবধানে। ধীরে ধীরে।

'উঁহুঁ, লাভ হচ্ছে না,' কিশোর বলল। 'এ ভাবে চলতে থাকলেও বিপদ এড়াতে পারব না। পাহাড় থেকে পড়ে কিংবা চোরাকাদায় ডুবে মরতে হবে। অন্ধের মত হাতড়ে বেরিয়ে কপ্টার ল্যান্ডিঙের জায়গা খুঁজে পাব না। চৌহান আসবে না আমি শিওর। এই কুয়াশার মাঝে যে নামাও যাবে না, ওড়াও যাবে না, এটুকু বোধ নিশ্চয় ওর আছে। দ্বীপটাই দেখতে পাবে না, থাক তো আমাদের। যে হারে ছড়াচ্ছে এতক্ষণে নিশ্চয় এই কুয়াশা মেইনল্যান্ডেও চলে গেছে। সব কিছু বাদ দিয়ে এখন কেবিনটা খুঁজে বের করা দরকার আমাদের। ওটার মধ্যে ঢুকতে পারলেই কেবল বাঁচব।'

'ভাবছি, কতক্ষণ থাকবে এই জঘন্য কুয়াশা!' মুসা বলল।

'বলা অসম্ভব,' জবাব দিল রবিন। 'এই কুয়াশার কথা যতটুকু পড়েছি, দুই ঘন্টাও থাকতে পারে, কিংবা দুই হপ্তা: সবই নির্ভর করে স্রোত, বাতাসের গতিবিধি আর তাপমাত্রার পরিবর্তনের ওপর।'

'দারুণ খবর শোনালে,' তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। 'আসার আর জায়গা পেল না যেন কারুণের ট্রলার। ঝড়ে পড়েছিল ভাল কথা, কিন্তু ভাল কোন জায়গায় ভেসে যেতে পারল না? মাইকেল ব্যালান্টাইনের প্রবাল দ্বীপের মত কোথাও। যত্তসব!' গজগজ করতে থাকল মুসা।

'ওসব বলে তো আর লাভ নেই,' থামিয়ে দিল কিশোর। 'বরং কেবিনটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করো।'

হাত ধরাধরি করে হেঁটে চলল ওরা। অদ্ভুত এক সাদা অন্ধকারের জগতে প্রবেশ করেছে যেন। ভয়াবহ নীরবতা। মাঝেসাঝে একআধটা গালের তীক্ষ্ণ কর্কশ চিৎকার ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ভূতুড়ে সেই ডাক। বাসা খুঁজে বেড়াচ্ছে বোধহয় পাখিগুলো।

নিজেকে বেশ ভাল গাইড প্রমাণ করল অশোক। কোন রকম বিপত্তি ছাড়াই খুঁজে বের করল কেবিনটা। আশেপাশে ছড়ানো জঞ্জাল এ কাজে তাকে বিশেষ সহায়তা করল।

একে একে ঘরে ঢুকল সবাই। দরজা লাগিয়ে দেয়া হলো। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ভেজা কপাল মুছতে মুছতে কিশোর বলল, 'চুলা ধরানো দরকার। হাত-পাগুলো অন্তত গরম করা যাবে।'

লাকড়ি আছে। চুলা জ্বালতে অসুবিধে হলো না। আগুনের কাছে আরাম করে বসল সবাই। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কেউ কথা বলল না। বলার কিছু নেইও। বাইরে থেকে কোন রকম শব্দ আসছে না। ভূতুড়ে এক ধরনের নীরবতা নিয়ে হাজির হয়েছে আজব কুয়াশা। বিশাল এক তেরপল দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে যেন দ্বীপটাকে।

সময় কাটতে লাগল।

'এ ভাবে বসে থাকতে ভাল লাগছে না আমার,' খাবারের তাকগুলোর দিকে তাকাতে লাগল মুসা। 'কিছুই কি ফেলে রেখে যায়নি? না খেয়ে মরতে রাজি না আমি।'

'দোষটা আমারই,' কিশোর বলল। 'কুয়াশার কথা, এ ধরনের অঘটনের কথা মাথায় রাখা উচিত ছিল। খাবার না নিয়ে এ ভাবে দ্বীপে নামাটা মস্ত বোকামি হয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলাম স্রেফ নামব আর গর্ত থেকে ব্যাগটা বের করে নিয়ে চলে যাব। অথচ হলোটা কি দেখো!'

'চৌহান কিন্তু বলেছিল এখানকার আবহাওয়াকে বিশ্বাস নেই,' রবিন বলল।

'নিশ্চয় কুয়াশার কথাই ইঙ্গিত করেছিল সে। আমি গাধাই খেয়াল করিনি।'

'যা হবার হয়েছে,' মুসা বলল। 'নিজেকে গালমন্দ করে এখন আর লাভ নেই।'

আবার চুপ থাকা।

দীর্ঘ নীরবতা।

অবশেষে নীরবতা ভাঙল মুসা, 'কিছুই কি করা যায় না? পেঁচার মত চোখ গোল গোল করে শুধুই আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকা, সইতে পারছি না আমি।'

'কি করবে?' ভুরু নাচাল কিশোর।

'কিছু একটা। আর কিছু করার না থাকলে চিৎকার করে বেসুরো গলায় গান তো গাইতে পারব, সে-ও ভাল, এ ভাবে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে।'

অশোক বলল, 'একটা কাজ অবশ্য করা যায়।'

আগ্রহী হয়ে তাকাল কিশোর। 'কি?'

'ধস নামা জায়গাটায় চলে যেতে পারি। বলা যায় না, হাতড়ে হাতড়ে বেরও করে ফেলতে পারি শিয়ালের গর্তটা। বাইরে থেকে যতটা মনে হয়েছে, ওপরের মাটির স্তর অতটা পুরু না-ও হতে পারে।'

'জায়গাটাই খুঁজে পাবে না। শিয়ালের গর্ত তো দূরের কথা।'

'কেন পাব না? কেবিনটা কি খুঁজে বের করিনি?'

ভেবে দেখল কিশোর। 'পেলে সেটা বড়ই বিস্ময়কর একটা ঘটনা হবে। ঠিক আছে, বসে থাকতে চাও না যখন, চেষ্টা করতে দোষ কি? যাও। তবে দ্বীপের কিনারের পাহাড়ের দেয়াল থেকে দূরে থাকবে। যে রকম উঁচু। নিচে পড়লে ভর্তা।'

'কাছে গেলে ঢেউয়ের শব্দ শুনতে পাব।'

'অত কাছে যাওয়ারই দরকার নেই। দয়া করে পথ হারিয়ো না, তাহলেই আমি খুশি। এমনিতেই ভাল বেকায়দায় পড়েছি। তোমাকে খুঁজতে যাওয়ার ঝামেলায় ফেলো না আর।'

'ফেলব না,' কথা দিয়ে বেরিয়ে গেল অশোক।

'শুধু শুধু কষ্ট করতে গেল,' রবিন বলল। 'কোনই লাভ হবে না।'

'ওর অস্থিরতাটা আমি বুঝতে পারছি,' জবাব দিল কিশোর। 'ব্যাগটা খুঁজে বের করা আমাদের চেয়ে ওর জন্যে অনেক বেশি জরুরী। ওই জিনিসগুলোর কোন দাম নেই আমাদের কাছে, অথচ ওর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ওগুলোর ওপর। তবে সত্যি কথাটা বলতে কি, ওগুলো না পাওয়া গেলেও অবাক হব না আমি এখন। আজ পর্যন্ত যতবার গুপ্তধন খুঁজতে বেরিয়েছি, কোনটাই প্ল্যানমত হতে দেখিনি। প্রথম দিকে মনে হয় খুব সহজেই পাওয়া যাবে; কিন্তু যায় না।'

'মন খারাপ করে লাভ নেই, কিশোর,' সান্ত্বনা দিল রবিন। 'ব্যাগটা পাওয়া যাবেই। দেখো তুমি।'

'লাভ-লোকসান নিয়ে ভাবছি না আমি। কিন্তু এ ভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে আমারও ভাল লাগছে না। অহেতুক সময় নষ্ট করা। সেজন্যেই রাগ হচ্ছে।'

আবার নীরবতা। এবার অনেকক্ষণ ধরে। এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল একটা কথাও কেউ বলল না। দুই ঘণ্টা। একটু পর পরই উঠে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় কিশোর। বাইরে আবহাওয়ার অবস্থা দেখে। একই রকম রয়েছে। কোন পরিবর্তন নেই। দৃষ্টি চলে না। দোরগোড়ায় সাদা রঙ করা দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে কুয়াশা।

ঘড়ির দিকে তাকাল একবার কিশোর। 'কোন বোকামি যে করতে গেছে অশোক, কে জানে!'

'আমি জানি কি করছে,' বিষণ্ণকণ্ঠে জবাব দিল মুসা। 'পুরোপুরি হারিয়ে গেছে। দয়া করে আমাকে এখন খুঁজতে যেতে বোলো না।'

খানিক পরেই একটা শব্দ চমকে দিল ওদের সবাইকে। অদ্ভুত তীক্ষ্ণ শব্দ, কিন্তু চাপা। কুয়াশার কারণেই বোধহয় এ রকম শোনাল।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর, 'কিসের শব্দ?'

'আমার কাছে তো গুলির শব্দ বলেই মনে হলো,' মুসা বলল।

'অশোকের কাছে পিস্তল নেই। আর থাকলেও লুকিয়ে রেখেছে, আমাদের জানায়নি।'

'ও পিস্তল পাবে কোথায়? আর এই কুয়াশার মধ্যে কিসের ওপর গুলি চালাবে?' রবিনের প্রশ্ন।

'শিয়াল খাওয়ার শখ হয়েছে হয়তো,' মুসা বলল। 'কিংবা ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতে শিয়ালের চামড়ার কোট চায়, সেই বুনো পশ্চিমের মত।'

'আমার কিন্তু অন্য রকম মনে হচ্ছে,' রবিন বলল।

'আমারও,' একমত হলো কিশোর। 'অশোক গুলি চালিয়ে না থাকলে অন্য কেউ চালিয়েছে, তারমানে অন্য কেউ রয়েছে দ্বীপে।' ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল সে, 'এটাই একমাত্র জবাব...'

থেমে গেল সে। বাইরে আরেকটা শব্দ হয়েছে। কেবিনের কাছেই। খাবারের খালি টিনে লাথি লেগেছে কারও। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। কোন ধরনের একটা অস্ত্রের জন্যে চোখ বোলাল কেবিনের মধ্যে।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল অশোক। চকের মত সাদা হয়ে গেছে মুখ। গালের একপাশে রক্ত।

'কারুণ!' ফিসফিস করে বলল সে। 'দ্বীপেই আছে।'

'কি বলছ!'

'একা নয়। তার সঙ্গে আরও লোক আছে।'

'গুলি লেগেছে নাকি তোমার?'

'গাল ছুঁয়ে চলে গেছে। তাতেই যে রকম জ্বালা করে উঠল।'

'দেখি, সোজা হও তো। কতখানি লেগেছে দেখা যাক।' ক্ষতটা পরীক্ষা করল কিশোর। 'তেমন কিছু না। কি হয়েছিল?'

'ধসের কাছে ঠিকমতই চলে গিয়েছিলাম,' অশোক জানাল। 'পেছন থেকে এসে হাজির হলো ওরা।' কথা বলতে গিয়ে হাঁপাচ্ছে এখনও অশোক। 'তিনজন। হাতে পিস্তল। কারুণ বলল, সে জানত, আমি ফিরে আসবই। ব্যাগটা কোথায় রেখেছি জিজ্ঞেস করল সে। এমন ভান করে রইলাম, যেন সে কি বলছে বুঝতে পারছি না। কিন্তু এবার আর বোকা বানাতে পারিনি ওকে। পিস্তল তুলে শাসাতে লাগল, না বললে গুলি করে মারবে।'

'ব্যাগটা কোথায় লুকিয়েছ না বলা পর্যন্ত মারবে না সে,' কিশোর বলল। 'তোমাকে মেরে ফেললে ওটা কোথায় আছে জানতে পারবে না ও আর

কোনদিন।'

'আমিই লুকিয়েছি, এখনও এ ব্যাপারে শিওর না সে। বুঝল কি করে বুঝলাম না।'

'তোমার দ্বীপে ফিরে আসাটাই সন্দেহ জাগিয়েছে তার,' কিশোর বলল। 'ওগুলোর জন্যে ছাড়া এই জঘন্য দ্বীপে আর কিসের আকর্ষণে আসতে যাবে তুমি না বোঝার মত বোকা নয় সে।'

'তা ঠিক।'

'তারপর কি করলে?'

'সোজা ঘুরে দৌড় মারলাম। কুয়াশা না থাকলে পারতাম না। গুলিটা কারুণ করেনি। তার এক সঙ্গী করেছে। থামলাম না। সোজা কেবিনের দিকে ছুটলাম।'

'কারুণের সঙ্গে ক'জন আছে বললে?'

'দু'জনকে দেখেছি।'

'ভাল গ্যাড়াকলেই পড়লাম দেখছি,' মুসা বলল তিক্তকণ্ঠে। 'আমাদের দেখল নাকি!'

'হেলিকপ্টারের শব্দ নিশ্চয়ই শুনেছে,' কিশোর বলল। 'আমাদের নামতেও দেখতে পারে। না দেখলেও বুঝবে অশোক একা আসেনি।' মাথা ঝাঁকাল সে, 'কেবিনটাকে শুয়োরের খোঁয়াড় কারা বানাল এখন বোঝা যাচ্ছে।'

'কিন্তু দ্বীপে এল কিভাবে ওরা?' মুসার প্রশ্ন। 'সাঁতার কেটে নিশ্চয়ই নয়।'

'মিলারস টাউন থেকে মোটর বোটে করে এসেছে, এ তো সহজ কথা,' কিশোর বলল। 'হয়তো এখনও এখানেই আছে বোটটা। দ্বীপের কিনারে কোনও খাঁড়িতে লুকানো। ওপর থেকে দেখা যায় না।'

'আমার মনে হয় ওদের বিরুদ্ধে কিছু করার আগে বোটটা খুঁজে বের করা উচিত আমাদের,' মুসা বলল।

'পারলে তো ভালই হতো,' নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল কিশোর। 'কিন্তু এই কুয়াশার মধ্যে সম্ভব না। দ্বীপের কিনারগুলো মারাত্মক বিপজ্জনক। একবার চক্কর দিতেই আট-দশ মাইল হাঁটার ধাক্কা। তার ওপর টিলা-টক্কর। কুয়াশা না থাকলে এক কথা ছিল।'

'কি করতে বলো তাহলে?' মুসার প্রশ্ন।

'আটকে বসে থাকতে হবে। কুয়াশা না কাটলে আর কিছুই করা যাবে না।'

দরজার বাইরে খুট করে শব্দ হলো। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল সে। ঘরের সব ক'টা চোখ এখন দরজার দিকে।

খোলা দরজার বাইরে কুয়াশার দেয়ালে ছায়া পড়ল। একজন মানুষ। দেয়ালের এ পাশে বেরিয়ে এল সে। হাতে পিস্তল।

লোকটা অশোকের চেনা। তিন গোয়েন্দাকেও চিনিয়ে দিতে হলো না। অনুমানেই বুঝে গেল লোকটা কে। তার পেছনে আরও ছায়ার নড়াচড়া দেখা গেল।

ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেছে সবাই। কেউ নড়ল না।

সাত

ধীরে সুস্থে ঘরে ঢুকল কারূণ। 'তুমি এখানে,' অশোকের দিকে তাকিয়ে মসৃণ কণ্ঠে বলল সে। 'পালালে কেন? গালে লেগেছে বুঝি। দেখো তো কাণ্ড, মাথায়ও তো লাগতে পারত। আমার এই বন্ধুগুলো পিস্তল হাতে থাকলে পাগল হয়ে ওঠে, বড় বেশি তাড়াহুড়া শুরু করে। বাহ্, বহু লোকের সমাগম হয়েছে দেখছি।'

ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল সে। ঠোঁটের হাসিটা লেগেই রয়েছে। পেছনে ঢুকল তার দুই সহকারী। কুয়াশা ঢুকছে। একজন লাগিয়ে দিল দরজাটা।

'বোকামি করে না বসলে খারাপ কিছু ঘটবে না,' একে একে সবার দিকে তাকাল কারূণ। অশোকের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো। 'শুধু শুধু দৌড় দিতে গেলে, তোমার গায়ে কখনও আঘাত করেছি আমি? তোমাকে আমি একেবারে নিজের ছেলের মতই দেখি।'

কারূণের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। উষ্কখুষ্ক চুলদাড়ি। মুখে হাসি লেগে থাকলেও চোখের দিকে তাকালেই কেঁপে ওঠে বুকের মধ্যে। সমস্ত নিষ্ঠুরতা যেন ওখানেই গিয়ে জড়ো হয়েছে। তার দুই সঙ্গীর দু'জনেই স্থানীয় লোক। চেহারা দেখেই বলে দেয়া যায় দশ টাকার জন্যে নিজের মায়ের গলা কাটতেও পিছপা হবে না এরা। একজনের মাথায় জাহাজীদের টুপি।

'এখন বলে ফেলো তো, কোথায় রেখেছ ব্যাগটা?' অশোককে জিজ্ঞেস করল কারূণ।

'কথা যদি বলতেই হয়, আমার সঙ্গে বলুন,' কিশোর বলল।

কারূণের কালো চোখের তারায় আগুনের ঝিলিক দেখা গেল। 'এই, কে তুমি?'

'সেটা পরে জানতে পারবেন।'

'অশোক আমাদের লোক।'

'ছিল। এখন নেই।'

'দেখে তো বয়েস বেশি মনে হচ্ছে না। কিন্তু কথা বলছ যেন বুড়োর দাদা।'

'বয়েস কম হলেও অভিজ্ঞতা প্রচুর।'

ভ্রূকুটি করল কারূণ। 'নিজের চরকায় তেল দিলেই ভাল করবে, খোকা।'

'তাই তো দিচ্ছি।'

'কে বলল?'

'আমি।'

'নাম বলতে চাও না, তাই না? বেশ, বোলো না। তবে মালের ভাগ যদি চাওয়ার ইচ্ছে থাকে, মাথা থেকে দূর করে দাও ওসব দুশ্চিন্তা।'

'ভাগই হবে না, দুশ্চিন্তা করতে যাব কেন,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

তাকিয়ে রইল কারূণ। ছেলেটার দুঃসাহস অবাক করছে তাকে।

'তাকিয়ে তাকিয়ে শুনছ কি, বস,' ধৈর্য হারাল টুপি পরা লোকটা। ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'দাও না ফড়ফড়ানি বন্ধ করে। অকারণ সময় নষ্ট।'

'সময় এখনও বহুত নষ্ট হওয়া বাকি আছে আপনাদের,' জবাব দিল কিশোর।

কি যেন ভাবছে কারুণ। অশোকের দিকে তাকাল। 'তুমি কিছু বলবে না?'

'বলব। পুলিশকে সব জানিয়ে দিয়েছি কিনা, এ খবরটাই তো শুনতে চান?' ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করল অশোক।

রাগ দমন করতে পারল না আর কারুণ। ধরে রাখা হাসিটা মিলিয়ে গিয়ে বিকৃত হয়ে গেল মুখটা। ঝট করে পিস্তল উঁচু করল। ভয়ানক কণ্ঠে হিসিয়ে উঠল, 'নোংরা ইঁদুর কোথাকার...'

'ওকে গুলি করে, কিংবা গালি দিয়ে আপনার কোন লাভ হবে না, মিস্টার কারুণ শিকদার,' বাধা দিল কিশোর। দুই নাবিকের দিকে তাকাল। 'আপনারা কেন এর দলে ভিড়েছেন, বুঝতে পারছি না আমি। স্পষ্ট কথা শুনে রাখুন, আমরা পুলিশের লোক। ভাল চাইলে যেখান থেকে এসেছেন, চলে যান। পরে নইলে এমন পস্তান পস্তাবেন, নিজের আঙুল নিজে কামড়ে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করবে।'

'মানে?' টেনেটুনে জামাটা ঠিক করল দ্বিতীয় নাবিক। 'তোমাদের দেখে তো ঠিক পুলিশ মনে হচ্ছে না। পুলিশে ভর্তি হওয়ার জন্যে আরেকটু বেশি বয়েস লাগে।'

'কেন, ভর্তি না হয়ে পুলিশকে সহায়তা করা যায় না?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'শুনুন, বাংলাদেশ আর ভারতের পুলিশ বিভাগ আপনাদের কথা সব জানে,' ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করল সে। 'মিয়ানমারের কোস্ট গার্ডকেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। সবাই আপনাদের অপেক্ষায় ওত পেতে আছে। কারুণের সঙ্গে আপনাদের দেখা গেলে কেউ বাঁচতে পারবেন না। পালিয়ে পার পাবেন না। ও একটা খুনী। দু'জন লোককে ইতিমধ্যেই খুন করেছে। আপনাদেরকেও করবে না কি গ্যারান্টি আছে তার?'

'ও মিথ্যে কথা বলছে,' সিরিশ কাগজ ঘষার শব্দ বেরোল যেন কারুণের কণ্ঠ থেকে।

'মিথ্যে বলে লাভটা কি আমার?' শীতলকণ্ঠে প্রশ্ন করল কিশোর।

দ্বিধায় পড়ে গেছে দ্বিতীয় নাবিক। 'সত্যিই কি তোমরা পুলিশের সহকারী?'

'আমরা গোয়েন্দা। পুলিশের সহায়তায় এখানে এসেছি। লুটের মালের কথা সব জানে পুলিশ।'

'হুঁ। সেজন্যেই গলায় এত জোর। এই অশোক ছোকরাকে তোমরাই নিয়ে এসেছ?'

'উহুঁ। সে-ই আমাদের পথ দেখিয়ে এনেছে।'

'তারমানে মালগুলো কোথায় জানে সে?'

'এই দ্বীপেই আছে, এটা জানে।'

'ওর কথা শুনো না,' চেঁচিয়ে উঠল কারুণ। 'ও তোমাদের ধোঁকা দিচ্ছে। আমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছি, সে-ও সেই একই উদ্দেশ্যে এসেছে। অশোক ভাল করেই জানে মালগুলো কোথায়। তুমি এখন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ, তাই না, অশোক? আমাদের দেখাবে মালগুলো কোথায় রেখেছে। আমাদেরকে নিয়ে যাবে

ওগুলোর কাছে।'

'ওকে নিয়ে যাওয়া আমরা ঠেকাতে পারব না,' কারুণকে বলল কিশোর। ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে তার মাথায়। 'তবে জেনে রাখুন, ওর যদি একটা চুলও ছেঁড়ে, পুলিশ ছাড়বে না আপনাকে। আমিও ছাড়ব না। কুমেরু থেকে হলেও খুঁজে বের করে আনব আপনাকে।'

'বাপরে! তেজ কত!' দাঁত বের করে হাসল কারুণ। 'অশোক, এসো।'

অসহায় দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল অশোক।

'যাও তুমি,' এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই, বুঝতে পারছে কিশোর। কথার জোরে কারুণকে নিরস্ত করার চেষ্টা করছে। মনে মনে ভয় পাচ্ছে সে। 'তোমাকে কিছু করার সাহস পাবে না ওরা।'

'বেশ,' মাথা ঝাঁকাল অশোক। 'তুমি যখন বলছ।'

'তোমরা এখানে থাকো,' তিন গোয়েন্দাকে বলল কারুণ। 'খবরদার, বেরোনোর চেষ্টা করবে না কেউ। তোমাদের ওপর নজর রাখা হবে, এ কথাটাও মনে রেখো।'

চলে গেল কারুণরা তিনজন। সঙ্গে করে নিয়ে গেল অশোককে।

দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবাক চোখে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন আর মুসা। মুসা তো ক্ষোভের সঙ্গে বলেই ফেলল, 'এত সহজে যেতে দিলে? বাধা দেয়া যেত।'

'লাভ হতো না। ওদের হাতে পিস্তল। বেশি কিছু করতে গেলে গুলি করে বসত।'

'অশোককে সঙ্গে নিয়ে গেছে যখন,' মুসা বলল, 'ঠিকই জিনিসগুলো উদ্ধার করে ফেলবে। পালিয়ে যেতেও অসুবিধে হবে না।'

'জিনিসগুলো এখন পাওয়া অশোকের জন্যেও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। গর্তটা তো আর আগের মত নেই।'

'কোন্ জায়গায় গর্তটা ছিল অশোককে বলতে বাধ্য করবে ওরা।'

'তারপর খোঁড়া শুরু করবে, এই তো?' কিশোর বলল। 'খুঁড়তে শাবল-কোদাল লাগে। পাবে কোথায়?'

'ধুর, এ সব তর্কাতর্কি ভাল্লাগছে না আমার,' হাত নাড়ল মুসা। 'আমার পেটে ছুঁচো নাচছে। খাবার দরকার। সেটা কোথা থেকে জোগাড় করা যাবে, বুঝে গেছি। একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়।'

'কোথা থেকে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বোটে করে এসেছে কারুণরা। কোথাও বাঁধা আছে সেটা। রাতে সেটাতেই ঘুমায় ওরা, সেজন্যেই এ কেবিনটা ব্যবহার করে না।'

'তাতে কি?'

'বোট আছে, তারমানে খাবারও আছে। গিয়ে নিয়ে এলেই পারি।'

'কে যাচ্ছে?'

'খিদেটা যেহেতু আমারই বেশি, আমিই যাব। বোটটা খুঁজে বের করব। কুয়াশা চোখ ঠেকাচ্ছে, নাক তো আর ঠেকাতে পারবে না। বহুদূর থেকে খাবারের

গন্ধ পাব আমি।'

হেসে ফেলল রবিন। 'তা তুমি সত্যিই পারো। কিন্তু আরেকটা কথা ভুলে যাচ্ছ। কারণ বলে গেছে, একজন গার্ড রেখে যাবে আমাদের পাহারা দেয়ার জন্যে। সেটার কি হবে?'

'ওসব ধাপ্পা। কে বসে থাকতে যাচ্ছে কুয়াশার মধ্যে আমাদের দিকে নজর রেখে। ওই ভয়ে বসে থাকলে না খেয়ে মরতে হবে। না খেয়ে মরার চেয়ে বরং বুলেটকে বেছে নেব আমি।'

'বেশ, ধরা যাক, প্রহরীকে ফাঁকি তুমি দিয়েই ফেললে,' কিশোর বলল। 'তারপরেও প্রশ্ন থাকে। এই কুয়াশার মধ্যে কতদূর হাঁটা লাগবে তোমার কে জানে।'

'হাঁটা লাগলে হাঁটব।'

'হেঁটে হেঁটে গিয়ে যদি দেখো বোট আগলে বসে আছে কারুণেরা, তখন কি করবে?'

'এত যদি যদি করলে খাবার পাওয়া যাবে না। তবে বাজি ধরে বলতে পারি, ওরা এখন বোটের ত্রিসীমানায়ও নেই। খেপা কুত্তা যেমন খরগোশের পেছনে ছোটে, ওরাও তেমনি ধস নামা জায়গাটার দিকে ছুটেছে গুপ্তধনের লোভে।'

হাল ছেড়ে দিল কিশোর। 'যা ভাল বোঝো করো। খাবারের জন্যে এতটা মরিয়া হয়ে গেলে ঠেকানো যায় না কাউকে।'

'আরও একটা কথা!' তুড়ি বাজাল মুসা। 'আজ হলো কি আমার? বুদ্ধির পর বুদ্ধি খুলে যাচ্ছে! সম্ভবত ওই কুয়াশা। এই আজব কুয়াশা মানুষের মগজকে উন্নত করে তোলে, বুদ্ধি বাড়িয়ে দেয়, আমিই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।'

কৌতূহলী হলো কিশোর। 'এই নতুন বুদ্ধিটা আবার কিসের?'

'আমি বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে এটাও বোঝা হয়ে যাবে, সত্যিই কেউ পাহারা দিচ্ছে কিনা। পাহারা দিলে গুলি করে কিনা।'

'না দিলে?'

'বুঝবে এলাকা সাফ।'

'তাতে?'

'হলো কি তোমার আজ?' ভুরু কুঁচকাল মুসা। 'কুয়াশা আমার মগজকে সাফ করল, আর তোমারটাকে কি ভোঁতা বানাল? শোনো, পাহারা না থাকলে রবিন কিংবা তুমি যে কোন একজন দৌড়ে চলে যেতে পারবে সেই ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডটাতে, যেখানে চৌহানের নামার কথা। কুয়াশা সরে গেলে ওখানে কারও না কারও অপেক্ষা করা উচিত।'

'একা কেন? দু'জনে একসঙ্গে গেলে ক্ষতি কি?' মুসার এই বুদ্ধিচর্চায় মজা পাচ্ছে মনে হলো কিশোর।

'নাহ্,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা, 'তোমার বুদ্ধি আজ সত্যি সত্যি ঘোলা হয়ে গেছে। আরে বাবা, অশোক যদি কোনভাবে পালিয়ে আসে কারুণদের হাত থেকে, কেবিনে এসে কাউকে না দেখে, কি ভাববে? ভাববে, আমরা কেটে পড়েছি। ওর কথা বিন্দুমাত্র ভাবিনি। দিশেহারা হয়ে পড়বে না সে তখন?'

হাসি ছড়িয়ে গেল কিশোরের মুখে। 'তোমার মাথাটা আজ সত্যি পরিষ্কার হয়ে গেছে, মুসা। ঠিক আছে, যা করতে ইচ্ছে করছে, করোগে। এখানে বসে বসে আঙুল চোষার চেয়ে কিছু একটা করাই বরং ভাল, যত বিপজ্জনকই হোক।'

'তাহলে যেতে বলছ? আমার কিন্তু হারানোর কিছু নেই।'

'আছে। পৈত্রিক প্রাণটা।'

'ওটা আমি হারাব না, ভরসা রাখতে পারো আমার ওপর। ফিরে আমি আসবই। এবং খাবার সহ।'

এগিয়ে গিয়ে আস্তে করে দরজাটা সামান্য ফাঁক করল মুসা। চুইয়ে ঢুকতে শুরু করল কুয়াশা। একটানে বাকিটা ফাঁক করেই হঠাৎ লাফ দিয়ে দরজার বাইরে পড়েই দৌড়।

'গেল!' হাহাকার করে উঠল রবিন, 'আজ ও আর বাঁচবে না! এখনই শুরু হবে গুলি!'

জবাব দিল না কিশোর।

কান পেতে আছে গুলির শব্দ শোনার অপেক্ষায়।

আট

বোটটা ঠিকই খুঁজে বের করল মুসা। এ ব্যাপারে দুটো জিনিস সাহায্য করল ওকে। প্রথমটা, কয়েক ঝলক দমকা বাতাস। দ্বিতীয়টা, দোয়া-দরূদ।

কেবিন থেকে বেরিয়ে সোজা নাক বরাবর হাঁটা দিয়েছিল সে। জানত, এ ভাবে হাঁটলে একটা না একটা সময় দ্বীপের কিনারে পৌঁছে যাবেই। কুয়াশার মধ্যে তীর দেখা না গেলেও ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ শুনে বুঝতে পারবে তীরের কাছাকাছি চলে এসেছে।

তীরের কাছে পৌঁছে পানিকে একপাশে রেখে হেঁটে এগিয়েছে সে। তাতে ভুল করে পাহাড়ের ওপর থেকে পানিতে পড়ার সম্ভাবনা কম ছিল।

কেবিন থেকে বেরোনোর পর গুলির ভয় করেনি তেমন। কারণ, বুঝতে পেরেছিল, কোন কারণেই কারূণের কাছছাড়া হবে না তার দুই সহকারী। কে অকারণে কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে যাবে কেবিনের দরজার দিকে চোখ রেখে, যেখানে দরজাই দেখা যায় না কুয়াশার জন্যে। তা ছাড়া কারূণকে বিশ্বাস করারও কোন কারণ নেই, সন্দেহের বীজটা ওদের মাথায় বেশ ভালমতই বপন করে দিয়েছে কিশোর। ওরা জেনে গেছে, জিনিসগুলোর জন্যে ইতিপূর্বে দু'দুটো খুন করেছে কারূণ। অতএব আগে করলেও এখন আর তাকে বিশ্বাস করবে না ওরা। ভাববে, জিনিসগুলো পেয়ে গেলেই ফাঁকি দিয়ে পালাবে। সুতরাং কাছে কাছে থাকতে চাইবে।

সাগরের দিক থেকে আসা কয়েক ঝলক দমকা বাতাস কুয়াশা উড়িয়ে নিয়ে গেছে বেশ কিছুটা। প্রথম দিকে পাঁচ গজের বেশি দেখা যাচ্ছিল না। বাড়তে বাড়তে সেটা একশো গজে এসে ঠেকেছে এখন।

মিনিট পঁচিশেক হাঁটার পর কানে এল গান। শব্দ লক্ষ্য করে এগোল সে। দূর থেকে গান মনে হলেও কাছে আসার পর বুঝল সুর করে আরবীতে দোয়া-দরূদ পড়ছে কেউ। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে যেতেই প্রায় শ'খানেক ফুট নিচে খাঁড়িতে ভাসমান বোটটা চোখে পড়ল। বোটের ডেকে দাঁড়ানো একজন টুপি পরা মানুষ। ভঙ্গি দেখে মনে হলো জোরাল কণ্ঠে দোয়া পড়ে পড়ে যেন ভয় তাড়াচ্ছে।

হাসি ফুটল মুসার মুখে। যাক, পাওয়া গেল বোটটা। তবে তাতে মানুষ দেখে দমেও গেল। নিশ্চয় পাহারা দিচ্ছে লোকটা। ওকে সরাতে না পারলে খাবার চুরি করতে পারবে না। কি করা যায়, ভাবতে ভাবতে বুদ্ধি এসে গেল মাথায়। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল সে।

শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাল লোকটা। চমকে গেল। 'কনে রে! ও মিয়া, আমনে কন? ভূত নি কুনো?' তাড়াতাড়ি দোয়া পড়ে জোরে জোরে ফুঁ দিতে শুরু করল বুকে। 'ও মা গো! আগেই বুইজ্জিলাম, এমন জাগার জাগা, ভূত ন থাই হারে না।'

কাছে যেতে যেতে অভয় দিল মুসা, 'না না, আমি ভূত না। মানুষ। চিনতে পারছেন না?'

'তাইলে বাই আমনে এত কালা কা? ভূতেরা কত রূপ ধরি আইয়ে। ঠিক ঠিক মানুষ ত?'

ভাষা শুনে ভুরু কুঁচকে গেল মুসার। কোথায় শুনেছে এ রকম বাংলা উচ্চারণ আর টান মনে করার চেষ্টা করল। মনে পড়ল, নোয়াখালি। বাংলায় জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমি মানুষই। আপনার কোন ভয় নেই।'

বোটের কাছে এসে দাঁড়াল সে। কাছে থেকে দেখল লোকটাকে। ছোটখাট মানুষ। টুপিটা মাথার ঠিক পেছনটায় আলতো করে বসিয়ে দিয়েছে। মাথার সামান্যই ঢাকা পড়েছে তাতে। চুল খুবই পাতলা লোকটার। ভুরু বলতে নেই, চাঁছাছোলা। চোখে পাপড়িও যে ক'খানা আছে, গোণা যায়। থুতনির কাছে অল্প কিছু দাড়ি। ঘনঘন দু'তিন বার আঙুল চালাল সেগুলোতে। 'ত, আমনে কইত্তুন আইছেন, বাই? আমগো মালিকের খবর কি?'

'আপনাদের মালিক?'

'হেতেনে ত কারূণ সাআবের লগেই গেছে।'

'কোনজন? টুপি পরা, না টুপি ছাড়া?'

'টুফি ফরা। হেতেনেই ত এই জাআজের ক্যাপ্টিন।'

'নাম কি?'

'অ, নামও জানেন না। হারিঙ্গা। হারিঙ্গা সাআব।'

'মানে ফারিঙ্গা সাব?'

'হ।'

'এই বোটের মালিকও কি তিনি?'

'হ। ত আমনে কিয়া চান?'

'কারূণ সাহেব আর আপনার মালিকের কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছি আমি। আপনাকে এখুনি যেতে বলেছেন। তীর ধরে মাইল দুয়েক গেলেই পেয়ে যাবেন

তাদের,' হাত তুলে দেখাল মুসা।

'কিয়ের নাই?'

'একটা শাবল-টাবল নিয়ে যেতে বলেছেন। মাটি খোঁড়ার জন্যে। আছে না বোটে?'

'শাবল যে জাআজে নাই, হেইডা হারিঙ্গা সাআবে জানে না? আচইয্য কতা! কোদাইল আছে। অইব নি?'

'কোদাল? হবে হবে। মাটি কাটার জন্যে বরং ভালই হবে। আপনি ছাড়া আর কে আছে এই বোটে?'

'না, আর কেঅ নাই। একলা একলা থাই খোদারে ডাইকতে আছিলাম। সব সময় দোয়া-দরুদ হড়ন বালা।'

'বোটে কি কাজ করেন?'

'রান্দনের কাম।'

'আপনি বাবুর্চি?'

'হ।'

'তাড়াতাড়ি চলে যান। ততক্ষণ আমি বোট পাহারা দিই।'

বোটে উঠল মুসা। কোদাল আনতে ভেতরে চলে গেল লোকটা। খানিক পরে বেরিয়ে এল কোদাল হাতে। জিজ্ঞেস করল, 'আমনের নাম কিয়া, বাই?'

'মুসা আমান। আপনার?'

'লাতু মিয়া। আমনের নাম হুনি ত মুসলমানই মনে অয়। আসলে মুসলমান নি?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়ি কন দেশে?'

'আমেরিকা।'

'বাউরে! আমেরিকাতও মুসলমান আছে। দেইকছেন নি আল্লার কুদরত। হক্কল দেশে মুসলমান রাখি দিছে। আল্লা আল্লা। আল্লায় ইচ্ছা কইরলে কিয়া ন কইরত হারে। আইচ্ছা বাই, আমনে থাকেন। আমি যাইমু আর আইমু। রান্দুনি গরে চাঁ-ফাতা আছে। বানাই খাইয়েন। বিস্কুটঅ আছে। চাঁ দি বিজাই খাইয়েন।'

কোদাল হাতে তাড়াহুড়া করে নেমে চলে গেল লোকটা। সেদিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল মুসা। তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে লাতু মিয়া। বড়ই সহজ-সরল। মিথ্যে কথা বলে ওকে ঠকিয়েছে বলে খারাপই লাগল তার।

লোকটা কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতেই রান্নাঘরে ঢুকল মুসা। প্রচুর খাবার দেখতে পেল। মোটা একটা কাপড়ের ব্যাগ বের করে তাতে ঠেসে ভরতে লাগল যতটা পারা যায়। ব্যাগটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে আসতে যাবে, হঠাৎ মাথায় এল বুদ্ধিটা। নাহ্, আজ সত্যিই মগজ খুলে গেছে তার। একের পর এক বুদ্ধি বেরোচ্ছেই শুধু।

বোটটা ধ্বংস করে দিয়ে যেতে হবে! গুপ্তধন খুঁজে পেলেও পালাতে পারবে না তাহলে আর কারণের দল। দ্বীপে আটকা পড়বে। হয়তো কেবিনে গিয়ে হামলা চালাবে তখন। সেটা পরের কথা। যখন করে তখন দেখা যাবে।

খাবারের ব্যাগটা প্রথমে তীরে নামিয়ে রেখে এল সে। পেট্রলের ড্রাম থেকে পেট্রল বের করে বোটের ডেকে ঢালতে শুরু করল। কেবিনে ঢুকল কিছু কাপড় নিয়ে আসার জন্যে। কাপড় খুঁজতে গিয়েই পেয়ে গেল পিস্তলটা। একবার দ্বিধা করে সেটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরল। কাপড়গুলো নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। ডেকে ঢালা পেট্রলের ওপর ছড়িয়ে ফেলল ওগুলো। পেট্রল শুষে নিতে লাগল কাপড়। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাপড়ের পলিতা বানিয়ে একমাথা রাখল ডেকে, অন্য মাথা ঢোকাল পেট্রলের ড্রামে। রান্নাঘর থেকে দিয়াশলাই বের করে এনে কাঠি ধরিয়ে ছুঁড়ে মারল পেট্রলে ভেজা কাপড়ের ওপর। একটা মুহূর্তও দেরি না করে প্রায় ডাইভ দিয়ে নেমে এল মাটিতে। তীরে নেমেই একটানে খাবারের ব্যাগটা তুলে কাঁধে ফেলে দিল দৌড়।

আগুন ধরে গেছে কাপড়ে। দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। পেট্রলের ড্রামে আগুন পৌঁছুতে দেরি হবে না। চোখের পলকে গ্রাস করে নেবে পুরো বোটটাকে।

ওপরে উঠে এল মুসা। ফিরে তাকাল একবার। ক্রমেই ছড়াচ্ছে বোটের আগুন। দমকল বাহিনীও আর এখন বাঁচাতে পারবে না ওটাকে। সন্তুষ্ট চিত্তে কেবিনের দিকে হাঁটা দিল সে।

দমকা বাতাসে সামান্য সময়ের জন্যে কুয়াশা কিছুটা পাতলা হলেও আবার ঘন হতে শুরু করেছে। পাঁচ-সাত গজের বেশি আর দৃষ্টি চলছে না এখন। অর্ধেক পথও পেরোয়নি, সামনে থেকে শোনা গেল মানুষের গলা। চট করে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল মুসা।

সামনে দিয়ে দ্রুত চলে যেতে দেখল কারুণের দলটাকে। রীতিমত আতঙ্কিত মনে হচ্ছে। লাতু মিয়া আছে ওদের সঙ্গে। হাতের কোদালটা নেই। ও নিশ্চয় গিয়ে মুসার কথা বলেছে সব। ভয় পেয়ে গিয়ে বোটে কি ঘটছে দেখার জন্যে দৌড় দিয়েছে কারুণ আর তার দলবল। অশোক ওদের সঙ্গে না থাকলে খুশি হতো মুসা। কিন্তু সবকিছু তো আর তার ইচ্ছেমত চলবে না।

কুয়াশার মধ্যে দলটা অদৃশ্য হয়ে গেলে আবার গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে নিজের পথে চলল মুসা। খানিক পরে আবার কথা শোনা গেল পেছনে। দৌড়ে আসছে লোকগুলো। কারুণের দল। বোটটাকে পুড়তে দেখে নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছে। ওকে ধরতে এখন কেবিনের দিকে ছুটেছে।

কাঁধে বিরাট বোঝা। কুয়াশার মধ্যে অজানা পথে চলাও কঠিন। তাড়াহুড়া করতে গিয়ে বিপদ আরও বেড়ে যেতে পারে ভেবে আবার ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল মুসা। কুয়াশায় ভেজা গাছের পাতা ভিজিয়ে দিল সারা শরীর। অস্বস্তিকর অবস্থা। কিন্তু কিছু করার নেই।

সামনে দিয়ে আবার চলে যেতে দেখল তিনজন লোককে। কারুণ আর তার দুই দোস্তের হাতে পিস্তল। ভয়ঙ্কর হয়ে আছে চেহারা। কারণটা বুঝতে অসুবিধে হলো না মুসার। কিন্তু এত তাড়াহুড়া করে কোথায় চলেছে সেটা অনুমান করা কঠিন। বোট পোড়ানোটা কি ঠিক হলো? ভেবে এখন আর কোন লাভ নেই। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল আরেকটা কারণে। অশোক কিংবা লাতু মিয়া নেই

এখন ওদের সঙ্গে। অশোককে খুন করে ফেলল না তো? দুটো করেছে, আরও একটা খুন করতে হাত কাঁপবে না কারুণের মত খুনীর।

ব্যাগটা নিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে বেরোল সে। কাঁধে ফেলে এগিয়ে চলল সাবধানে। শত্রুরা সামনেই কোনখানে রয়েছে। কিন্তু কোন শব্দ নেই। গেল কোথায়? বনের মধ্যে যাবে না। যাওয়ার কোন কারণ নেই। হেলিকপ্টারটা এলে সেটাকে কজা করার বুদ্ধি যদি এঁটে থাকে, লাভ হবে না। কুয়াশা এখনও এত বেশি, আসতে পারবে না চৌহান।

বাকি রইল দুটো সম্ভাবনা। দুই জায়গায় যেতে পারে ডাকাতগুলো। এক, কেবিনে। দুই, ধস নামা জায়গাটায়, গুপ্তধন খুঁজতে। কোদালটা নিশ্চয় ওখানেই ফেলে এসেছে লাতু মিয়া।

ভাবতে ভাবতে কেবিনের একশো গজের মধ্যে চলে এল মুসা। নতুন একটা ভাবনা উদয় হলো মনে। কারুণের দলটা যদি ওখানেই থেকে থাকে, তার কেবিনে প্রবেশ এখন চূড়ান্ত বিপদের কারণ ঘটাতে পারে। তাকে দেখে রেগে গিয়ে কি করে বসবে কারুণ, বলা যায় না। খাবারের ব্যাগটাকে এখন একটা বিরক্তিকর বোঝা মনে হচ্ছে তার কাছে। একবার ভাবল ফেলে দেয়। কিন্তু ফেলে দিলে আর খাবার জোগাড় করতে পারবে না। ফারিঙ্গার বোটটা এখন পানির তলায়। অবশিষ্ট পোড়া খাবারও সেখানে।

কিন্তু কিছু একটা করা দরকার। ব্যাগটা রেখে যেতে পারে। মাটিতে রেখে গেলে শিয়ালে খাবে। বড় একটা গাছের ডালে ঝোলাল ব্যাগটা। পা বাড়াল আবার।

হঠাৎ হিসহিসানী শোনা গেল। চমকে গেল মুসা। থমকে দাঁড়াল। কিসের শব্দ? শিয়ালে তো এমন শব্দ করে না। সাপ হতে পারে। ভয়ানক রাজগোখরো। মারাত্মক বিষাক্ত। আন্দামানের আতঙ্ক। প্রতি বছর গাছ কাটতে জঙ্গলে ঢুকে কত মানুষ যে এই সাপের কামড়ে প্রাণ হারায়। পকেট থেকে পিস্তল বের করল সে। মাটিতে খুঁজতে লাগল সাপটাকে।

কাছেই একটা ঝোপের ডাল নড়ে উঠতে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল সেদিকে। সাপ নয়। ডাল সরিয়ে আস্তে করে বেরিয়ে এল একজন মানুষ। লম্বা। রোগা-পাতলা। চুল-দাড়িতে ভর্তি। মাথায় বাঁধা এক টুকরো রক্তমাখা ছেঁড়া নেকড়া। নোংরা কাপড়ে-চোপড়ে আস্ত একটা পাগল মনে হচ্ছে লোকটাকে।

হাঁ করে তাকিয়ে রইল মুসা।

আস্তে কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল লোকটা। তারপর বলল, 'রবিন তোমাকে এখানে বসে থাকতে বলেছে।'

আরও অবাক হয়ে গেল মুসা। বলে কি লোকটা! কে সে? রবিনের সঙ্গেই বা পরিচয় হলো কিভাবে?

নয়

মুসা কেবিন থেকে বেরিয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল কিশোর আর রবিন। গুলির শব্দের অপেক্ষা করতে লাগল। দুই মিনিট কেটে যাবার পরেও যখন শোনা গেল না শব্দ, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগল দু'জনে।

'ও চলে গেছে,' খুব নিচুস্বরে প্রায় ফিসফিস করে বলল রবিন। 'পার হয়ে গেছে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হুঁ। মিছে কথা বলে আমাদের ভয় দেখিয়ে রেখে গেছিল কারুণ। কিন্তু এই কুয়াশার মধ্যে কতখানি কি করতে পারবে মুসা, জানি না। দেখা যাক।'

আবার নীরবতা। চুপচাপ কাটতে লাগল সময়। এক ঘণ্টা হয়ে গেল। কোথাও কোন শব্দ নেই। উঠে গিয়ে দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিয়ে আবহাওয়ার অবস্থা দেখে এল রবিন। কুয়াশা সামান্য পাতলা হয়েছে বলে মনে হলো তার।

'তাতেই বা কি,' শুনে জবাব দিল কিশোর। 'এখান থেকে এখন কোনমতেই বেরোতে পারছি না আর আমরা। প্রথমে ছিল অশোক, এখন মুসা–ওদের ফেরার অপেক্ষা করতেই হবে। ফিরে এসে আমাদের কাউকে না দেখলে মহা সমস্যায় পড়ে যাবে।'

'মেসেজ লিখে রেখে যেতে পারি আমরা।'

'কি লিখে যাব? কি করব তা-ই তো জানি না। বাইরে বেরোলে এখন যা খুশি ঘটে যেতে পারে। কারুণও ফিরে আসতে পারে। মেসেজের লেখা দেখে তখন জেনে যাবে কোন্‌দিকে গেছি আমরা। উঁহুঁ, তোমার বুদ্ধিটা আমার তেমন পছন্দ হলো না।'

আরও সময় কাটল। আবার গিয়ে আবহাওয়ার অবস্থা দেখে এল রবিন। 'কুয়াশা সত্যিই পাতলা হয়েছে,' জানাল সে। 'শুধু শুধু কেন এখানে বসে থাকব বুঝতে পারছি না।'

'কেন বেরোব, সেটাও বুঝতে পারছি না,' জবাব দিল কিশোর।

'ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডের দিকে গিয়ে দেখা যেতে পারে। হঠাৎ করে যেমন শুরু হয়েছে, হঠাৎ করেই তেমনি শেষ হয়ে যেতে পারে কুয়াশা। আসতে দেরি করবে না তখন চৌহান। ওত পেতে থাকতে পারে কারুণের দল। চৌহানকে বেকায়দা অবস্থায় ফেলে কপ্টারটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করতে পারে। কিংবা ধ্বংস করে দিতে পারে। তখন কি করব?'

'তুমি কি করতে বলো?'

'ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডটা খুঁজে বের করতে পারব আমি। একজনের গিয়ে ওখানে বসে থাকা উচিত আমাদের। চৌহান না এলে ফিরে আসব। আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই অন্ধকার হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে,' কিশোর বলল, 'ঘরে থাকতে না ইচ্ছে করলে যাও। তবে লাভটাভ বিশেষ হবে বলে মনে হয় না। সাবধানে থেকো। কোন অবস্থাতেই কারূণের সামনে যাতে না পড়ো।'

'না, পড়ব না।'

'আমি এখানেই থাকব।'

'আচ্ছা। কুয়াশা থাকুক বা না থাকুক, রাত নামা শুরু হলেই ফিরে আসব আমি। আলো থাকতে থাকতে না এলে এ রকম আবহাওয়ায় রাতে আর আসবে না চৌহান।'

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রবিন। পাল্লা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিল, তারপর বেরিয়ে গেল। দরজাটা নিঃশব্দে লাগিয়ে দিল পেছনে।

একা বসে বসে ভাবতে লাগল কিশোর। একবারই মাত্র নড়ল সে, আগুনটা উসকে দেয়ার জন্যে। ঘটনাগুলো যেভাবে ঘটে যাচ্ছে, মোটেও ভাল লাগছে না তার। কারূণের দ্বীপে ফিরে আসাটাই গোলমাল করে দিয়েছে সব। এ কথাটা ভাবা উচিত ছিল আগেই। ওর কথাটা হিসেবের মধ্যে না রাখাতেই এখন যত বিপত্তি।

মুসা কিংবা রবিনকে নিয়ে ভাবছে না বিশেষ। নিজেদের বাঁচানোর ক্ষমতা আছে ওদের। কিন্তু অশোকের ব্যাপারটাই চিন্তিত করে তুলেছে ওকে। যে কোন সময় ওকে খুন করে বসতে পারে কারূণ। একেবারেই বাধাটাধা না দিয়ে ওকে এ ভাবে কারূণের হাতে ছেড়ে দেয়াটা ঠিক হয়নি মোটেও।

কেবিনের একমাত্র জানালাটার আলো ক্রমেই ফিকে হয়ে আসছে। কমে যাচ্ছে দিনের আলো। এগিয়ে আসছে রাত। মুসা আর রবিনের ফেরার সময় হয়েছে।

বাইরে টিনে লাথি লাগার শব্দ হলো। কে? মুসা বা রবিন এতটা অসাবধান হবে না। যদি তাড়াহুড়া কিংবা খারাপ খবর না থাকে।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। উদ্যত পিস্তল হাতে ঘরে ঢুকল কারূণ। পেছনে তার দুই সহকারী।

'কোথায় ও?' পিস্তল নাচিয়ে গর্জে উঠল কারূণ।

নড়ল না কিশোর। 'কে?'

'কালোমুখো ওই নিগ্রো ছোঁড়াটা,' ভয়ঙ্কর স্বরে বলল জাহাজীদের টুপি পরা লোকটা।

'কেন, কি করেছে ও?' নিরীহ মুখভঙ্গি করে থাকল কিশোর।

'কি করেছে! আমার জাহাজটাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে! শয়তান ছোঁড়া কোথাকার!'

কষ্টে হাসি চাপল কিশোর। এই কাণ্ড করেছে তাহলে মুসা। সেজন্যেই আসতে দেরি করছে। কিছুই যেন বুঝতে পারছে না এমন ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর, 'কিসের বোট? জানতামই না আপনারা বোট নিয়ে এসেছেন।'

'এলাম কিভাবে তাহলে?'

'সেটা আমি কি করে জানব, বলুন? আমি তো আর গণক নই।'

'কোথায় ও?' চিৎকার করে উঠল লোকটা।
'এখানে নেই। আমি ভাবছিলাম আপনাদের সঙ্গে বুঝি দেখা হয়েছে ওর। এখানে লুকিয়ে থাকার যে জায়গা নেই, দেখতেই তো পাচ্ছেন।'
পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল লোকগুলো। কিশোরের গোবেচারা ভঙ্গি দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে ওদের।
'অশোককে কি করেছেন আপনারা?' শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
'ও ভাল আছে,' কঠিন স্বরে জবাব দিল কারুণ।
'থাকলে আপনাদেরও ভাল।'
'আমাদের ভালমন্দের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।'
'দরজাটা লাগিয়ে দিন না। অহেতুক কুয়াশা ঢোকাচ্ছেন।'
দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল কারুণ।
'থ্যাংক ইউ,' বিনয়ের অবতার বনে গেল যেন কিশোর। 'হ্যাঁ, কি যেন বলছিলেন?'
'আমার বোটের কি হবে?' খড়খড় করে উঠল টুপিপরা লোকটা।
'তার আমি কি জানি? আপনার বোটের দায়িত্ব কি আর আমার ওপর ছিল। আরেকটা জোগাড় করে নেবেন।'
'টাকাটা কে দেবে, শুনি?'
'আমি অন্তত দিতে পারব না। এত টাকা সাথে করে নিয়ে আসিনি। অ, আপনাদের বোধহয় একটা কথা জানা নেই, এ দ্বীপটার একজন মালিক আছে। তার বিনা অনুমতিতে এসে থাকলে বেআইনী কাজ করেছেন।'
'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না,' দাঁত বের করে হিসিয়ে উঠল কারুণ।
'ভাবতে হবে। কারণ যে কোন মুহূর্তে এখানে এসে হাজির হতে পারে পুলিশ,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'তাদের কাছে দ্বীপে নামার কৈফিয়ত দিতে হতে পারে আপনাদের।'
'আমরা কি করব না করব সেটা কি তোমার কাছ থেকে শুনতে হবে নাকি?'
'উঁহুঁ, তা হবে না। তবে আপনাদের ভবিষ্যৎটা দেখতে পাচ্ছি তো আমি, তাই বললাম। সময় থাকতে কেটে পড়ার চেষ্টা করুন। যাকগে, বহুত প্যাঁচাল হয়েছে। এ সব ফালতু কথা আর ভাল্লাগছে না আমার।'
টুপিওয়ালার সঙ্গী অন্য স্থানীয় লোকটা বলল, 'বোট ছাড়া কেটে পড়ব কিভাবে?'
'সেটা আপনাদের ভাবনা,' কিশোর বলল। 'আমার পরামর্শ দেয়া দরকার, দিলাম। তবে পুলিশ আপনাকে তীরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। কিন্তু তাহলে তো তীরে নেমে শ্রীঘরেও নিয়ে যেতে চাইবে আপনাদের। ভেবে দেখুন আমার কথাটা।'
পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল আবার তিনজনে।
মুখটাকে যতই স্বাভাবিক করে রাখুক, মনে মনে প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে কিশোর। যে কোন মুহূর্তে ঢুকে পড়তে পারে মুসা। ওকে দেখলে রাগ চরমে উঠবে কারুণের। গুলি করে বসাটা অসম্ভব নয়।

কি যেন ভাবছে কারুণ। আচমকা ঘোষণা করে বসল, 'আমরা এখানেই রাত কাটাব।'

থাকতে চাইবেই সে। জানা কথা। বোট নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকলে এই কুয়াশার মধ্যে বাইরে রাত কাটাতে যাবেই বা কেন? আশঙ্কাটা বাড়তে থাকল কিশোরের। মুসাও বাইরে থাকবে না। কেবিনে ফিরবেই। আসল অঘটনটা ঘটে যাবে তখন।

'আপনাদের স্বাগত জানাতে পারব না আমি, দুঃখিত,' জবাব দিল কিশোর। 'তা ছাড়া এখানে আরামও পাবেন না। খাবার-টাবার কিচ্ছু নেই। আগেই তো সব শেষ করে দিয়ে গেছেন।'

'কে শেষ করেছে!' অবাক হলো কারুণ। 'কেবিনে ঢুকেছি, কিন্তু এখানকার খাবার ছুঁয়েও দেখিনি আমরা। নিজেরাই প্রচুর খাবার নিয়ে এসেছি।'

সত্যিকারের অবাক হলো এতক্ষণে কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'খাবারগুলো তাহলে কে শেষ করল? বাইরে খালি টিনগুলোই বা ছড়িয়ে রাখল কে?'

'খাবার শেষ কে করল, আমি কি করে বলব। বাইরে টিনগুলো আমরাই ফেলেছি। কিন্তু কেবিনের খাবারের টিন নয়। আসার সময় বোট থেকে নিয়ে আসতাম।'

চুপ হয়ে গেল সবাই। কেউ কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না আর। পিস্তলটা পকেটে ভরতে ভরতে কারুণ বলল, 'খবরদার, কোন রকম শয়তানি করার চেষ্টা করবে না।'

'পাগল! তাহলে তো দেবেন বাইরে বের করে, তা কি আর জানি না। এই কুয়াশার মধ্যে বাইরে রাত কাটানোর কোন ইচ্ছেই আমার নেই।'

দরজার দিকে চোখ পড়তে মুখের পেশি শক্ত হয়ে গেল কিশোরের। পাল্লাটা ফাঁক হচ্ছে। এক ইঞ্চি। আরও এক ইঞ্চি।

কে এল? মুসা, না রবিন?

দম বন্ধ করে ফেলল সে।

দশ

ঠিকমতই ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডে পৌঁছেছে রবিন। খুব একটা কঠিন হয়নি আসাটা। তার কারণ, হেলিকপ্টারটা নেমেছিল দ্বীপের নিচু অঞ্চলে। কেবিনটা উঁচু জায়গায়। ওটা থেকে বেরিয়ে দ্বীপের ভেতরের দিকের ঢালটা খুঁজে নিতে যেটুকু সময়, তারপর সোজা হাঁটা দিয়েছে সে। তরতর করে নেমে চলে এসেছে নিচে।

কুয়াশার মধ্যে একটা পাথরের ওপর বসে আছে, হাত পড়ল কাঁধে। ভীষণ চমকে গিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'কে?'

হতবাক হয়ে গেল লোকটাকে দেখে। পাগল-টাগল নাকি! মাথায় বাড়ি মারার জন্যে একটা লাঠি উঁচু করে রেখেছে।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'সেটা জেনে আপনার লাভ?' কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিল রবিন। সে জবাব

লোকটা কারুণের দলের।

'এখানে কি করছ?'

'যা করছি করছি, আপনার কি?'

'আমার কি মানে? আমি দ্বীপটার মালিক।'

দ্বিতীয়বার চমকানোর পালা রবিনের। 'আপনার মানে...' চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার। 'আপনি...'

'মুনিআপ্পা।'

'রজন মুনিআপ্পা?'

'হ্যাঁ।'

'বলেন কি!' কণ্ঠস্বর দুর্বল হয়ে গেল রবিনের। জোর করে হাসি ফোটাল মুখে। 'আমি...আমি তো অবাক হচ্ছিলাম এই রবিনসন ক্রুসোটা কে ভেবে!'

'ক্রুসোই হয়ে গেছি আমি এখন।'

'বেশ, আমি তাহলে আপনার সহকারী ফ্রাইডে। শুধু একজন না, আরও তিন-তিনজন সহকারী পাবেন আপনাকে সহায়তা করার জন্যে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ,' রবিন বলল।

'কয়েকটা লুটেরা ডাকাত আমার দ্বীপটাকে দখল করে বসেছে।'

'জানি।'

'জানো!'

'সব জানি। কিন্তু আমরা জানতাম আপনি মারা গেছেন।'

'আরেকটু হলেই যাচ্ছিলাম। ভাগ্য ভাল, তাই মরতে মরতে বেঁচেছি। কারুণ নামে নরকের শয়তানটা আমাকে খুন করে ফেলেছিল আরেকটু হলেই।'

'ওর কাজই মানুষ খুন করা।'

'চেনো ওকে?'

'চিনি। লাঠিটা নামানো যায় না এবার?'

'অ্যাঁ! হ্যাঁ, তা যায়,' লাঠিটা নামাল রজন। 'আমি তোমাকে কারুণের লোক ভেবেছিলাম। ওর লোক হলে মাথা না ফাটিয়ে ছাড়তাম না আজ। ও একটা খটাশ। ছুঁচো। পেছন থেকে মাথায় বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে আমার বোট থেকেই আমাকে সাগরে ফেলে দেয়। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ছিল বলেই বোধহয় ধাক্কা দিয়ে পানি হুঁশটা ফিরিয়ে এনেছিল আমার। সাঁতরে এসে তীরে উঠলাম। আমাকে দেখে ফেলেছিল কারুণ। গুলিও করেছিল। দৌড়ে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম।'

'তারপর থেকেই আছেন এখানে?'

'যাব কি করে? আমার বোটটা খাঁড়িতে লুকিয়ে রেখেছিল কারুণ। কিন্তু গুলি খাওয়ার ভয়ে আর ওদিক মাড়াইনি।'

'খাবার পেলেন কোথায়?'

'কেবিনে যা ছিল, সেগুলো। আর শিয়ালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঢেউয়ে এসে আটকে পড়া শামুক-গুগলি-ঝিনুক এ সব খেয়ে পেট ভরিয়েছি। কারুণ কি যেন খোঁজাখুঁজি করছিল দ্বীপে। ওই সুযোগে কেবিন থেকে গিয়ে খাবার নিয়ে এসেছি।

কিন্তু কদ্দিন আর চলে। দেখছ না, না খেতে পেয়ে কি অবস্থা হয়েছে আমার।'

'কিন্তু আপনিই তো কারুণকে কেবিন থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছিলেন, এ দ্বীপে ফিরলেন কেন আবার?'

'ও আমাকে আসার জন্যে এমন পীড়াপীড়ি শুরু করল, না এসে পারিনি। জন্মদিনে উপহার পাওয়া একটা সোনার ঘড়ি ফেলে গেছে। ঘড়িটা নাকি দিয়েছিল তার স্বর্গবাসিনী মা। এমন কাকুতি-মিনতি করে বলল, মন গলিয়ে দিয়েছিল আমার।'

'আর আপনি তাকে বিশ্বাস করলেন!'

'না করার কোন কারণ ছিল না তখন।'

আবার কথা বলার আগে একটা মুহূর্ত বিরতি দিল রবিন। তারপর ধীরে সুস্থে জানাল, 'অলঙ্কারের দোকান থেকে বিশ কোটি টাকার মাল লুট করে এখানে এসে উঠেছিল সে। এই দ্বীপেই কোনও একটা শিয়ালের গর্তে লুকানো হয়েছে সেগুলো।'

হাঁ হয়ে গেল রঞ্জন। 'এই তাহলে ব্যাপার! মিথ্যুক কোথাকার। এতক্ষণে সব প্রশ্নের জবাব পেলাম। জিনিসগুলো এখনও গর্তের মধ্যেই আছে?'

'যতদূর জানি আমরা, আছে।'

'আমরা মানে কে কে?'

'মুরিয়া চৌহান, অশোক আর আমরা তিন বন্ধু। আমার সঙ্গে তারাও এসেছে।'

'অশোক! কোন অশোক?'

'আপনি যাকে চেনেন।'

'ওই ছেলেটা সত্যিই ভাল। আমার অবাক লাগছিল, হঠাৎ করে আমার বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেল কেন সে, পালাল কেন।'

'আপনার ভয়ে পালায়নি। কারুণের কাছ থেকে পালাতে চেয়েছিল। ওর ভয় ছিল, কারুণ ওকে খুন করে ফেলবে।'

'খুন! কেন?'

'কারণ জিনিসগুলো সে-ই লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল। আমাদেরকে সব কথা বলেছে। সাহায্য চেয়েছে। মালিকের পক্ষ থেকে ওগুলো উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছিলাম। কিন্তু আমরা এখানে আসার একটু পরেই কারুণ আর তার চ্যালারা অশোককে ধরে নিয়ে গেছে।'

'তাই নাকি! কারুণ তাহলে এখানেই। দারুণ খবর শোনালে।'

রবিনের পাশে আরেকটা পাথরে বসে পড়ল রঞ্জন। 'তোমার বন্ধুরা এখন কোথায়?'

'একজন কেবিনে। তার নাম কিশোর পাশা। আরেকজন মুসা আমান, খাবার আনতে কারুণদের বোটে গিয়েছিল। আমি বেরোনোর আগে পর্যন্ত ফেরেনি। আর আমার নাম রবিন মিলফোর্ড।'

রবিনের হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল রঞ্জন। 'তোমার বন্ধু খাবার আনতে পারবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার।'

'কেন?'

'বোট পাহারার জন্যে একজন লোক আছে।'

'যতই থাকুক, খাবার ছাড়া ফেরত আসবে না মুসা।'

'তুমি কি করবে?'

মুরিয়া চৌহান আসতে পারে, জানাল রবিন। 'কপ্টারটার জন্যে অপেক্ষা করব। না এলে কেবিনে ফিরে যাব।' রজনের দিকে তাকাল সে। 'আপনার কথা বলুন। কারুণ আর অশোককে দ্বীপ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার পরে কি কি ঘটল।'

'অশোকের কাছ থেকে সব শুনেছ, বলার আর তেমন কিছুই নেই,' রজন বলল। 'নিয়ে গিয়ে ওকে আর কারুণকে আমার বাড়িতে তুললাম। এক রাত থাকার পরই পালিয়ে গেল অশোক। এখন বুঝতে পারছি, ও চলে যাওয়াতে এত অস্থির হয়ে উঠেছিল কেন কারুণ। দিন দু'য়েক ওকে খুঁজে বেড়াল সে। আমার তখন ব্যবসার কাজে বাইরে যাওয়াটা জরুরী ছিল। ওকে গিয়ে কৃষ্ণ রারাতুঙ্গার বোর্ডিং হাউসে থাকতে বললাম। ও বলল ওর কাছে এক কানাকড়িও নেই। তাকে কিছু টাকা দিলাম। চলে গেল সে। ভোররাতে ফিরে এসে বলল সোনার ঘড়িটার কথা। ভাবলাম, যেতে-আসতে আর কতক্ষণই বা লাগবে। এতটাই যখন করলাম, বাকিটুকুও করে দিই। ভোরবেলা আলো ফোটার আগেই বেরিয়ে পড়লাম আমার বোটে করে ওকে নিয়ে।'

'হুঁ, এখন বুঝলাম,' মাথা দোলাল রবিন। 'এ কারণেই মানিয়াফুরার কেউ কিছু জানে না আপনাদের এ সব কথা।'

'মনে হয়। কাউকে বলে আসার কথা ভাবিইনি। কেউ দেখেওনি আমাদের।'

'তারমানে আপনাকে মেরে ফেলার ফন্দি করেই বেরিয়েছিল কারুণ।'

'তাই তো। দ্বীপে আসার প্রয়োজন ছিল তার, থাকার প্রয়োজন ছিল, বোট ছাড়া হবে না, তাই আমারটা দখল করার মতলব করেছিল।'

'তারপর নিশ্চয় গুপ্তধন খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে চলে গিয়েছিল। মানিয়াফুরায় থেকেছে কিছুদিন। ওখানে সুবিধে করতে না পেরে মিলারস টাউনে চলে গেছে। সেখান থেকে ওর মত কিছু লোক জোগাড় করে ফিরে এসেছে ভালমত খোঁজার জন্যে।'

'তা-ই হবে। ওকে যেতে দেখিনি আমি। বনের মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম। অসুস্থ অবস্থায়। কারণ মাথার আঘাতটা হজম করা সহজ ছিল না। আমার বোটটা কোথায় রেখেছে ও, জানতাম না। আর জানলেও বেরোতাম না। ওটা নিয়ে পালানোর চেষ্টা করলেই গুলি করে মারত আমাকে। তারপর সে চলে গেল। ফিরে এল আরেকটা মোটর বোট আর লোকজন নিয়ে। আমার বোটটা কি করেছে জানি না।'

'সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে। কারণ মানিয়াফুরায় ওটা নিয়ে গেলেই লোকের কাছে কৈফিয়ত দেয়ার প্রয়োজন পড়বে। মেইনল্যান্ডের কোন নির্জন জায়গায় নেমে আপনার বোটটা সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে। চালক না থাকায় ডুবো পাথরে বাড়ি খেয়ে কিংবা স্রোতের মধ্যে পড়ে ঢেউয়ের আঘাতে উল্টে গেছে ওটা।

মানিয়াফুরার লোকের ধারণা, বোট অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন আপনি। আর এটাই বোঝাতে চেয়েছিল কারুণ।'

দাঁতে দাঁত চাপল রজন। 'কত্তবড় শয়তান!'

'হুঁ। আজ সকালে আমাদের হেলিকপ্টারটা নামতে দেখেননি আপনি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'দেখেছি। দূর থেকে। দ্বীপের আরেক মাথায় ছিলাম তখন আমি। আসতে আসতেই চলে গেল ওটা।'

'আপনার শিয়ালগুলোর কি খবর?'

'খাবার তো পায় না তেমন। কোনমতে টিকে আছে। নিজের প্রাণ বাঁচাতেই অস্থির আমি, আর শিয়াল।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'হুঁ। তা ঠিক।' মুখ তুলে তাকাল কুয়াশার দিকে। সাদা রঙ ধূসর হয়ে আসছে গোধূলির আগমনে। 'আমার মনে হয় যাওয়া উচিত। আর অপেক্ষা করে লাভ নেই।'

'কোথায় যাবে?'

'কেবিনে।'

'চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।'

ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল ওরা। আসার সময় রেখে যাওয়া পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগিয়ে চলল রবিন। কেবিনের কাছ থেকে শ'খানেক গজ দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল। 'আমি আসার পর কি কি ঘটেছে, জানি না কিছুই। কারুণকে বিশ্বাস নেই। মুসা ফিরেছে কিনা, তা-ও জানি না। আপনি এখানে লুকিয়ে থাকুন। আমি গিয়ে দেখে আসি। মুসাকে যদি এ পথে আসতে দেখেন, থামাবেন।'

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলো রজন। 'কারুণকে বিশ্বাস নেই। সাবধান থাকা ভাল।'

'ওদের কাছে পিস্তল আছে। কাজেই কারুণদের দেখলেও সামনে আসবেন না।'

'এখন আমি মরিয়া। এই লাঠিটা আছে। আমার হান্টিং নাইফটাও আছে,' কোমরে ঝোলানো বড় ছুরিটা দেখাল রজন।

'যা-ই থাকুক, তিনটে পিস্তলের কাছে কোন অস্ত্রই না এগুলো। ওদের দেখলেও বেরোবেন না আপনি।'

'ঠিক আছে,' হাসল রজন। 'তবে এখন গুলি করে মারলে তোমাদের অন্তত জানা থাকবে সে আমাকে খুন করেছে। নিখোঁজ করে দিতে পারবে না।'

রজনের হাসির জবাবে হাসি দিয়ে কেবিনের দিকে পা বাড়াল রবিন। সন্দেহে ভরা মন।

এগারো

রবিন যাওয়ার পর ওখানে এসে হাজির হয়েছে মুসা। কথামত তাকে বাধা দিয়েছে

রজন। ওর নাম শুনে রবিনের মতই চমকে গেছে মুসা। খবরটা হজম করতে সময় লেগেছে তার।

রবিন তাকে কি কি করতে বলে গেছে, মুসাকে সব খুলে বলল রজন।

ঠিক এই সময় এসে হাজির হলো রবিন। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'এসেছ! এক মহা ঝামেলায় পড়া গেছে।'

'মানে?' বুঝতে পারল না মুসা।

'কারণ আর তার দোস্তরা গিয়ে কেবিনে ঠাঁই নিয়েছে,' জানাল রবিন। 'কারণের বোটটার বোধহয় কিছু হয়েছে।'

'কি আর হবে। আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছি আমি। বোটটা কারণের না। ফারিঙ্গার। টুপি পরা যে লোকটা তার সঙ্গে কেবিনে ঢুকেছিল, ওর নামই ফারিঙ্গা।'

'কিন্তু ডোবালে যে, এখন তো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতগুলোও দ্বীপে আটকা পড়ল।'

'পড়ার জন্যেই তো পুড়িয়েছি। নইলে মালগুলো বের করে নিয়ে পালিয়ে যেত।'

'কিন্তু তুমি তো গেছিলে খাবার আনতে।'

'তাই তো করেছি। বোট পোড়ানোর বুদ্ধিটা করলাম খাবারগুলো নেয়ার পর। কিশোর সব সময় বলে না, সুযোগ হাতছাড়া করবে না, কাজে লাগাবে। সেটাই তো করেছি। নাকি খারাপ কিছু করলাম?'

'কারণের খবর জানো নাকি?'

'তার দুই দোস্তকে নিয়ে আমার আগে আগে দৌড়ে যেতে দেখলাম। মনে হলো খুবই উদ্বিগ্ন।'

'বোট পুড়িয়ে দিয়েছ, হবেই। ওরা এখন কেবিন দখল করে বসে আছে। অশোকের কি খবর?'

'জানি না। শেষবার দেখা পর্যন্ত ওদের সঙ্গেই ছিল। ও, কিংবা নোয়াখালির লোকটা আর ফেরেনি। তারমানে কোথাও রেখে আসা হয়েছে ওদের।'

'কি করব আমরা তাহলে এখন?' নিজেকেই প্রশ্ন করল রবিন। 'অশোককে খুঁজতে বেরোব, না কেবিনে কিশোরকে সাহায্য করতে যাব? কারণকে বিশ্বাস নেই। দু'জনকেই খুন করতে পারে ও।'

'চিন্তার কথাই,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'একসঙ্গে দুটো সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারব না। আমি কেবিনে যাওয়ার পক্ষপাতী। অশোকের ব্যাপারটা পরে দেখা যাবে।'

'সবার কি একসঙ্গে কেবিনে যাওয়ার দরকার আছে? আমি তো অশোকের খোঁজে যেতে পারি,' রবিন বলল।

'এই অন্ধকারে একা একা দ্বীপে ঘুরে বেড়ানোটা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। পাহাড়ের কিনার থেকে পা ফসকালে ছাতু হয়ে যাওয়া লাগবে। বিষাক্ত সাপের ভয় আছে। খাবারের অভাবে শিয়ালগুলোও পাগলা হয়ে গিয়ে থাকতে পারে।'

কথা বলল রজন, 'এ ভাবে তর্ক করতে থাকলে তো সমস্যার সমাধান হবে না। তোমাদের কাছে পিস্তল আছে?'

'আছে,' মুসা বলল।

'তুমি পিস্তল পেলে কোথায়?' রবিন অবাক।

হাসল মুসা। 'ফারিঙ্গার বোটে।'

'দাও ওটা আমাকে,' হাত বাড়াল রজন।

ভ্রূকুটি করল মুসা, 'কি করবেন?'

'দাও না,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল রজনের কণ্ঠ। 'দিলেই দেখতে পাবে।'

'কিন্তু গোলাগুলি করাটা ঠিক হবে না তো।'

'তোমরা কি করবে জানি না। তবে কারুণের মত ডাকাতের সঙ্গে লাগতে গেলে গোলাগুলি ছাড়া উপায় নেই, এটুকু বোঝা হয়ে গেছে আমার। দুই-দুইবার আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছে সে। এবার খানিকটা খেল আমিও ওকে না দেখিয়ে ছাড়ছি না।'

এতক্ষণ মুসা আর রবিন তর্ক করছিল। নতুন তর্ক জুড়ে দিল রজন। হঠাৎ হাত তুলল মুসা। কান পাতল। 'আস্তে! কে যেন আসছে।'

দ্রুত এগিয়ে আসছে শব্দ। দৌড়ে আসার মত। জোরে জোরে হাঁপানি শোনা গেল। একটু আগে মুসা যেদিক থেকে এসেছে, সেদিক থেকে আসছে শব্দটা। উত্তেজনায় টানটান হয়ে অপেক্ষা করছে ওরা। তাকিয়ে আছে কুয়াশায় ঢাকা ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে। পিস্তল বের করে ফেলেছে মুসা।

অবশেষে কাছে এল লোকটা। অশোক। ওদের দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'পালাও সব! ও আমাকে তেড়ে আসছে।'

'কে?'

'কারুণের লোক। লাতু মিয়া।'

কিন্তু পালানোর সময় পাওয়া গেল না। কাছে চলে এল লাতু মিয়া। ওদের দেখে থমকে দাঁড়াল।

'কাউকে খুঁজছেন নাকি?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'আরে, আমনে ইয়ানে!' চোখ পড়ল মুসার হাতের পিস্তলটার দিকে। 'না না, কিয়া কয়। খুঁজুম কা?'

'ভাল। তাহলে যেদিক থেকে এসেছেন, ফিরে যান। তাতেই ভাল হবে আপনার।'

'কিন্তু আমার মালিক আমারে কাডি ফালাইব যদি হেতেনরে ন লই যাই,' অশোককে দেখাল লাতু মিয়া।

'আর নিয়ে যেতে চাইলে আমি আপনাকে গুলি করব,' শীতল কণ্ঠে হুমকি দিল মুসা। 'কোনটা ভাল মনে করেন?'

'আল্লারে আল্লা, কি বিফদে ফইড়লাম!' দ্বিধা করতে লাগল লাতু মিয়া। শেষে ফিরে যাওয়াটাই সমীচীন মনে করল। 'ঠিক আছে ঠিক আছে, গুল্লি করন লাইগ্‌দ ন। আমি চলি যাইয়ের।'

দ্রুত ঘুরে রওনা হয়ে গেল লাতু মিয়া।

'একটা সমস্যার সমাধান হলো।' অশোকের দিকে ফিরল মুসা। 'পালালে কিভাবে?'

'আমাকে ওই ভাঁড়টার কাছে রেখে চলে গেল কারুণেরা। ও আমাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে পায়খানা করতে গিয়েছিল। এই সুযোগে দড়ি খুলে পালালাম।' রজনের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকাল অশোক। 'আপনাকে চেনা চেনা লাগছে না? কোথায় দেখেছি?'

'ইনি এই দ্বীপের মালিক,' রবিন বলল। 'ওঁকে তো তোমার চেনার কথা। হুঁ, বুঝতে পেরেছি। এতটাই বদলে গেছে উনি, তুমিও চিনতে পারছ না। যাকগে, এখন প্রশ্ন শুরু কোরো না। জবাব দেয়ার সময় নেই। কেবিনে কিশোরের কাছে ফিরে যেতে হবে আমাদের। কারুণের দল কেবিনটা দখল করে নিয়েছে।'

'ওরা বলাবলি করছিল কেবিনে রাত কাটাবে,' অশোক বলল। 'পোড়া মোটর বোটটা দেখে মাথা গরম হয়ে গেছে ওদের। কি করে আগুন লাগল জানো নাকি তোমরা কিছু?'

'মুসা লাগিয়েছে,' রবিন বলল। 'কিন্তু বললাম না, এখন প্রশ্ন করবে না। চলো, সোজা কেবিন।'

'পিস্তলটা দিলে না,' রজন বলল।

'কিন্তু আপনি পিস্তল দিয়ে কি করবেন বুঝতে পারছি না,' ভরসা পাচ্ছে না মুসা।

রেগে গেল রজন। মাটিতে পা ঠুকে বলল, 'এ দ্বীপটা আমার সম্পত্তি। বেআইনীভাবে কিছু লোক আমার দ্বীপে নেমেছে।'

'তো?'

'তো এই, আমার সম্পত্তি আমাকে রক্ষা করতে হবে। আর তার জন্যে অস্ত্র দরকার। দেবে কিনা বলো?'

পিস্তলটা বাড়িয়ে দিল মুসা। 'এই নিন। তবে মানুষ-টানুষ মারবেন না দয়া করে।'

জবাব দিল না রজন। পিস্তলটা চোখের সামনে এনে দেখতে লাগল।

খাবারের কথা মনে পড়ল মুসার। 'ওহ্হো, খাবারগুলো তো ফেলে এসেছি। এত কষ্ট করে আনলাম, ফেলে রেখে যাব নাকি।' রবিনের দিকে তাকাল। 'এক মিনিট দাঁড়াও। আমি যাব আর আসব।'

তাড়াতাড়িই ফিরল মুসা। কাঁধে খাবারের ব্যাগ। অশোকের হাতে দিয়ে বলল, 'তুমি রাখো। আমার অন্য কাজ আছে।' রজনকে বলল, 'এগোন। পিস্তলটা যেহেতু আপনার হাতে, আপনিই আগে আগে যান।'

'যাচ্ছি। তোমাদের কিছুই করতে হবে না,' পিস্তল হাতে নিয়ে যেন বাঘের সাহস পেয়ে গেছে রজন। 'সব আমার ওপর ছেড়ে দাও। দেখো না ব্যাটাদের কি শায়েস্তা করি আমি।'

'আর যা-ই করেন,' অনুরোধ করল রবিন, 'গুলি চালাবেন না। কিশোরকে বিপদে ফেলে দেবেন তাহলে।'

'গোলাগুলি হবে না,' আশ্বস্ত করল রজন। 'কথা না বাড়িয়ে চলো তো।

হাঁটো।'

মুসার দিকে তাকাল রবিন। চোখে উদ্বেগ। রজনের আত্মবিশ্বাসের ছিটেফোঁটাও তার মাঝে সংক্রামিত হলো না। বরং বিপদের গন্ধ পাচ্ছে সে।

কেবিনের কাছাকাছি এসে গতি কমিয়ে দিল ওরা। দরজার কাছে গিয়ে হাত তুলে থামতে ইশারা করল রজন। ভেতর থেকে উত্তপ্ত কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। খুব সাবধানে দরজার গায়ে হাত রাখল সে। আস্তে করে ঠেলা দিয়ে ফাঁক করল এক ইঞ্চি। আচমকা এক ধাক্কায় খুলে ফেলল পুরোটা। উদ্যত পিস্তল হাতে লাফ দিয়ে গিয়ে ঢুকল ঘরের মধ্যে। 'খবরদার! পিস্তল ফেলে দাও!' চিৎকার করে উঠল।

সব ক'জনই দরজার দিকে পেছন করে ছিল, একমাত্র কিশোর ছাড়া। কেউ নড়ল না।

'ফেলো!' আবার চিৎকার করে উঠল রজন। 'দুই সেকেন্ড সময় দিলাম। তারপরই গুলি চালাব।'

কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরে তাকাল কারুণ। এক ঝলক রজনকে দেখল। পিস্তলটা ফেলে দিল মেঝেতে।

'শেষবারের মত বলছি তোমাদেরকে,' অন্য দু'জনকে ধমক দিল রজন। 'জলদি ফেলো।'

আরও দুটো পিস্তল মাটিতে পড়ার শব্দ হলো।

'মুসা, তুলে নাও ওগুলো,' রজন বলল।

ঘরে ঢুকল মুসা। লাথি মেরে প্রথমে সরিয়ে দিল ঘরের প্রান্তে, কারুণ আর তার দুই সঙ্গীর কাছ থেকে দূরে, যাতে ও তোলার সময় সুযোগ বুঝে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে। তারপর তুলে নিয়ে একটা রাখল নিজের হাতে, বাকি দুটো পাচার করে দিল রবিনের কাছে।

রজনের দিকে তাকিয়ে আছে কারুণ। চোখে আগুন ঝরছে। 'তাহলে তুমি।'

'হ্যাঁ, আমি, খুনে জানোয়ার কোথাকার,' দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস শব্দ বেরোল রজনের। 'আর কার কথা ভেবেছিলে? উল্টোপাল্টা আচরণ খালি করে দেখো, মাত্র একটা, সীসা ঢুকিয়ে ঝাঁঝরা করে দেব তোমার নোংরা চামড়াটা।'

সামান্যতম নড়েনি এতক্ষণ কিশোর। 'যাক, সময়মতই এলে তোমরা,' দুই সহকারীকে বলল সে। 'আমার তো দুশ্চিন্তাই হচ্ছিল ভেবে, এত দেরি করছ কেন।' রজনকে দেখাল, 'এই ভদ্রলোকটি কে?'

জবাব দিল রবিন, 'রজন মুনিআপ্পা।'

একটা ভুরু উঁচু হয়ে গেল কিশোরের। 'আপনি বেঁচে আছেন! খুব খুশি হলাম দেখে।'

'এই ইঁদুরগুলোকে এই ঘরের মধ্যে রাখারই ইচ্ছে নাকি তোমার?' পিস্তলের ইঙ্গিতে কারুণ আর দুই সঙ্গীকে দেখাল রজন।

'না। ওরা বেরিয়ে গেলে ঘরের বাতাস অনেক বেশি মধুর হয়ে উঠবে।'

তিন ডাকাতের দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল রজন, 'বেরোও!'

'এ ভাবে রাতের বেলা এই কুয়াশার মধ্যে বের করে দেবেন আমাদের,'

ককিয়ে উঠল টুপি পরা নাবিক, যার নাম ফারিঙ্গা। 'আপনাদের লোকই তো আমাদের বোট পুড়িয়ে দিয়েছে। কোথায় থাকব আমরা?'

'বাইরে যাওয়ার সুযোগ যে দিচ্ছি, এতেই খুশি থাকো। জলদি করো, নইলে মেজাজ বিগড়ে যাবে আমার। পিস্তলের ট্রিগার টেপার জন্যে আঙুল সুড়সুড় করছে।'

'খাব কি আমরা?' কারুণের প্রশ্ন। 'আমাদের কাছে খাবার নেই।'

'একে অন্যকে খেয়ে ফেলোগে না, অসুবিধে কি। আর যদি খেতে না পেয়ে মরে যাও, আমার শিয়ালগুলোর জন্যে ভাল হবে। বহুদিন অভুক্ত রয়েছে ওগুলো। তোমাদের কল্যাণে।'

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন ডাকাত। কিশোরের দিকে তাকাল কারুণ। অশোকের দিকে তাকাল। কিন্তু কারও চোখেই তার জন্যে সামান্যতম করুণা দেখতে পেল না। বাধ্য হয়ে সারি দিয়ে একে একে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

উঠে গিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর। ফিরে তাকাল। 'দারুণ দেখালেন।'

বারো

বাইরে তিন ডাকাতের পদশব্দ মিলিয়ে গেলে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'এখন কি করব?'

'কি করব মানে?'

'মানে এরপর কি কাজ আমাদের?'

'কিছুই না। রাতের বেলা এই অন্ধকারে কুয়াশার মধ্যে একটা ঘর পেয়েছি, আরাম করব। কথা বলব। তোমরা কে কি করলে বলো। মুনিআপ্পাকে কোথায় পেলে? দাঁড়াও দাঁড়াও, কথা শুরু করার আগে, সবচেয়ে জরুরী কথাটা জেনে নিই–খাবার পেয়েছ?'

'পেয়েছি,' হাসিমুখে জানাল মুসা।

'কোথায় ওগুলো?'

'ব্যাগের মধ্যে। অশোক, ব্যাগটা ঠেলে দেবে?'

'দারুণ একটা কাজ করেছ,' কিশোর বলল। 'দেখা যাক, কি কি খাবার আছে। ভেতরটা একেবারে শূন্য হয়ে গেছে আমার। ভরাট করার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে শরীর। খাবার কি ওদের বোটেই পেলে?'

'হ্যাঁ।'

দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না রবিনের। 'এখানে নিশ্চিন্তে থাকতে পারব তো আমরা? ডাকাতগুলো যদি ফিরে আসে আবার?'

'আসবে বলে মনে হয় না,' কিশোর বলল। 'ওদের পিস্তলগুলো তো আমাদের কাছে। খালি হাতে আসতে সাহস পাবে না।'

'যদি অন্য কোনও ফন্দি করে?'

'করেই দেখুক এবার,' রজনের রাগ যায়নি। 'তবে সাবধান থাকা ভাল। দাঁড়াও, দরজার মাঝখানের ওই ডাণ্ডাটা লাগিয়ে দিই। ঝড়ের দিনে বাতাসের ধাক্কায় যাতে খুলে না যায় সেজন্যে ওটা লাগানোর ব্যবস্থা করেছিলাম।' ঘরের কোণ থেকে বড় শক্ত একটা কাঠের ডাণ্ডা তুলে এনে দরজার মাঝখানে দুই পাশের দুটো হুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল সে। 'ওই ছাগলগুলোর মাথায় যদি সামান্যতম ঘিলু থাকে, তাহলে আর এ মুখো হবে না। বনের দিকে চলে গেলেই ভাল করবে, খোলা জায়গার চেয়ে ওখানে ঠাণ্ডা কয়েক ডিগ্রী কম। তবে ওরা মরল কি বাঁচল তাতে কিছু এসে যায় না আমার।'

'কিন্তু আমাদের কি হবে?' রবিনের প্রশ্ন। 'এই কুয়াশা তো আমাদের সর্বনাশ করে দিল।'

'কাল কুয়াশা থাকবে না।'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'এই এলাকায় আমার জন্ম। আবহাওয়ার পরিবর্তন বুঝতে পারি। বলে দিলাম, কাল কুয়াশা থাকবে না, দেখো। ঝকঝকে দিন পাওয়া যাবে।'

'সেইটাই তো চাই,' কিশোর বলল। 'কাজ সারতে পারব তাহলে। মুসা, ব্যাগটা খোলো তো। দেখি কি নিয়ে এসেছ। রাতে পাহারা রাখার দরকার আছে কিনা আমাদের খেতে খেতে আলোচনা করা যাবে।'

টেবিলের ওপর ব্যাগটা খালি করল মুসা। আমন্ত্রণ জানাল সবাইকে, 'এসো, বসে পড়ো।'

'তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব, মুসা, ভাষা পাচ্ছি না,' কিশোর বলল। 'ভাগ্যিস বোটে যাওয়ার বুদ্ধিটা বেরিয়েছিল তোমার মাথা থেকে।'

হেহ্ হেহ্ করে হাসল মুসা। 'খাবার জিনিসটা তাহলে সাংঘাতিক জিনিস, স্বীকার করছ।'

'সাংঘাতিক মানে! সবচেয়ে প্রয়োজনীয়,' বলে ফলের রসের একটা ব্যাগ টেনে নিল কিশোর।

সবাই যার যার মত খাবার টেনে নিতে লাগল।

অশোকের দিকে তাকাল কিশোর। 'আসল কথাটা শুনি এবার। গহনার ব্যাগটা ডাকাতগুলোর হাতে পড়েছে?'

মাথা নাড়ল অশোক। 'না। আমি যতক্ষণ ওদের সঙ্গে ছিলাম, ততক্ষণ অন্তত পড়েনি।'

'কোথায় আছে, জানে ওরা?'

'মোটামুটি ধারণা আছে। ধস নামা জায়গাটা ওদের দেখাতে বাধ্য হয়েছি আমি। কি করব, বলো। বহু চাপাচাপির পরেও বলিনি। শেষে পাহাড়ের ধারে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিতে চাইল।'

'না, আর কিছু করার ছিল না তোমার। সকালে উঠে আগে ওখানে যাব আমরা।' রজনের দিকে তাকাল কিশোর। 'মুনিআপ্পা, মাটি খোঁড়ার জন্যে শাবল-কোদাল কিছু পাওয়া যাবে আপনার ঘরে?'

'পাবে,' মাথা ঝাঁকাল রজন। 'বেলচাও আছে।'

'ওখানে গেলে সম্ভবত একটা কোদালও পাওয়া যাবে,' মুসা বলল। লাতু মিয়াকে কিভাবে কোদাল দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল সে, সেই গল্প বলল। সবাই হাসতে লাগল।

'ধসের কাছেই পড়ে আছে ওটা,' অশোক জানাল। 'আমি থাকতে থাকতেই লাতু মিয়া গিয়ে হাজির হয়েছে। কারুণ তো অবাক। কে পাঠিয়েছে ওকে, শোনার পর মাথা গরম হয়ে গেল তার। বুঝে ফেলল, তোমাদের কারও কাজ। দলবল নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিল বোটের দিকে।'

খাবারগুলো নেয়ার পর বোটটা কিভাবে পুড়িয়েছে কিশোরকে জানাল মুসা।

'বোটটাকে পুড়তে দেখে কি পরিমাণ গালাগাল যে করেছে ওরা তোমাকে, শুনলে কান গরম হয়ে যেত,' অশোক জানাল। 'খেপামিতে পারলে ন্যাংটো হয়ে নাচে। কিন্তু কিছুই আর করার ছিল না তখন। বোটটা পুড়ে শেষ। ও ভাল কথা, বোট পোড়ার সময় প্রচুর ধোঁয়া উঠছিল। আমার মনে হয় ওই ধোঁয়া একটা জাহাজ থেকে দেখেছে।'

'কি করে বুঝলে?'

'দেখেছি। আমাকে তখন লাতু মিয়ার কাছে রেখে চলে গিয়েছিল কারুণেরা। দ্বীপের দিকে এগিয়ে আসছিল ওটা। মাছধরা জাহাজ বলেই মনে হচ্ছিল। কুয়াশার মধ্যে ভাবলাম মনের ভুল। পরে ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসায় বুঝলাম, না, সত্যি আসছে।'

'কারুণরা জানে জাহাজটার কথা?'

'কি জানি।'

'জানলেই বা কি?' মুসার প্রশ্ন।

'জানলে অনেক কিছু,' কিশোর বলল। 'বোট পোড়ার ধোঁয়া দেখে যদি এসে থাকে জাহাজটা, কাছে এলে নিশ্চয় কিছু না কিছু আলামত চোখে পড়বে ওদের। পোড়া বোটের অনেক কিছুই পানিতে ভেসে থাকে। ফিরে গিয়ে মানিয়াফুরায় রিপোর্ট করবে। সঙ্গে রেডিও থাকলে এখান থেকেও যোগাযোগ করতে পারে বন্দরের সঙ্গে। দ্বীপে নেমে খোঁজখবর করতেও আসতে পারে জাহাজের ক্যাপ্টেন। বাই চান্স যদি কারুণের দলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, ওরা ওদের কি বোঝাবে কে জানে।'

খেতে খেতে এ নিয়ে নানা রকম আলোচনা চলল। খাওয়া শেষ হলো। অবশিষ্ট খাবার তাকে তুলে রেখে দিল ওরা।

দরজা খুলে উঁকি দিয়ে বাইরের অবস্থা দেখে এল মুসা। 'কুয়াশা আছে এখনও। তবে বোধহয় মুনিআপ্পার কথাই ঠিক। আবহাওয়া পরিষ্কার হচ্ছে। আকাশে তারা দেখলাম।'

'ওদের কোন চিহ্ন দেখলে না?' জানতে চাইল কিশোর।

'কারুণদের? নাহ্। কোন শব্দও শুনলাম না। অবশ্য, এসেই বা আর কি করবে। পিস্তল-টিস্তল কিছুই নেই ওদের কাছে।'

'ওদের বিশ্বাস নেই, মাথাভরা শয়তানি বুদ্ধি। অসাবধান হওয়া চলবে না।

আবহাওয়া পরিষ্কার হলে ভোরবেলাই চলে আসবে চৌহান। সুতরাং আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা সেকেন্ডও দেরি করা চলবে না আমাদের, একজনকে চলে যেতে হবে ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডে। যে জাহাজটার ধোঁয়া দেখেছে বলছে অশোক, ওটাও মানিয়াফুরায় ফিরে গিয়ে খবর দিতে পারে। আর দিলে অবশ্যই চৌহানের কানে যাবে।'

আরও খানিক আলোচনার পর কিশোর বলল, 'অকারণে ঘুম নষ্ট করে আর লাভ নেই। খুব ভোরবেলা আবার উঠতে হবে। পাহারা দেয়াটা জরুরী। পালা করে করে দেব। ওই শয়তানগুলোকে বিশ্বাস নেই, বললাম না। বলা যায় না, শোধ নেয়ার জন্যে কেবিনে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই যে যেখানে পারল, হেলান দিয়ে বসে কিংবা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। সবার আগে পাহারায় বসল কিশোর। সারাটা দিন যে চেয়ারে বসে কাটিয়েছে, সেটাতেই বসে রইল সে। কোলের ওপর রেখে দিল গুলিভরা একটা পিস্তল।

গড়িয়ে চলল সময়। বাইরে অখণ্ড নীরবতা। তবে মাঝে মাঝে দূর থেকে ভেসে এল শিয়ালের ডাক।

তেরো

ঘটনাটা ঘটার সময় ঘুমিয়ে ছিল কিশোর।

পাহারার পালা ছিল তখন রজনের। সারা রাত বদ্ধ ঘরে থেকে থেকে খোলা বাতাসের জন্যে আইঢাই করে উঠেছিল তার প্রাণটা। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েছিল। আকাশের দিকে চোখ।

ঠিক এই সময় গর্জে উঠল রাইফেল। গুলিটা কোথায় লাগল বলতে পারবে না সে। তবে একটা মুহূর্তও আর দেরি না করে লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকে লাগিয়ে দিল দরজা।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। হাতে উদ্যত পিস্তল। 'কে গুলি করল?'

মুসা আর রবিনও জেগে গেছে।

'আপনি গুলি করেছেন?' রজনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না,' রজন বলল। জানাল পুরো ঘটনাটা।

রেগে গেল কিশোর। 'সাবধান হতে বলেছিলাম সবাইকে।'

'কি করে জানব বাইরে রাইফেল নিয়ে বসে আছে কেউ?'

'তারমানে,' মুসা বলল, 'যে-ই এখন দরজা খুলে বেরোতে যাব, গুলি খাব।'

'ঘরের মধ্যে আমাদের আটকে ফেলার ব্যবস্থা করেছে,' রবিন বলল। 'আমরা বেরোতে পারব না। এই সুযোগে গুপ্তধন খোঁজা চালিয়ে যাবে ওরা।'

'কিন্তু সারাদিন ঘরে আটকে থাকা তো যাবে না,' রজন বলল। 'চৌহান এলে কি হবে?'

'তাড়াহুড়া করে হবে না,' কিশোর বলল। 'ভালমত ভেবে দেখা যাক। প্রথম প্রশ্ন, রাইফেল ওরা পেল কোথায়? ওদের কারও কাছেই ছিল না। থাকলে দেখতাম।'

'মোটর বোটে ছিল হয়তো,' রবিন বলল।

'ছিল না,' মুসা বলল। 'তাহলে আমার চোখে পড়ত। পিস্তলটা ছিল, তা-ই দেখে ফেললাম। আর যদি কোন জায়গায় লুকানো থাকেও কিছু, ওগুলো এখন সাগরের তলায়।'

'আগেই যদি হাতে নিয়ে নেমে থাকে ওরা?'

'তাহলেও দেখতাম। ওদেরকে ধসের কাছ থেকে ফিরতেও দেখেছি আমি, যেতেও দেখেছি। হাতে রাইফেল ছিল না। ছিল পিস্তল।'

'তাহলে পেল কোথায়?'

'সেটাই তো আমার প্রশ্ন,' কিশোর বলল। 'তবে পেয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং তাতে আমাদের গুপ্তধন খোঁজা শতগুণ কঠিন করে তুলেছে।'

'কিন্তু আমাদেরকে এখানে আটকে রাখতে পারলে লাভটা কি ওদের?' মুসার প্রশ্ন।

'ওই যে বললাম, নির্বিঘ্নে গুপ্তধন খুঁজতে পারবে।'

'কিন্তু গুপ্তধন খোঁজা আর কেবিন পাহারা দেয়া একসঙ্গে দুটো কাজ কি করে করবে?'

'আমাদের দরজা আটকানোর জন্যে একজন লোকই যথেষ্ট,' জবাব দিল কিশোর। 'বাকি সবাই চলে যাবে ধসের কাছে গুপ্তধন খুঁজতে।'

'মাত্র একজন?' রজন বলল। 'তাহলে তো তাকে কাবু করে ফেলা যায়।'

'কিভাবে?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'দরজাই তো খুলতে পারবেন না, গুলি শুরু করে দেবে।'

'কিন্তু এই ঝলমলে দিনে ঘরের মধ্যে আটকে বসে থাকতেও রাজি নই আমি,' রজন বলল।

'দাঁড়ান, ভাবতে দিন,' দুই হাতে কপাল টিপে ধরল কিশোর। তারপর হাতটা সরিয়ে এনে নিচের ঠোঁটে ঘনঘন চিমটি কাটল কয়েকবার। 'অকারণ ঝুঁকি নিতে গিয়ে গুলি খাওয়ার কোন মানে হয় না।' দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল একটা মুহূর্ত। তারপর উঠে গিয়ে দাঁড়াল দরজার কাছে। গুলির ফুটোটা খুঁজল। অনেক খুঁজেও পেল না ওটা। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পেছনের দেয়ালে লাগতে পারে। কিন্তু সেদিকটাতেও গুলি লাগার কোন চিহ্ন নেই। অবাক লাগল তার। ফিরে তাকাল রজনের দিকে। 'আপনাকেই গুলি করেছে তো?'

'বেরিয়েছি আমি। আমাকে ছাড়া আর কাকে করবে?'

'গুলিটা কতখানি দূর থেকে করেছে আন্দাজ করতে পারেন?'

'আট-দশ গজ হবে।'

'তারমানে আট-দশ গজ দূরে কোথাও লুকিয়ে আছে সে। অতখানি দূরে দরজা বরাবর ছোট একটা ঝোপ দেখেছি কেবল। আর তো কিছু নেই।'

'ঠিক। ওখানেই লুকিয়ে আছে। কতবার যে ভেবেছি ওটা সাফ করে ফেলব,

করা আর হয়নি। করে ফেললে এখন আর এই বিপদের মধ্যে পড়া লাগত না।'

'হ্যাঁ, ওখানেই ঘাপটি মেরে আছে লোকটা,' চিন্তিত ভঙ্গিতে দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। 'প্রথমবার এই কেবিন পাহারা দেবে যে শাসিয়ে গিয়েছিল কারণ, সেটা কার্যকর করেছে এবার।'

'তা তো বুঝলাম,' মুসা বলল। 'কিন্তু ওকে সরানোর ব্যবস্থা কি? দরজা খুলে দেখব নাকি আবার গুলি করে কিনা?'

'পাগল নাকি! পরীক্ষা করতে গিয়ে মরার ঝুঁকি নিতে যাবে। আমি ভাবছি, কাকে বসিয়ে রেখে গেল? কারণ থাকবে না কোনমতেই, সে চলে যাবে ব্যাগ খুঁজতে। ব্যাগটা পাওয়ার সময় কাছে কাছে থাকতে চাইবে।'

'তার দুই সহকারীর কেউ হতে পারে,' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'লোকটাকে ঠেকানো যায় কিভাবে?'

'এক কাজ করা যেতে পারে,' রজন বলল। 'দরজা খুলে বেরিয়ে দৌড় দিতে পারি। তোমরা তখন ঝোপ লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকবে। এই সুযোগে আমি পৌঁছে যাব ঝোপের কাছে। পিস্তলের মুখে বের করে আনব লোকটাকে।'

'রিস্কি হয়ে যাবে।'

'এ ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছি না। তবে দরজা খুলে এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাব, বন্দুক তোলারও সময় পাবে না সে।'

'সত্যি পারবেন?'

'পারব।'

'যদি পারেন, আমরা আপনাকে সাপোর্ট দিতে পারব। এমন গুলি শুরু করব, মাথা তুলতে দেব না ব্যাটাকে। ঝোপ থেকে বেরোতে বাধ্য করব।' জানালার দিকে তাকাল কিশোর। ধূসর আলো জানান দিচ্ছে দিনের আগমন। 'যা করার এখনই করতে হবে। চৌহান চলে আসার আগেই।'

'ঠিক আছে। পজিশন নাও তোমরা। আমি দরজা খুলতে যাচ্ছি,' রজন বলল।

'এখনও ভেবে দেখুন,' সাবধান করল কিশোর। 'মারাত্মক এক খেলা খেলতে যাচ্ছেন।'

'দেখেছি।'

'আমাদের গুলির লাইনের বাইরে থাকবেন। আপনি সামনে বাধা হয়ে গেলে আমরা তখন গুলি চালাতে পারব না।'

'বুঝতে পেরেছি।'

পিস্তল হাতে পজিশন নিল তিন গোয়েন্দা। দরজার পাশে এমন করে দাঁড়াল মুসা যাতে তাকে দেখা না যায়, অথচ সহজেই ডান হাতটা বের করতে পারে। রবিন গেল আরেক পাশে। কিশোর দরজা বরাবর মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। অশোক দরজার কাছ থেকে সরে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকল মেঝেতে।

'আমরা রেডি,' রজনকে জানাল সে। 'পিস্তল হাতে ছুটতে থাকবেন। গুলি করার চেষ্টা করবেন না। আমাদের পিস্তলের সামনে থেকে দূরে থাকবেন। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

শিয়ালের ক্ষিপ্রতা দেখাল রজন। এক ঝটকায় দরজা খুলে বাইরে লাফিয়ে পড়ল। একপাশে সরে গিয়ে ঘুরপথে ছুটল ঝোপটার দিকে। গুলি চালানো শুরু করল তিন গোয়েন্দা। বদ্ধ ঘরে বিকট শব্দ হতে লাগল। বাতাসে করডাইটের মিষ্টি ঝাঁঝাল গন্ধ। গুলির শব্দের মাঝেই কানে এল ভীত আর্তচিৎকার, 'বাউরে! মারি ফালাইল!'

হুড়মুড় করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল লোকটা।

'থামো!' গুলি বন্ধ করার আদেশ দিল কিশোর। দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল।

পাশে এসে দাঁড়াল দুই সহকারী গোয়েন্দা।

অবাক চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করল মুসা, 'লাতু মিয়া!'

'যেতে দাও,' ভেতরে আর কেউ আছে কিনা দেখার জন্যে ঝোপের দিকে পা বাড়াল কিশোর। দেখার পর বলল, 'ওই শয়তানগুলো নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে ব্যবহার করেছে এই বোকা লোকটাকে। গুলি খেয়ে যদি মরে, ও মরবে, ওদের কি?' ঝোপ থেকে একটা অটোমেটিক রাইফেল বের করে আনল সে।

'ওকে রেখে যাওয়াতেই বেঁচে গেছে মুনিআপ্পা,' মুসা বলল। 'ট্রিগার টেপা ছাড়া আর বোধহয় কিছুই করতে জানে না লাতু মিয়া। সেজন্যেই গুলির ফুটো পাওয়া যায়নি। নিশানা এতই খারাপ ওর, এতবড় একটা ঘরকেও সই করতে পারেনি।'

হাসল সে। রবিনও হাসল। কিন্তু কিশোর হাসল না। চিন্তিত ভঙ্গিতে রাইফেলটার দিকে তাকিয়ে থেকে নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'এটা পেল কোথায় ওরা?'

'জিনিসটা কিন্তু নতুন না,' মুসা বলল। 'ব্যবহার করা।'

ম্যাগাজিন খুলে দেখল কিশোর। ছয়টা গুলির মাত্র একটা খরচ হয়েছে। শূন্য খোসাটা টান দিয়ে ফেলে দিল মাটিতে। নতুন আরেকটা গুলি নিয়ে এল ব্রীচে। যাতে প্রয়োজন পড়লে গুলি করতে পারে। 'এটা দিয়ে পাগলা শিয়াল মারতে পারবেন,' রাইফেলটা রজনের হাতে তুলে দিল সে।

দূর থেকে ভেসে এল হেলিকপ্টারের শব্দ।

'ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডে যাচ্ছি আমি,' বলেই দৌড় দিল রবিন।

'দাঁড়াও!' ডাকল কিশোর। 'কেবিনের দিকে আসছে মনে হচ্ছে।'

বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে লাতু মিয়া। ফিরেও তাকাল না ওরা কেউ। গাছের মাথার ওপর দেখা দিল কপ্টারটা। কাছে এল। নামতে শুরু করল। তবে কিছুটা নেমেই থেমে গেল। ককপিট থেকে বেরিয়ে এল একটা হাত। রুমালের মত কিছু নাড়ছে। দৌড়ে গিয়ে তুলে নিয়ে এল রবিন। রুমালে বাঁধা একটা কাগজ। তাতে লেখা: সাবধান। কারুণ আর তার সঙ্গীদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। আমি আগের জায়গাতেই নামতে যাচ্ছি।

ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'অস্ত্র কোথায় পেল কারুণ? আর সেটা চৌহান জানল

কিভাবে? কারুণ যে এখানে আছে সেটাই বা জানল কি করে?'

'রাইফেল রহস্যের সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ নেই তো?' রবিন বলল, 'আমাদের সঙ্গে দেখা করার সময় রাইফেল ছিল না ওদের কাছে। নাকি অন্য কোনখানে রেখে দিয়েছিল, পরে বের করেছে?'

'মনে হয় না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'এগুলোর একটাই জবাব–ওই মাছধরা জাহাজটা।'

'ওদের কাছে রাইফেল ছিল হয়তো, সেটা কিনে নিয়েছে কারুণ,' মুসা বলল।

'কিন্তু এ ধরনের মাছধরা নৌকা রাইফেল বহন করতে যাবে কেন? ওরা তো মাছ ধরে জাল দিয়ে, গুলি করে নয়। আর পানিতে রাইফেলের দরকার কি?'

'কি জানি বাপু!' হাত নাড়ল মুসা। 'মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে আমার।'

'চৌহান কিভাবে কারুণের কথা জেনেছে, সেটা অনুমান করতে পারছি,' কিশোর বলল। 'মাছধরা জাহাজটা মানিয়াফুরায় গিয়ে খবরটা ছড়িয়েছে। চৌহানেরও কানে গেছে। এ ছাড়া আর কোন ব্যাখ্যা নেই।'

'তা-ই হবে।'

'কিংবা আরেকটা ঘটনা ঘটতে পারে,' রবিন বলল। 'মাছধরা জাহাজটাতে করে কারুণেরা মানিয়াফুরায় চলে গিয়েছিল। ওখান থেকে অস্ত্র জোগাড় করে আবার ফিরে এসেছে।'

'কিন্তু ফিরল কিভাবে?'

'জানি না।'

'অনুমান করে করে অত মগজ খাটানোর দরকারও নেই। চৌহানের কাছ থেকেই জানতে পারব। রবিন, ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডে চলে যাও।'

'তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে কোথায়?'

'ধসের কাছে যাচ্ছি আমরা। লাতু মিয়া ওদিকেই দৌড় দিয়েছে। কারুণরাও নিশ্চয় ওদিকেই আছে।'

'চৌহানকে নেব আমার সঙ্গে?'

'সেই ভার ওর ওপরই ছেড়ে দিয়ো। ভাল মনে করলে যাবে। তবে পজিশনটা জানিয়ো ওকে।'

'ঠিক আছে।' দৌড়াতে শুরু করল রবিন।

'চলুন,' রজনের দিকে তাকাল কিশোর। 'ডাকাতগুলোকে কোনমতেই পালাতে দেয়া যাবে না।'

ধসের দিকে রওনা হলো ওরা চারজনে। বেশি দূরে যেতে হবে না ওদের।

রজনের আবহাওয়ার ভবিষ্যৎ বাণী একেবারে সঠিক। কুয়াশার যা-ও বা একটু ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট রয়েছে তাড়িয়ে দিয়ে সাগর থেকে মেঘমুক্ত আকাশে চড়ছে সূর্য। কোন কোন গাছের মাথায় অতি হালকা রেশমী কাপড়ের মত ঝুলে রয়েছে এখনও দু'চার টুকরো কুয়াশা।

চোদ্দ

ধসের দিকে কোনাকুনি এগিয়ে চলেছে দলটা। পাহাড়ের ওপর দিয়ে গেলে সোজা হয়। সহজ পথও এটাই। জায়গাটা বেশ খোলামেলাও। দ্বীপঘেরা পাহাড়ের বেশির ভাগ জায়গাতেই জঙ্গল। কিন্তু ঝড়ের আঘাত এদিকটাতেই সবচেয়ে বেশি লাগে বলে গাছপালা ঝোপঝাড় কোন কিছুই বড় হতে পারে না।

অর্ধেক পথ এসে থমকে দাঁড়াল কিশোর। পাহাড়টা যেখানে ঢালু হয়ে নেমে গেছে, একটা খাঁড়িমত ঢুকে গেছে দ্বীপের ভেতরে, সেখানে একটা প্রাকৃতিক বন্দরে নোঙর ফেলেছে একটা ছোট মাছধরা জাহাজ।

মুসার দিকে তাকাল সে, 'কি বুঝলে?'

'আর কি। আমাদের প্রশ্নের জবাব।'

'হ্যাঁ, তবে সব প্রশ্নের নয়। দেখো, ডেকে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ওই জাহাজের নাবিকগুলোও নিশ্চয় এতটা পাগল হয়নি যে কারুণের সঙ্গে যোগ দেবে। অন্য কিছু ঘটেছে। চলো, গেলেই বোঝা যাবে।'

আরও শ'খানেক গজ পেরোনোর পর সামনে পাথরের একটা গোল স্তূপমত পাওয়া গেল। সেটা ঘুরে অন্যপাশে আসতেই ধসটা চোখে পড়ল। উল্লসিত চিৎকার-চেঁচামেচি শোনা গেল ওখান থেকে। কিছু একটা ঘটেছে।

দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। পেছনে বাকি সবাইও দাঁড়িয়ে গেল। ধসের জঞ্জাল আর খোঁড়া মাটির কাছে দাঁড়িয়ে আছে কারুণ। হাতে একটা ক্যানভাসের ব্যাগ।

'ওটাই তো,' গুঙিয়ে উঠল অশোক। 'জিনিসগুলো পেয়ে গেছে ওরা।'

কারও মুখে কথা নেই। সবাই তাকিয়ে আছে চুপচাপ। কারুণের কাছে দাঁড়ানো তার দুই সহকারী। খানিক দূরে লাতু মিয়াকে দেখা গেল, ভয়ে জড়সড় হয়ে আছে। তার দায়িত্ব ঠিকমত পালন না করে পালিয়েছে বলেই বোধহয়।

হঠাৎ করেই ঘটতে শুরু করল নাটকীয় ঘটনা। ক্লাইম্যাক্সে চলে যেতে লাগল নাটক। শুরুটা হলো বেচারা লাতু মিয়াকে দিয়ে।

তার ওপর চোখ পড়তেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল কারুণ। চিৎকার করে কিছু বলল। এতদূর থেকে কথা বোঝা গেল না, তবে অনুমান করা গেল জায়গা ছেড়ে চলে আসায় তাকে ধমকাচ্ছে কারুণ। পিছিয়ে যেতে শুরু করল লাতু। পালাতে চাইছে মনে হয়। আচমকা ঘুরে দিল দৌড়। পকেট থেকে পিস্তল বের করে ট্রিগার টিপে দিল কারুণ। যেন হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল লাতু। গড়াতে গড়াতে ঢাল বেয়ে নেমে একটা পাথরে আটকে গেল তার দেহ। আর নড়ল না।

চোখের সামনে এ রকম একটা ঘটনা ঘটতে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল গোয়েন্দারা। একটা মুহূর্ত। পরক্ষণেই 'খুনে শয়তান কোথাকার!' বলে গাল দিয়ে হাতের রাইফেলটা নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রজন। নিশানা করতে গেল কারুণকে।

বাধা দিল কিশোর, 'কি করছেন? থামুন, থামুন।'

'কিভাবে লোকটাকে গুলি করে মেরে ফেলল দেখলে!'

'দেখলাম। কিন্তু আপনি ওকে গুলি করতে গেলে তো আপনিও ওরই মত হয়ে গেলেন। নিজের হাতে আইন তুলে নেবেন না।'

রজন নিরস্ত হলেও কারুণের বিরুদ্ধে যাবার লোকের অভাব হলো না। রুখে উঠল তার দুই সঙ্গী। প্রচণ্ড তর্কাতর্কি চলেছে দূর থেকেও বোঝা গেল। বেশি রেগে গেছে ফারিঙ্গা। লাতু তার কর্মচারী ছিল। এক কথা, দু'কথা। কারুণ কিছু বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎ পকেট থেকে পিস্তল বের করে কারুণের বুকে ঠেকিয়ে গুলি করে বসল ফারিঙ্গা। কারুণের হাত থেকে ব্যাগ খসে পড়ল। কাত হয়ে ঢলে পড়ল সে। ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে গিয়ে একটা গাছে আটকে গেল।

'খাইছে!' চোখের সামনে দু'দুটো খুন হয়ে যেতে দেখে কণ্ঠস্বর খসখসে হয়ে গেছে মুসার। 'নিজেরা নিজেরাই তো সেরে ফেলছে সব।'

'কোনখান থেকে অস্ত্র পেয়েছে ওরা,' কিশোর বলল। 'সুযোগ বুঝে একে অন্যকে সরিয়ে দিচ্ছে এখন, গুপ্তধনের ভাগীদার কমানোর জন্যে।'

'ভালই তো,' রজন বলল। 'পৃথিবী থেকে দু'চারটে শয়তান কমছে।'

'আমি ভাবছি জাহাজটার কথা,' রজনের কথা কানে যায়নি যেন কিশোরের। 'ফারিঙ্গারা ওটাতে উঠে পড়লে আর ধরা যাবে না।'

'দেব নাকি খোঁড়া করে?' রাইফেলের গায়ে থাবা দিল রজন।

'দেখা যাক। তেমন বুঝলে তখন বলব। তবে আগে ভালভাবে চেষ্টা করে দেখি।'

নতুন মোড় নিল নাটক। ফিরে তাকিয়ে কিশোরদের দেখে ফেলল ফারিঙ্গার সহকারী। ফারিঙ্গার বাহুতে হাত রেখে দৃষ্টি আকর্ষণ করাল সে। নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি নিয়ে ব্যস্ত না থাকলে আরও আগেই দেখে ফেলত গোয়েন্দাদের।

'চলুন, এগোনো যাক,' কিশোর বলল।

চিৎকার করে উঠল ফারিঙ্গা, 'খবরদার, এক পা এগোবে না আর। গুলি খাবে!'

হুমকিতে কান দিল না কিশোর। এগিয়ে চলল। পিছে পিছে চলল মুসা, রজন ও অশোক।

'কি বললাম শোনোনি!' আবার চিৎকার করে বলল ফারিঙ্গা। মাটিতে পড়ে থাকা ক্যানভাসের ব্যাগটা তুলে নিল সে।

'পিস্তল ফেলে দিন,' চিৎকার করে হুকুম দিল কিশোর।

লোকগুলো বুঝতে পারল হুমকিতে কাজ হবে না। সঙ্গী লোকটাকে কি যেন বলল ফারিঙ্গা। ঘুরে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সাগরের দিকে দৌড় দিল সে। ব্যাগ আর পিস্তল হাতে ফারিঙ্গাও ছুটল তার পেছনে।

'জাহাজে উঠে পড়লে আর ধরতে পারব না,' বলে কিশোরও কোনাকুনি দৌড় দিল জাহাজের দিকে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি করল ফারিঙ্গার সহকারী। কিন্তু পিস্তলের জন্যে রেঞ্জ অনেক বেশি। লাগাতে তো পারলই না, নিশানার কাছেও আনতে পারল না। কিশোরদের সামনে একটা পাথরে লেগে চলটা তুলল বুলেট।

'আমাদের কেউ জখম হওয়ার আগেই দিই ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করে,' কিশোরের অনুমতি চাইল রজন।

দ্বিধা করতে লাগল কিশোর। আর বোধহয় গুলি করা ছাড়া গতি নেই। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। তারপর বলল, 'দেখি, আরেকটু সুযোগ দিই।'

হুমকি দিল কিশোর। ফাঁকা গুলি ছুঁড়ল দু'বার। জবাবে ফারিঙ্গারাও গুলি করতে করতে ছুটল।

'ধ্যাত্তোরিকা! আর তোমার কথা শুনছি না আমি!' বলে রাইফেল তুলল রজন।

গুলি করার আগেই নতুন ঘটনা ঘটল। থমকে দাঁড়াল দুই ডাকাত। সামনের গাছের আড়াল থেকে তিনজন লোককে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। চৌহান, রবিন আর নাবিকের পোশাক পরা একজন লোক। চৌহানের হাতে রাইফেল। রবিনের হাতে পিস্তল।

রাইফেল তাক করে হাঁক দিল চৌহান, 'পিস্তল ফেলো! জলদি!'

বেকায়দায় পড়ে গেল দুই ডাকাত। সামনেও শত্রু, পেছনেও শত্রু। নিজেদের মধ্যে দ্রুত কি যেন আলোচনা করল দু'জনে। পালাতে পারবে না বুঝে গেছে। পিস্তল আর গহনার ব্যাগটা ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দুই হাত তুলল মাথার ওপর।

একটা গুলিও করতে না পারায় হতাশই মনে হলো রজনকে। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে রাইফেল নামাল সে।

এগিয়ে এল চৌহানের দল। কিশোররাও এগোল। একসঙ্গে ডাকাতগুলোর কাছে পৌঁছাল দুটো দল।

ফারিঙ্গা বলল, 'আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন কেন? কি করেছি আমরা?'

'সেটা পুলিশকে গিয়ে জিজ্ঞেস কোরো।' পাশে দাঁড়ানো নাবিকের পোশাক পরা লোকটাকে দেখাল চৌহান, 'এই ভদ্রলোকের বোট চুরি করেছ কেন?'

ফারিঙ্গা জবাব দিল, 'আমরা চুরি করিনি। কারুণ করেছিল।'

'তোমরা তো তার সাথেই ছিলে। তোমাদের উদ্দেশ্য যদি এতই মহৎ হবে, বাধা দাওনি কেন?' চারপাশে তাকাল চৌহান। 'কারুণ কোথায়?'

'মরে গেছে,' কিশোর বলল।

'মরে গেছে!'

ফারিঙ্গাকে দেখাল কিশোর। 'এই লোক গুলি করেছে ওকে। আমরা সবাই সাক্ষী।'

'আর কি করতে পারতাম?' কৈফিয়ত দিল লোকটা। 'কি ঘটেছে নিশ্চয়ই দেখেছ তোমরা। আমি না করলে আমাকে গুলি করত। আমার বাবুর্চিকেও মেরে ফেলেছে।'

কিশোরের দিকে তাকাল চৌহান। 'কি বলছে ও?'

'ঠিকই বলছে। ওরা কি নিয়ে তর্ক করছিল, আমরা শুনিনি। তবে গুলি করতে দেখেছি। ওই পাহাড়ের ওদিকটায়, ঢালের মধ্যে পড়ে আছে দু'জন লোক।

এখনও বেঁচে আছে কিনা কে জানে।'

'চলো তো দেখি।' পড়ে থাকা পিস্তল দুটো তুলতে গিয়ে ব্যাগটার ওপর চোখ পড়ল চৌহানের। 'এটাই সেই গহনার ব্যাগ নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ।'

ব্যাগটাও তুলে নিয়ে মুসার হাতে দিল চৌহান।

ঢালে পৌঁছে প্রথমে কারুণের লাশটা পরীক্ষা করল ওরা। মরে গেছে। তারপর খুঁজতে লাগল লাতু মিয়াকে।

'আশ্চর্য!' কিশোর বলল। 'এখানেই তো ছিল! গেল কোথায়?'

যে পাথরটায় আটকে গিয়েছিল লাতু, সেটার চারপাশে তন্নতন্ন করে খুঁজেও তাকে পাওয়া গেল না।

মুসার কানে বাজতে থাকল: রান্দুনি গরে চাঁ-ফাতা আছে। বানাই খাইয়েন। বিস্কুটঅ আছে। চাঁ দি বিজাই খাইয়েন।

আফসোস করে বলল মুসা, 'শিয়ালে নিয়ে গেছে। বেচারা! ওই লোকটার কিন্তু কোন দোষ ছিল না। কারণ ওকে বাধ্য করেছিল আমাদের ওপর গুলি চালাতে।'

'আমনে ঠিক কইছেন, বাই,' ঝোপের ভেতর থেকে কথা শোনা গেল। আস্তে করে ডাল সরিয়ে বেরিয়ে এল লাতু মিয়া। 'বন্দুকআন আমার হাতে দরাই দি কয় গুল্লি কইরবি, নইলে মারি ফালামু…'

'আপনি মরেননি?'

'না, মরি ন। ভেঙচি ধরি ফড়ি আছিলাম। দৌড় দিতে যাই উল্ডুস খাই ফড়ি গেলাম। গুল্লি লাগে ন আমার শরীলে। রাখে আল্লা মারে কে।' পাশে পড়ে থাকা টুপিটা তুলে নিয়ে মাথায় বসাল সে। 'ডাকাইতগুন আমি মরি গেছি মনে করি চলি গেলে তাড়াতাড়ি উডি যাই জঙ্গলে ডুকি হলাই থাইকলাম। আমার কুনো দোষ নাই, বাই।'

একটা মুহূর্ত হতবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল সবাই। হাসিটা শুরু করল প্রথমে মুসা। সংক্রামিত হলো সেটা সবার মাঝে।

চৌহানের দিকে তাকাল কিশোর। 'দল তো বিরাট। যাব কিভাবে সবাই?'

'জাহাজে করে।' দুই ডাকাতকে দেখাল চৌহান, 'এদের দায়িত্ব এখন আমাদেরই নিতে হবে। পুলিশের হাতে তুলে না দেয়া পর্যন্ত। আমি যাচ্ছি জাহাজে। তোমাদের কেউ কপ্টারটাকে ওড়াতে পারবে?'

'পারব,' মুসা বলল। 'এ জিনিস আগেও উড়িয়েছি।'

'ভাল। তাহলে তুমি ওটা নিয়ে এসো। বাকি সবাই জাহাজে করে যাচ্ছি আমরা। যদি মনে করো মুনিআপ্পাকেও নিয়ে যেতে পারো তোমার সঙ্গে। গহনার ব্যাগটাও নিয়ে যাও।'

'ঠিক আছে।'

'আমাদের নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না আপনাদের,' ফারিঙ্গা বলল। 'কোনো রকম গণ্ডগোল করব না আমরা। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না। আমার বোটটাকে পুড়িয়ে দেয়া হলো কেন? কত টাকা গেল আমার কল্পনা করতে

পারছেন?'

'পারছি,' কাটা কাটা স্বরে জবাব দিল চৌহান। 'মানিয়াফুরায় গিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ করবেন।'

গহনার ব্যাগটা তুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল মুসা। পেছন পেছন চলল রজন। বাকি সবাই দল বেঁধে হাঁটতে শুরু করল জাহাজের দিকে।

কেবিনটা চোখে পড়লে রজনকে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'দরজাটা খোলা। লাগিয়ে দিয়ে আসবেন নাকি?'

'না। জাহান্নামে যাক কেবিন। দ্বীপটা এখন আমার জন্যে একটা দুঃস্বপ্ন। যা ভোগা ভুগেছি, কোনদিন আর এখানে পা রাখতে চাই না আমি। চুলোয় যাক শুঁটকির ব্যবসা। শিয়ালগুলোর একটা ব্যবস্থা অবশ্য করা দরকার। কি করব, পরে ভাবব।'

ঠিক পনেরো মিনিটের মাথায় মানিয়াফুরার ল্যান্ডিং স্ট্রিপে হেলিকপ্টার নামাল মুসা।

একটু পরে জাহাজ নিয়ে বাকি দলটাও পৌঁছে গেল। রেডিওতে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করল চৌহান। ওরা না আসা পর্যন্ত আটকে রাখার ব্যবস্থা করা হলো দুই ডাকাতকে। কথা বলে বোঝা গেল, লাতু মিয়া ডাকাতদের দলে পড়ে না। বড়ই নিরীহ মানুষ। তাকে ছেড়ে দেয়া হলো।

মুসা বোটটা পুড়িয়ে দেবার পর কি ঘটেছিল, জানা গেল সব। মাছধরা জাহাজের ক্যাপ্টেন ধোঁয়া দেখে রাতুন দ্বীপে যায়। কারুণ আর দুই সঙ্গীকে তুলে নিয়ে মানিয়াফুরায় চলে আসে। ক্যাপ্টেনকে ওরা জানায়, দুর্ঘটনায় আগুন লেগে ওদের বোট পুড়ে গেছে। রাতের বেলা ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা চলে যায় এমন একটা লোকের কাছে, যে পুরানো অবৈধ অস্ত্র বিক্রি করে। তিনটে পিস্তল আর একটা রাইফেল কেনে। তারপর বন্দরে গিয়ে সেই জাহাজটাই চুরি করে যেটা দিয়ে ওদের উদ্ধার করে আনা হয়, এতই অকৃতজ্ঞ। কিন্তু ওদের কপাল খারাপ, তীরের কাছে অন্ধকারে মাছ ধরছিল তখন একটা ছেলে। সে দেখে ফেলে দৌড়ে গিয়ে মালিককে খবর দেয়। চৌহানের কাছে ছুটে যায় মালিক। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে ছুটে যায় দ্বীপে।

যাই হোক, ভালয় ভালয়ই শেষ হলো সব। মানিয়াফুরা থেকে তিন গোয়েন্দার রওনা হবার দিন এসে হাজির হলো লাতু মিয়া। কেঁদে পড়ল, 'বাই, আমারে আমনেগ লগে লই যান। আমনেরা খুব বালা মানুষ বুইঝদে ফাইচ্ছি। আমারে একটা চাকরি দেন। আমি খুব বালা বাবুর্চি।'

এতই কাতর অনুরোধ, মন গলে গেল গোয়েন্দাদের।

হাসল কিশোর। 'ঠিক আছে, চলুন। বহুদিন থেকেই মামী একজন ভাল বাবুর্চির খোঁজে আছে।'

***

টাক রহস্য

এক

গোবেল বীচের চমৎকার বালির সৈকত। আড্ডা দিচ্ছে চার, না না, পাঁচজনে। ছুটি পেলেই এখানে বেড়াতে চলে আসে তিন গোয়েন্দা। তাদের সঙ্গে আছে জিনা। আর ওরা চারজন যেখানে, রাফি তো সেখানে থাকবেই।

আড্ডার কিছুই বুঝতে পারছে না রাফি। খালি ছুটাছুটি আর চিৎকার। সে ভাবছে, এতেই হয়ে গেল।

সাগরের দিক থেকে কয়েকটা সী গাল উড়ে এসে বসল পানির ধারে। ঘেউ ঘেউ করে ছুটে গিয়ে ওগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে এল রাফি।

'রাফি, কাজটা ঠিক করলি না,' ধমক দিয়ে বলল রবিন। 'হাজার হোক, সাগর ওদেরই ঘর। তোর নয়। তোর ঘরের ভেতরে এসে যদি তোকে ঠোকরাতে শুরু করে ওরা, তোর কেমন লাগবে?'

কি বুঝল রাফি, কে জানে, তবে লজ্জা পেল বলেই মনে হলো। কারণ লম্বা জিভ বের করে ফেলল সে। চেঁচামেচিও কমিয়ে দিল।

আরও কিছুক্ষণ খেলা করে নরম বালির ওপরই বসে পড়ল সে, জিরিয়ে নেয়ার জন্যে। শেষে একেবারে কিশোরের পাশে এসে শুয়ে পড়ল, জিভ বের করে হাঁপাতে লাগল।

'আহ্, ছুটি যে কি আরামের জিনিস!' রবিন বলল। 'খেলা, সাঁতার কাটা, তারপর নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়া। শুধুই মজা আর মজা।'

'তা ঠিক,' কিশোর বলল। 'তবে আজকের মত রোজই আর অত মজা করতে পারব না। ট্যুরিস্টরা এসে যাবে। যা করার আজকেই করে নেয়া উচিত।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'ছুটি হলেই এখানে হুড়মুড় করে লোক আসতে আরম্ভ করে। আর কত রকমের লোক যে আসে।'

'চোর-ছ্যাচড় থেকে শুরু করে বিজ্ঞানী, সবাই,' হেসে বলল মুসা। 'তবে ওরা আমাদের মত সৈকতে বল খেলতে আসে না। একেক জনের একেক উদ্দেশ্য।'

'আচ্ছা, এখানে বিজ্ঞানীরা কেন আসে বলো তো?' জিনাকে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'সম্মেলন?'

'হ্যাঁ। তবে শুধু সৈকতে বেড়াতেও আসে কেউ কেউ। ও হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলেই গেছি তোমাদের,' জিনা বলল। 'আজ সকালেই আম্মা আর আব্বা আলোচনা করছিল। এবারে নাকি অনেক বিজ্ঞানী আসছেন। বোঝাই হয়ে গেছে টেনটিংহ্যাম হোটেলের রূম। দেশ-বিদেশ থেকে আসছেন তাঁরা। সম্মেলন করতে। কেউ কেউ হোটেলে না থেকে প্রাইভেট কটেজ ভাড়া করে থাকবেন। আর কেউ কেউ উঠবেন আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে। আব্বা তো

সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে আছে। বিজ্ঞানীদের আসার অপেক্ষায়।'

তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। 'তোমাদের বাড়িতেও কেউ আসছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। কে আসছেন জানো? বিখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসর মিখাইল ইভানফ।'

'তাই নাকি!'

এমনই বিখ্যাত তিনি, এমনকি মুসাও তাঁর নাম শুনেছে, যে পড়ালেখার ধার দিয়ে যায় না, পত্রপত্রিকাও বিশেষ পড়তে চায় না। মধ্য ইউরোপের একটা ছোট্ট রাজ্য ভ্যারানিয়ায় জন্মেছেন তিনি। সারা পৃথিবীর লোকের কাছেই আজ তিনি পরিচিত। লোকে বলে, দুনিয়ায় মাত্র দুটো জিনিস ভালবাসেন ইভানফ। এক, তাঁর ছেলে ডাফ, আর দুই, তাঁর আবিষ্কার।

'তাঁর ছেলেও আসছে সাথে,' জিনা জানাল। 'আমেরিকায় এই প্রথম আসছে বাপ-বেটা। ডাফের বয়েস আমাদের মতই।'

'তাহলে তো খুবই ভাল,' মুসা বলল। 'আমাদের সাথে খেলতে পারবে, সাগরেও নামতে পারবে। বন্ধু হতে পারবে আমাদের।'

'বাপের মত না হলেই হয় আরকি,' জিনা বলল। 'আব্বা বলে, প্রফেসর ইভানফের মত বদমেজাজী আর রাগী মানুষ কমই আছেন। সব সময়ই মুখ কালো করে রাখেন। বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। কারও সাথে কথাই বলতে চান না।'

'খাইছে!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'অমন একজন মানুষকে দাওয়াত করতে গেলেন কেন পারকার আঙ্কেল?'

'কারণ দু'জনে প্রায় একই স্বভাবের। গবেষণা। কাজ। আর মুখ গোমড়া করে রাখা। এত মিল থাকতে কেন দাওয়াত করবে না?'

'আঙ্কেলকে তুমি যা-ই বলো,' কিশোর প্রতিবাদ করল। 'তাঁর হৃদয়টা কিন্তু খুব বড়।'

'প্রফেসর ইভানফেরও নাকি তা-ই। আব্বা বলে ডায়মন্ড হার্টেড জিনিয়াস।'

'হুঁ,' মুসা মাথা দুলিয়ে বলল। 'বেশিরভাগ বিজ্ঞানীদেরই মনটা বড় হয়। মানুষের উন্নতি নিয়ে যাদের এত ভাবনা, তাদের মন ভাল না হয়েই যায় না। ডাফও ভালই হবে মনে হয়। তো, বসে বসে এখানে বকবক করবে, না পানিতে নামবে?'

সবাই উঠে পড়ল। সোজা দৌড় দিল পানির দিকে। ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর শুরু হলো দাপাদাপি। প্রাণ খুলে দাপাদাপি করতে লাগল ওরা। আর এসব ক্ষেত্রে রাফি যা করে থাকে, তাই করছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। এমন চিৎকার যেন ভীষণ বিপদে পড়ে গেছে ওরা।

পরদিন সকালে টেলিভিশনের খবরে জানতে পারল ওরা, এয়ারপোর্টে পৌঁছেছেন প্রফেসর ইভানফ। খুব আগ্রহ নিয়ে পর্দার দিকে তাকিয়ে রইল ছেলেমেয়েরা। সিঁড়ি বেয়ে নামছেন প্রৌঢ় বিজ্ঞানী।

'বেশি মোটা!' রবিন মন্তব্য করল। 'আমি যেরকম ভেবেছিলাম সেরকম না।

আমি ভেবেছি, আরও বয়স্ক, পাকা চুল, ইয়া বড় টাক, চোখে ভারি চশমা। তা তো না। বিরাট এক ভালুকের মত লাগল। ওই মানুষ যদি আবার বদমেজাজী হয়···আরিব্বাপরে বাপ!'

একেবারে ভুল বলেনি রবিন। দেখতে অনেকটা গ্রিজলি ভালুকের মতই লাগে প্রফেসরকে। মাথা ভর্তি ঘন চুল, ভুরু দুটো ছোটখাট ঝোপ। রিপোর্টারদের সঙ্গে যখন কথা বললেন, কণ্ঠ শুনে মনে হলো যেন মেঘ ডাকছে।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে আবার বলল সে, 'তবে মানুষ তিনি ভালই হবেন। বোঝা যায়।' এই শেষ কথাটা আন্দাজে বলল রবিন, জিনা যে বলেছে সেটা মনে রেখে।

'ভাল তো হবেনই,' মুসা বলল। 'তবে তাঁর ছেলেটা ভাল হলেই আমরা খুশি। দেখতে তো খারাপ লাগছে না।'

কিশোর ডাফায়েল ইভানফ দাঁড়িয়ে রয়েছে তার বাবার পাশে। হাসিখুশি। সুন্দর চুল। স্বপ্নিল চোখ। প্লেন থেকে যারাই নামছে, তারাই একবার হলেও তাকিয়ে দেখছে পিতাপুত্রের দিকে। পরিষ্কার ভাবে সেসব দৃশ্য ধরে রেখেছে ক্যামেরা। বেশ কিছুক্ষণ দু'জনের সঙ্গে কথা বলল রিপোর্টাররা। খুশি হয়েই বলছে, কারণ ইংরেজিতে বলতে পারছে। ভাল ইংরেজি জানেন প্রফেসর আর তাঁর ছেলে।

'আজকের দিন আর রাতটা লন্ডনেই কাটাবেন,' জিনা জানাল বন্ধুদেরকে। 'কাল আরও দু'জন বিজ্ঞানীকে নিয়ে রেল স্টেশনে যাবে আব্বা, প্রফেসরকে এগিয়ে আনতে। দেখেছ, রিপোর্টাররাই কেমন ইনটারেসটেড? বিজ্ঞানীরা তো আরও হবেন, অতে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর সঙ্গে দেখা করাটাই ভাগ্যের ব্যাপার মনে করছে সবাই। কারণ ভ্যারানিয়া ছেড়ে খুব একটা বেরোন না তিনি।'

'বললে আঙ্কেল আমাদেরকে স্টেশনে নিয়ে যাবেন?' কিশোর জিজ্ঞেস করল। 'কি মনে হয় তোমার···'

'নিশ্চয় নেব,' দরজার কাছ থেকে বলে উঠলেন পারকার আঙ্কেল। 'তবে, কথা দিতে হবে কোনও গোলমাল করবে না। আরেকটা ব্যাপার, গাড়িতে সবার জায়গা হবে না। বাকি যারা থাকবে তাদেরকে সাইকেলে করে আসতে হবে। তা তোমরা পারবে, তাই না?'

পারবে তো অবশ্যই। সাইকেল চালাতে কোনও অনীহা নেই ওদের। গাড়িতে জায়গা না হলে চারজনেই সাইকেল নিয়ে যেতে রাজি। রাফি ওদের পাশে পাশে দৌড়ে যাবে। আলোচনা করে ঠিক হলো ভাগাভাগি হয়ে আলাদা আলাদা যাওয়ার চেয়ে সাইকেলে করেই যাবে ছেলেমেয়েরা। অফিশিয়াল রিসিপশন কমিটি যখন স্বাগত জানাবে প্রফেসর আর তাঁর ছেলেকে, ওরা তখন পেছনে দাঁড়িয়ে থাকবে গোল হয়ে।

সেই মতই ব্যবস্থা হলো।

পরদিন প্রফেসরকে দেখে কিছুটা নিরাশই হলো কিশোর। বলল, 'টেলিভিশনে যে রকম দেখলাম, সেরকম কিন্তু লাগল না তাঁকে। ছবি আর আসল মানুষটার মাঝে কেমন যেন একটা তফাৎ!'

'তোমার তো সব কিছুতেই সন্দেহ,' মুখ ঝামটা দিল মুসা। 'যা দেখো তাতেই। সব সময় মানুষকে একরকম লাগে না। বাড়ি চলো আগে। আলাপ-পরিচয় করো। তারপর দেখবে, আর খারাপ লাগবে না।'

মেহমানদের নিয়ে বাড়ি ফিরে এল সবাই। টেবিলে চা-নাস্তা সাজিয়ে দিলেন কেরিআন্টি। তারপর তিনি আর পারকার আঙ্কেল চা খেতে বসলেন মেহমানদের সঙ্গে। ছেলেমেয়ের সাথে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। হাত মেলালেন প্রফেসর, এমনকি রাফিরও পিঠ চাপড়ে আদর করে দিলেন। ডাফও হাত মেলাল। আন্তরিক হাসি উপহার দিল সবাইকে।

প্রফেসরকে তাঁর ঘর দেখিয়ে দেয়া হলো। জিনিসপত্র খুলতে খুলতেই দুপুর হয়ে গেল। লাঞ্চের সময়। কয়েক রকম মাংসের কয়েক রকম খাবার তৈরি করলেন কেরিআন্টি। টেবিলে দেয়া হলো। খাওয়া শুরু করার পর আর থামলেন না প্রফেসর। খেলেন, আর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে থাকলেন।

খাওয়ায় মনোযোগ বেশিক্ষণ থাকল না অবশ্য। শীঘ্রি কি সব বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন হয়ে গেলেন দুই বিজ্ঞানী। মুচকি হাসলেন শুধু কেরিআন্টি। তবে তাঁদের পাতে খাওয়া তুলে দেয়া থেকে বিরত রইলেন না, আর তাঁরাও খাওয়া বন্ধ করলেন না। কথা বলতে বলতে যেন বেশিই খেয়ে ফেললেন।

গভীর আগ্রহে শুনছে ছেলেমেয়েরা, বিশেষ করে কিশোর। একসময় তার মনে হলো, আলোচনাটা একতরফাই হচ্ছে। বলে যাচ্ছেন পারকার আঙ্কেল, আর প্রফেসর শুধু শুনছেন। মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন আর হুঁ-হাঁ করছেন, এর বেশি কিছু বলছেন না। তবে তাতে সন্দেহ করার কিছু পেল না সে। কারণ কথা বলেন না তিনি, আগেই শুনেছে। আরেকটা ব্যাপার ভেবে যুক্তিটা ঠিক মানতে পারল না কিশোর। কথা যদি না-ই বলবেন, খাবারের প্রশংসা করার সময় তো কার্পণ্য করেননি?

ডাফ অবশ্য তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্যে আন্তরিক চেষ্টা চালিয়ে গেল। ছেলেমেয়েরা তারচেয়ে কিছুটা ছোট, কিন্তু তাতে কিছু মনে করল না সে। মুসা আর জিনা বেশ দ্রুতই তার ভক্ত হয়ে গেল। রবিন ভাবল, মানুষ হিসেবে ডাফ খুব ভাল। কাজেই তার কথা মন দিয়ে শুনতে লাগল। একমাত্র কিশোরই তার সঙ্গে সহজ হতে পারছে না।

কেন, সেটা নিজেও বুঝতে পারল না। 'মনে হলো বেশি ভাব জমাতে চাইছে,' পরে বন্ধুদের সাথে একান্তে কথা বলার সময় বলল কিশোর। 'তার বাবা বেশি গম্ভীর। তবে সেটা মাঝে মাঝে। আর ছেলেটা ভাব জমাতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলছে।'

হেসে উঠল মুসা। 'কিশোর, সন্দেহটা তোমার রোগ হয়ে গেছে। আর কি করলে তুমি খুশি হতে? বাবা যে এতবড় বিজ্ঞানী, কোনও অহঙ্কারই নেই তার।'

'তাতে কি?' শেষের কথাটা ধরল কিশোর। 'জিনার বাবাও তো অনেক বড় বিজ্ঞানী। সে কি গর্ব দেখায়? তোমরা যা-ই বলো, আমি ডাফকে...'

ঘেউ করে বাধা দিল রাফি।

ফিরে তাকাল কিশোর। কুকুরটার চোখ চকচক করছে। লেজ নাড়ছে জোরে

জোরে।

'তুমি ভাল না বললে কি হবে,' রবিন হাসল। 'রাফিও ওকে ভাল বলছে। আস্ত একখান বিস্কুট দিয়েছে তো।'

'হয়েছে, হয়েছে,' বিরক্ত হয়ে হাত নাড়ল কিশোর। 'তোমাদের কাছে যখন ভাল, যাও, ভালই। ভাল, ভদ্র, সুন্দর, আন্তরিক, সব। আর কিছু? খুশি হয়েছো?'

দুই দিন যেতে না যেতে ডাফের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল সবার, কিশোর বাদে। তার মনোভাবের একটুও পরি-বর্তন হলো না। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বেশিরভাগ সময় কাটায় ডাফ। একটা সাইকেল ভাড়া করে নিয়েছে। ওদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। পুরো গ্রামটা ওকে দেখানো হলো। সাগরে সাঁতার কাটতে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর, নিজের নৌকায় করে ডাফকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ারও আমন্ত্রণ জানিয়ে বসল জিনা।

সারাক্ষণ ডাফের কাছাকাছি থাকে কিশোর। সকাল-দুপুর-বিকাল-রাতে দেখা হয় প্রফেসর ইভানফের সাথে, দু'চারটে কথাও যে হয় না তা নয়, তবু সহজ হতে পারল না সে। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে তার নিজের কাছেও। কেন এরকম হচ্ছে? কেন আর সবার মত সহজ ভাবে মিশতে পারছে না মেহমানদের সাথে?

'হতে পারে,' ব্যাখ্যা করল মুসা। 'ওরা এমন এক দেশের লোক, যাদেরকে বেশি বিদেশী ভাবছ তুমি। ভ্যারানিয়ায় তো কখনও যাওনি, তা ছাড়া ওই দেশের আর কারও সাথেও কথাও বলনি...'

'তুমি বলেছ?'

থমকে গেল মুসা। 'না, তা বলিনি, তবে...'

'তবে কি?'

'তাহলে তুমি মিশতে পারছ না কেন?' জবাব দিতে না পেরে রেগে গেল মুসা।

'পারছি না আমার ভাল লাগছে না বলে। আমাকে তো চেনো। খুব কি অমিশুক মনে হয়? আর সবার সঙ্গে তো পারি। ওদের সঙ্গে পারি না কেন? কিছু একটা আছে বলেই। কি, সেটাই বুঝতে পারছি না।'

চুপ হয়ে গেল মুসা।

জিনা বলল, 'এখন আমারও কেমন লাগছে। কি যেন একটা রয়েছে ডাফের মাঝে। মেকি মেকি মনে হয়। আমিও বুঝতে পারি না গলদটা কোথায়!'

জিনার সমর্থন পেয়ে কিশোরের জোর বেড়ে গেল। 'হ্যাঁ, গলদ একটা আছেই। হতে পারে, যাদের কাছে থাকতে এসেছে, তাদেরকে বেশি খাতির করে, ভদ্রতা দেখিয়ে খুশি করার জন্যে করছে এরকম। কিংবা হতে পারে, ভ্যারানিয়ানরা ওরকমই। নতুন লোকের সঙ্গে বেশি আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা করে।'

বলল বটে, কিন্তু যুক্তিটা তার নিজের কাছেই বেখাপ্পা লাগল। বিড়বিড় করে আনমনেই বলল, 'তার এই ভাল মানুষ সাজার চেষ্টাটাই ভাল লাগছে না আমার।'

ডাফের প্রতি ভাল লাগায় চিড় ধরেছে জিনার। এত আলোচনার পর মুসাও দ্বিধায় পড়ে গেছে। তবে রবিন আগের মতই আছে। সে কোনও মানুষকেই অপছন্দ করতে পারে না, যদি সত্যি সত্যি তার খারাপ কিছু না দেখে। আর রাফির ভাল লাগার একটাই কারণ, নানারকম সুখাদ্য তাকে খাইয়ে চলেছে ডাফ।

তবে খুব বেশি সময় লাগল না। এমন একটা ব্যাপার ঘটল, যা আরও বেশি করে ভাবিয়ে তুলল গোয়েন্দাদের।

দুই

সকালের নাস্তার পরে বাগানে বেরিয়েছে ওরা। প্রফেসর ইভানফ আর জিনার বাবা মিস্টার পারকার সম্মেলনে যোগ দিতে রওনা হয়ে গেছেন। ডাফ গিয়ে ঢুকেছে তার শোবার ঘরে।

প্রচুর কথা বলতে পারে ছেলেমেয়েরা। বলেও। কিন্তু আপাতত এর উল্টোটা ঘটল। চুপ হয়ে আছে সবাই। বলার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছে না যেন। পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে শুধু।

অবশেষে এই নীরবতার সমাপ্তি ঘটাল মুসা, 'আজব একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ কেউ? নাস্তার টেবিলে?'

'করেছি,' সাথে সাথে জবাব দিল রবিন। 'প্রফেসর ইভানফকে অন্য রকম মনে হলো।'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'একেবারে অন্য রকম লাগছিল। যেন ইভানফই নন।'

'কিন্তু পরিবর্তনটা কোথায়?' জিনার প্রশ্ন। 'কাল এবং পরশু যে পোশাক পরে ছিলেন, তাই তো ছিল আজ সকালেও।'

'না, তাঁর চেহারাটা অন্য রকম লেগেছে,' রবিন বলল।

'আমার কাছেও,' সায় দিয়ে বলল মুসা। 'তাঁর চেহারাতেই কিছু বদল হয়েছে।'

'এবং সেই বদলটা কি?' ঠোঁট কামড়াল জিনা। 'নকল দাঁত আছে? যা আজ সকালে পরতে ভুলে গেছেন? দাঁত মানুষের চেহারা আর চোয়ালের অনেক পরিবর্তন করে দেয়।'

'না, দাঁত-টাতের ব্যাপার নয়,' সম্ভাবনাটা মানতে পারল না মুসা। 'তাহলে দেখতে পেতাম। দাঁত না থাকলে খাওয়ার সময় বোঝা যেতই। তা ছাড়া বেশ কয়েকটা টোস্ট চিবিয়ে খেয়েছেন কড়মড় করে। দাঁত ছাড়া কি চিবানো যায় ওভাবে? অন্য কিছু হতে পারে। এই যেমন ফোলা চোয়াল, চোখের নিচে কালসিটে...'

'কালসিটে হলেও লুকিয়ে থাকত না, আমাদের চোখে পড়তই,' মুসার যুক্তিও উড়িয়ে দিল কিশোর। 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, পেয়েছি! তাঁর চুল!'

'ঠিক!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'চুল! চুল আঁচড়েছেন অন্যভাবে। কিন্তু সেটা তো কোনও রহস্য হলো না। সন্দেহ করার কিছু নেই। অনেকেই একেক সময় একেক ভাবে চুল আঁচড়ায়।'

'বিকেলে ফিরে আসুক,' মুসা বলল। 'ভালমত খেয়াল করব। চলো, একটা কথা নিয়েই সারাদিন না কাটিয়ে ডাফকে ডেকে আনি। সাঁতার কাটতে যাব।'

রাজি হলো অন্যেরাও। ডাফের জানালার নিচে এসে তাকে ডাকল। জানালা দিয়ে মুখ বের করল ডাফ। আইভি লতায় ছাওয়া জানালাটা। হাত দিয়ে কয়েকটা লতা সরিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করল সে, 'কি ব্যাপার?'

'সাঁতার কাটতে যাব,' মুসা বলল। 'যাবে?'

'সরি, আজ যেতে পারছি না। শরীরটা ভাল লাগছে না। না না, অসুখ-টসুখ না, টায়ারড। গত দু'দিন বেশি পরিশ্রম করে ফেলেছি। আজ আর বেরোতে ইচ্ছে করছে না। ঘরে বসে বসে বই পড়ব। তোমরা কিছু মনে করলে না তো?'

'না, মনে করার কি আছে? শরীর খারাপ লাগলে আর বেরোবে কি করে?'

ডাফের জন্যে ছেলেমেয়েদের সাঁতার কাটা বন্ধ রইল না। তাকে বাদ দিয়েই সৈকতে চলল ওরা।

লাঞ্চের সময় নিচে নামল ডাফ। প্রফেসর ইভানফ আর পারকার আঙ্কেল ফেরেননি। ফেরার কথাও নয় বিকেলের আগে। সম্মেলন শেষ হলে তারপর তো আসবেন।

খাওয়া শেষ করে রান্নাঘরে চলে এল ছেলেমেয়েরা। কেরিআন্টিকে বাসন ধোয়ামোছায় সাহায্য করবে কিনা জিজ্ঞেস করল। ঘরে এতগুলো বাড়তি লোক, নিশ্চয় অনেক চাপ পড়ে গেছে আনটির ওপর। এই কথাটা আরও আগেই কেন মনে হলো না, ভেবে দুঃখ পেল রবিন।

'থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ,' হাসতে হাসতে বললেন কেরিআন্টি। 'না, আমার কোনও সাহায্য লাগবে না। এর চেয়ে বেশি লোক হলেও একাই সামলাতে পারব। তোমরা খেলতে যাও। সারা বছরই তো খাটো, পড়ালেখা করতে হয়, এই ক'টা দিন আর কাজ করার দরকার নেই।' একটা বাসন মুছে তাকে রাখতে রাখতে বললেন, 'ডাফকে আজ গির্জাটা দেখিয়ে আনো। ওর ভালই লাগবে মনে হয়।'

'ও বেরোবে না,' জিনা বলল। 'শরীর নাকি ভাল না। সারাটা সকাল ঘরেই বসে ছিল।'

অবাক হলেন কেরিআন্টি। 'ঘরে বসে ছিল! তাহলে কি ভুল দেখলাম? তোরা বেরিয়ে যাওয়ার পর মনে হলো বাগানের পাশের গেটটা দিয়ে সে-ও বেরোল!'

'তাই নাকি?' ভুরু কোঁচকাল কিশোর।

'মনে তো হলো। যাকগে, এমন কোনও ব্যাপার নয়। যাও, তোমরা খেলগে।'

আবার বাগানে বেরিয়ে এল ওরা। বেরিয়েই বলে উঠল কিশোর, 'আমার মনে হয় আন্টি ভুল দেখেননি। ঠিকই দেখেছেন। কারণ এরকম ভুল হতে পারে না। আর কেউ বাড়িতেও নেই যে বাগানের পাশের গেট দিয়ে বেরোবে। ডাফই মিথ্যে বলেছে আমাদের কাছে। কিন্তু কেন?'

'হয়তো বিরক্ত হয়ে গেছে আমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে,' জিনা বলল।

'এটা কোনও জবাবই হলো না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'তা কেন হবে? আর শুধু এর জন্যে মিথ্যে বলবে না।'

'আমারও তাই বিশ্বাস,' মুসা একমত হলো কিশোরের সঙ্গে। 'তেমন হলে অন্যভাবে বলে দিত। কিংবা সোজাসুজি বলে দিত যাবে না। আমাদের সঙ্গ কারও

পছন্দ না হলে এবং সেটা বললে বুঝতে পারব না আমরা, এটা হয় না।'

'বলেছিলাম না,' সুযোগ পেয়ে গেল কিশোর। 'ওর চরিত্রটাই অদ্ভুত।'

'এখন আবার বেশি বলে ফেললে। এর মধ্যে কোনও রহস্য নেই। নাকি তুমি ভাবছ…'

'হ্যাঁ, ভাবছি। রহস্যই আছে এতে। পরিষ্কার গন্ধ পাচ্ছি আমি। রাফি যেমন খরগোশের গন্ধ চিনতে ভুল করে না…'

'ঘাউ!' করে সায় জানাল রাফি। লেজ নাড়ল। বুঝিয়ে দিল, খরগোশ শিকারে যেতে কোনও আপত্তি নেই তার।

সেদিন রাতের খাওয়ার সময় প্রফেসরকে ভাল করে লক্ষ করার সুযোগ পেল আবার ওরা। টেবিলে ওদের উল্টো দিকে বসেছেন তিনি।

খাবার শেষ হলে বড়রা কফি খেতে লাগলেন, ছেলেমেয়েরা উঠে চলে এল তাদের কমন রুমে। আলোচনায় বসল।

'হ্যাঁ, চুলই,' রবিন বলল। 'আরেক ভাবে আঁচড়েছেন।'

'না,' কিশোর বলল। 'আরেক ভাবে নয়। একভাবেই আঁচড়েছেন।'

'তাহলে পার্থক্যটা কোনখানে?' বুঝতে পারল না জিনা।

'তাঁর কপাল।'

'কপাল! কিন্তু কোনও মানুষের কপাল বদল হতে পারে না। বদল করা যায় না। তবে চুল নানাভাবে আঁচড়ে ছোটবড় করা যায়।'

'বদল করা যাক বা না যাক, আজ তাঁর কপাল ছোট লেগেছে আমার কাছে।'

'এ-হতেই পারে না!' জোরে জোরে মাথা নাড়ল জিনা।

'কিন্তু হয়েছে!' কিশোর তার কথায় অটল রইল। 'তাঁর কপালটাই প্রথমে চোখে পড়েছিল আমার। বিশাল। অনেক ওপরে চুল। অথচ আজ অনেক নিচে নেমে এসেছে। যেন রাতারাতি চুল গজিয়েছে ওখানটায়।'

'কি জানি, আমাজানের নরমুণ্ড শিকারীদের পাল্লায় পড়েছিলেন হয়তো,' হেসে রসিকতা করল মুসা। 'চামড়া কুঁচকে খুলি ছোট করে দেয়ার কায়দা জানে তো ওরা, তা-ই করে দিয়েছে।'

তার রসিকতায় কান দিল না কেউ। কিশোর যা বলছে তা সত্যি হলে সাংঘাতিক একটা রহস্য এসে হাজির হয়েছে। একজন মানুষের কপাল কি করে বদলে যেতে পারে! তবে সেটা নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবার সময় পেল না। টেলিভিশনে খুব রোমাঞ্চকর একটা অনুষ্ঠান দেখাবে। আফ্রিকান বুশম্যানদের ওপর একটা শর্টফিল্ম।

দেখতে দেখতে রহস্যটার কথা ভুলেই গেল ওরা। পরদিনের আগে আর মনে পড়ল না।

পরদিন অবাক করার মত আরেকটা ঘটনা ঘটল। আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল প্রফেসর ইভানফের কপাল।

'আশ্চর্য!' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'সাংঘাতিক ব্যাপার! ছোট হচ্ছে বড় হচ্ছে, যেন জোয়ার আর ভাটা। পানি উঠে একবার সৈকত ছোট হচ্ছে, নেমে গিয়ে আবার বড়…'

'শ্‌শ্‌!' সাবধান করল জিনা। 'শুনতে পাবেন!'

কিন্তু পেলেন বলে মনে হলো না। কিংবা পেলেও সেটা গায়ে মাখলেন না। বাচ্চারা কত কথাই বলে। পারকার আঙ্কেলের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন তিনি, টেনটিং-হ্যামে যাবেন, সম্মেলনে।

আজ আর শরীর খারাপ বলল না ডাফ, কিংবা ঘরে থাকার কথা বলল না। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছায়ার মত লেগে রইল। কিশোর তাকে অপছন্দ করে, ঠিকই বুঝতে পারল। তার কাছে ভাল হওয়ার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালাতে লাগল। লাভ হলো না।

একসময় আলাদা হয়ে গিয়ে কিশোরকে বলল রবিন, 'কিশোর, এতটা মনে হয় ঠিক হচ্ছে না। মানুষটা এত ভাবে চেষ্টা করছে। ভদ্রতা বলেও তো একটা কথা আছে।'

'না পারলে কি করব?' রুক্ষ স্বরে জবাব দিল কিশোর। 'ও কথা বলতে এলেই আমার রাগ লাগে। বেশি কৌতূহল ওর। আমার মনে হলো, প্রশ্ন করে করে সব জেনে নিতে চায়। জিনাকে বেশি প্রশ্ন করে, খেয়াল করোনি? পারকার আঙ্কেলের ব্যাপারে এত কৌতূহল কেন?'

সেদিন বিকেলে জিনার নৌকায় করে সাগরে বেরোনোর প্রস্তাব দিল মুসা। খোলা সাগরে বেরিয়ে আসার পর বলল, একটা কথা বলতে এসেছে, যা বাড়িতে বলতে পারছিল না, কেউ আড়িপেতে শুনে ফেলার ভয়ে। 'তাই মনে হলো এটাই সবচে নিরাপদ জায়গা,' বলল সে। 'কিশোরের ধারণা, দুই ইভানফের কিছু একটা গোলমাল রয়েছে। অস্বাভাবিক। তার ধারণা ঠিক কিনা বলতে পারব না, তবে প্রফেসরের সম্পর্কে আমারও জানার কৌতূহল হচ্ছে। সেই জন্যেই আজ রাতে কাজটা করতে যাচ্ছি।'

'কি কাজ?' জানতে চাইল জিনা।

'শোবার ঘরে ও যখন একা থাকে, কি করে দেখতে চাই।'

'চুরি করে মেহমানের ওপর নজর রাখা!' প্রতিবাদ করল রবিন, 'উচিত হবে না। কেরিআন্টি আর পারকার আঙ্কেল জানতে পারলে খুব রাগ করবেন।'

'জানি। কিন্তু রহস্য যদি একটা থেকেই থাকে সেটাও বের করা উচিত। তাই না?'

'তাই,' এসব ব্যাপারে একমত হতে কোনও দ্বিধা নেই কিশোরের।

ঘাউ ঘাউ করল রাফি। কি বুঝল কে জানে। মনে হলো সম্মতি জানাল।

'কাজেই,' তার পরিকল্পনার কথা বলল মুসা। 'আঙ্কেলের সঙ্গে আলোচনা শেষ করে প্রফেসর যখন তাঁর ঘরে শুতে যাবেন, আমি গিয়ে...'

'...চাবির ফুটো দিয়ে চোখ রাখবে নিশ্চয়,' কথাটা শেষ করে দিল জিনা। হাসল। 'তবে বাজি ধরে বলতে পারি কিছুই দেখতে পাবে না।'

'না, দরজার ধারে কাছেও যাব না। প্রফেসরের ঘরের বাইরে ছোট একটা ব্যালকনি আছে না,' মুসা বলল। 'সেখান দিয়ে। প্রফেসর কখনও জানালার পর্দা টানেন না। বোধহয় বাগান দেখার জন্যে। ওখানে উঠে যাব।'

'যদি কেউ দেখে ফেলে?' ব্যাপারটা একটুও ভাল লাগছে না রবিনের।

'নাথিং ভেনচারড, নাথিং গেইনড!' বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে মুসা বলল, 'কথাটা শুনেছো কখনও? আমি দেখতে চাই, ঘরে ঢুকে কি করেন প্রফেসর। আয়নার সামনে বসে চুলের যত্ন করেন, না কপাল ছোট বড় করেন? করলে কিভাবে করেন?'

পরস্পরের দিকে তাকাল রবিন আর জিনা। কিছু বলল না। জানে, লাভ নেই। কিছুতেই মুসাকে ঠেকাতে পারবে না এখন। কারণ প্রচণ্ড কৌতূহলী হয়ে উঠেছে সে। তার ওপর ইন্ধন জোগাচ্ছে কিশোর।

রাতের বেলা, নজর রাখতে যাবার সময় হলো।

'ওই আইভি লতা বেয়ে উঠে যাব,' ফিসফিসিয়ে সবাইকে বলল মুসা। 'অনেক শক্ত। টেনে দেখেছি। লতা বেয়ে টারজান যদি গাছে চড়তে পারে আমি কেন ব্যালকনিতে চড়তে পারব না?' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল সে, তবে নিঃশব্দে।

বেয়ে উঠতে শুরু করল সে। অন্যেরা বাগানের গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল। এসব বাওয়া-বাওয়িতে মুসা ওস্তাদ। দেখতে দেখতে উঠে চলে গেল কাঠের রেলিঙের কাছে, রেলিঙ ডিঙিয়ে ব্যালকনিতে নামল। পা টিপে টিপে গিয়ে চোখ রাখল জানালায়।

বেশিক্ষণ থাকল না। খানিক পরেই ফিরে এল চওড়া হাসি নিয়ে। 'হাহ্ হা!' উরুতে চাপড় মারল সে। কণ্ঠস্বর চেপে রাখতে চাইছে বটে, কিন্তু এতই উত্তেজিত হয়েছে দাবিয়ে রাখতে পারছে না কিছুতেই। 'কি দেখেছি জানো?'

'না বললে জানব কি করে? গাধা!' মুসার এই নাটকীয় আচরণে রেগে যাচ্ছে কিশোর। 'জলদি বলো! কি দেখলে?'

'আমাদের প্রফেসর সাহেব, যার এত নামডাক দুনিয়া জুড়ে,' টেনে টেনে বলল মুসা, 'এত বুদ্ধিমান, তিনি একটা দাঁড়কাক ছাড়া কিছুই নন। পুচ্ছ পরে রেখেছেন ময়ূরের। পরচুলা টেনে খুলতে দেখলাম। মাথায় চকচকে টাক। একেবারে টেনিস বলের মত সাদা। হাহ্ হাহ্ হা! দেখতে যা লাগে না চুল ছাড়া! তোমরা যদি দেখতে!'

শুনে স্তব্ধ হয়ে গেছে জিনা আর রবিন। কিশোর তেমন অবাক হলো না। সে এরকমই কিছু একটা আশা করেছিল। সে-ও হাসতে শুরু করল মুসার সাথে।

প্রফেসরের এই নতুন রূপের কথা শুনে মনে মনে আহত হয়েছে রবিন। 'উইগ পরলে কি হলো? টাক আছে, দেখতে খারাপ লাগে সেজন্যেই পরেন, তাতে হলোটা কি?'

তাই তো! হলোটা কি? উইগ তো অনেকেই পরে। প্রফেসরও না হয় পরলেন। তবে জবাব দিতে ছাড়ল না মুসা। 'কেন হাসছি? উইগের রঙ আর ধরনে। কেন পরতে গেলেন লম্বা কোঁকড়ানো সোনালি চুলের উইগ? তাঁর মত একজন বয়স্ক লোককে দেখতে লাগে কেমন?'

তা বটে। জবাব দিতে পারল না রবিন। আবার হাসতে লাগল মুসা।

তবে এবার আর কিশোর হাসল না। কি যেন ভাবছে।

'কি হলো, কিশোর?' জিনা জিজ্ঞেস করল। 'হঠাৎ অমন চুপ মেরে গেলে কেন?'

'ভাবছি মুসার কথা,' কিশোর বলল। 'ঠিকই তো? ওরকম উইগ পরতে গেলেন কেন? আরও কত রকম উইগ আছে। সাধারণ আর স্বাভাবিক রঙের একটা উইগ পরা উচিত ছিল তাঁর।'

'হতে পারে,' অনুমান করল জিনা, 'টাক হওয়ার আগে তাঁর চুল ওরকম সোনালিই ছিল। তাই চুল উঠে যাওয়ার পর ওই রঙেরটাই বেছে নিয়েছেন। যাতে কেউ বুঝতে না পারে। মগজের কাজ যারা করে তাদের হঠাৎ করে চুল উঠে টাক হয়ে যায় অনেক সময়, শুনেছি।'

'যুক্তিটা ঠিকই আছে,' কিশোর বলল। তবে মানতে যে পারছে না, তার কথায়ই সেটা স্পষ্ট। 'শুধু ওই একটা ব্যাপারই খোঁচাচ্ছে না আমাকে। একটা হলে উড়িয়ে দিতাম। আরও আছে।'

'কি!' প্রায় একই সাথে প্রশ্ন করল তিনটে কণ্ঠ।

রাফি চুপ করে তাকিয়ে রয়েছে কিশোরের মুখের দিকে। কি আলোচনা হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না। এসব আলোচনার সময় ভাল লাগে না তার। বসে বসে খালি কথা আর কথা!

'হয়তো,' কিশোর বলল। 'প্রফেসর ইভানফ টাক-মাথাই নন! মানে, তাঁর টাকই নেই!'

আরও অবাক হয়ে গেল মুসা, রবিন আর জিনা।

'ওরকম রহস্য করে কথা বলছ কেন?' মুসা বলল, 'খুলেই বলো না।'

'মনে আছে,' কিশোর বলল, 'সমস্ত সংবাদ পত্র আর টেলিভিশনের রিপোর্টাররা কি রকম ঢাকঢোল পিটিয়েছে? গত কিছুদিন ধরে খালি বিজ্ঞানীদের নিয়ে আলোচনা। তাঁরা কোন্ দেশের লোক, কি কি যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছেন, কে কতটা বুদ্ধিমান -এসব। টেনটিংহ্যামের সম্মেলন ছাড়া যেন রিপোর্টারদের কাছে আর কিছু নেই এখন দুনিয়ায়। মিখাইল ইভানফকে নিয়েও কম মাতামাতি করছে না। পুরানো কাসুন্দিও বেশ ঘাঁটছে। বলছে, বহু বছর আগে, যখন প্রফেসরের বয়েস অনেক কম ছিল, তরুণ, তখন তিনি একটা সাংঘাতিক আবিষ্কার করেছিলেন। খবরের কাগজের হেডিং হয়েছিল সেটা। টাকের ওষুধ নাকি আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। তার পরে অবশ্য বড় বড় আরও অনেকগুলো আবিষ্কার তিনি করেছেন, তবে সেটাই নাকি সবচেয়ে বিখ্যাত। এবং গত কয় বছরে ভ্যারানিয়ায় নাকি টেকো লোকের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এহারে চলতে থাকলে আর কয়েক বছর পর ওই দেশে একজন টেকো লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনেক দেশ অনেক অনুরোধ করেছে ওষুধটার জন্যে, কিন্তু কিছুতেই ফরমুলা বিক্রি করতে রাজি হয়নি ভ্যারানিয়ান সরকার। সেটা আরেক কাহিনী।' একবারে অনেক কথা বলে থেমে দম নিল সে। তারপর বলল, 'তাহলে কি বুঝলে? টাকের ওষুধ আবিষ্কার করে যিনি শত শত লোকের টাক সারিয়ে দিচ্ছেন, তিনি নিজে টেকো থেকে যাবেন, এটা কি বিশ্বাস হয়?'

'না, তা হয় না,' মুসা বলল। 'কিন্তু কিশোর, আমি নিজের চোখে দেখেছি। উইগটা টেনে খুলে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে নামিয়ে রাখলেন। উইগ যে

পরেন তার আরেকটা প্রমাণ তাঁর কপাল ছোট-বড় হয়ে যাওয়া। ঠিকমত যেদিন পরা হয় না, বেশি সামনে চলে আসে, সেদিনই কপাল ছোট হয়ে যায়। আবার বেশি পেছনে সরে গেলে বড় হয়ে যায়।'

কিশোর তার আগের কথায় অটল রইল। 'কিন্তু আমি আবারও বলছি, প্রফেসর ইভানফ টেকো হতেই পারেন না।'

'হয়তো নিজের টাকে ওষুধ লাগাননি তিনি,' জিনা বলল। 'ব্যবহার করতে চান না কোনও কারণে। হয়তো টাকমাথাই তাঁর পছন্দ, ঘুমাতে আরাম লাগে।'

'হ্যাঁ, এটা হতে পারে,' সায় জানাল রবিন।

'সব ফালতু কথা!' জোরে জোরে মাথা নাড়ল কিশোর, 'এ-হতেই পারে না। টাকই যদি পছন্দ, তাহলে উইগ পরেন কেন? অন্য কোনও ব্যাপার।' এতক্ষণে যেন কুকুরটার ওপর নজর পড়ল তার। ওটা যে আছে, ভুলেই গিয়েছিল যেন। 'কি বলিস, রাফি?'

'ঘাউ!' করে মাথা ঝাঁকাল রাফি।

আর কোনও আলোচনা হলো না সেরাতে। সারাদিন ছুটাছুটি করে সবাই খুব ক্লান্ত। বাড়িতে ঢুকে যার যার ঘরে চলে এল। কাপড় ছেড়ে একেবারে সটান বিছানায়। অন্যেরা শোয়ার পর পরই ঘুমিয়ে পড়ল, কিশোর বাদে। সে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল টাকের অদ্ভুত রহস্যটা নিয়ে।

পরদিন সকালে ঘুমও ভাঙল একই চিন্তা নিয়ে। শুয়ে শুয়ে আরও কিছুক্ষণ ভাবল। কোনও সমাধান বের করতে না পেরে বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল। অন্যদের সঙ্গে কথা বলে বুঝল, মুসা বাদে অন্য দু'জন আর কিছুই ভাবেনি টাক নিয়ে। প্রায় ভুলেই বসে আছে।

তবে সেদিন আরেকটা ঘটনা ঘটল। এবার ডাফ ইভানফের ক্ষেত্রে।

তিন

কেন যেন রাফির মনে হলো একটা কিছু খেলা দেখানো দরকার। সৈকতে বল খেলছে ছেলেমেয়েরা, ডাফ রয়েছে ওদের সঙ্গে। পানির ধারে খানিকক্ষণ ছুটাছুটি করে, সী গাল তাড়িয়ে বিরক্ত হয়ে এসে বল খেলায় নামল সে। বলটা দুই থাবা দিয়ে তুলে নিয়ে নাকে বসাল, তারপর সার্কাসের কুকুরের মত ব্যালান্স করে বসিয়েই রাখল ওখানে। হাস্যকর ভঙ্গিতে পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে বসেছে, সামনের দুই পা তুলে রেখেছে নুলো মানুষের মত।

এই কায়দাটা কিশোরই শিখিয়েছে তাকে। হাসতে শুরু করল ছেলেমেয়েরা।

তারিফ করল ডাফ। 'বাহ্, বেশ কুকুর তো! এরকম খেলাও জানে। বুঝলে, রাফিকে আমার খুব পছন্দ। ওরকম একটা কুকুর আমারও ছিল, বারো বছর আগে আমার দশ বছরের জন্মদিনে উপহার পেয়েছিলাম। আমার এক চাচা এনে দিয়েছিল। ভ্রাম্যমাণ একটা সার্কাসের দলের কাছ থেকে। কুকুরটা যে শুধু বল নাকেই নিতে পারত তা নয়, চার পা তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত ছোট

একটা বলের ওপর। গড়িয়ে পড়ে যেত না। আরও নানারকম খেলা দেখাতে পারত। সার্কাসের ট্রেনিং পেয়েছিল তো।'

'জিনা,' রবিন বলল। 'রাফিকেও শেখাও না! কয়েকটা কৌশল শিখে নাও ডাফের কাছ থেকে।'

জিনা রাজি হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কর্কশ কণ্ঠে কিশোর বলল, 'ডাফ তো আর ট্রেনার না, কি করে শেখাবে?' বলে সরে চলে এল সেখান থেকে।

খেলায় আর নামল না ওরা। গভীর ভাবে চিন্তা করছে কিছু কিশোর। তারপর গরম হয়ে, ঘেমেটেমে সবাই যখন সাঁতার কাটতে নামল, ডাফের সরে যাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল সে। খুব ভাল সাঁতারু ডাফ। অনেক দূর চলে যেতে পারে। এখনও তাই করল। পানির বুকে বেরিয়ে থাকা একটা পাথরের টিলার দিকে সাঁতরে চলল সে। তখন সবাইকে ডেকে একজায়গায় জড় করল কিশোর।

'তখন ও কি বলল খেয়াল করেছ?' জিজ্ঞেস করল সে। 'ব্যাপারটা উদ্ভট ঠেকেনি?'

জিনা আর রবিন কিছুই বুঝতে পারল না কিশোর কি বলতে চাইছে। তবে মুসা বুঝে ফেলল। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ,' বলে উঠল সে। 'ডাফ বলল কুকুরের বাচ্চাটা উপহার পেয়েছিল তার দশম জন্মদিনে, বারো বছর আগে।'

'তাতে উদ্ভটটা কি হলো?' জিনা প্রতিবাদ করল। 'ছেলেরা জন্মদিনে কুকুরের বাচ্চা উপহার পেয়েই থাকে।'

'এখনও বুঝতে পারলে না?' হতাশ হয়েই যেন মাথা নাড়ল কিশোর। 'বারো বছর আগে দশ বছর বয়েস। কত হয়? দশ যোগ বারো, বাইশ।'

'তাই তো!' এতক্ষণে বুঝল জিনা। 'বাইশ! বয়েস ভুল করেছে। কিংবা জন্মদিনের কথাটা বানানো। গপ্পো! ও ওরকম গপ্পো মেরেই থাকে।'

'হ্যাঁ,' রবিনও সুর মেলাল। 'আসলে ওরকম কোনও কুকুরের বাচ্চা পায়নি সে। আমাদের রাফির মত কুকুর পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা? একটা মিথ্যে কথা বলতে গেলে দশটা মিথ্যে এসে যায়।'

'তোমার মাথা! হাঁদারাম!' রেগে গেল কিশোর। 'কাউকে পছন্দ করল তো করলই, তার সাত খুন মাপ।'

'আরেকটা ব্যাপার অবশ্য হতে পারে,' মুসা বলল। 'নিজেকে বয়স্ক বোঝানোর জন্যে ইচ্ছে করেই বেশি বলেছে। অনেকেই তো চায়, তাকে লোকে বেশি বয়েসী ভাবুক।'

'না, তাহলে প্রথমেই বেশি বলত। প্রথমে কম বলে শেষে ওরকম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বয়েস বেশি বোঝাবে এটা হতেই পারে না। ওর বয়েস আসলে বেশি এবং ও সেটা ভুলে প্রকাশ করে ফেলেছে। শুরুতে বরং কম কম করেই শুনিয়েছে আমাদের।'

তার এই যুক্তি শুনে অবাক হলো অন্য তিনজন।

'কেন করবে?' মুসার প্রশ্ন। 'খবরের কাগজগুলো তো আর মিথ্যে বলেনি। ওরা সবাই বলেছে ডাফ ইভানফের বয়েস ষোলো।'

'জানি। তবে ডাফের বয়েস যে ষোলো নয়, তার আরও প্রমাণ আমি

পেয়েছি। এই একবারই সেটা সে ফাঁস করেনি, আরও করেছে।'

'কখন? কিভাবে…'

থেমে গেল মুসা। ফিরে আসছে ডাফ।

সারাটা সকালই এরপর ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল খুদে গোয়েন্দারা। কেন বয়েস কমিয়ে বলতে যাবে ডাফ? কি লাভ? কোনও কারণ তো দেখা যাচ্ছে না। আবার বয়েস যদি বেশিই হয়, খবরের কাগজের লোকেরা সেটা জানতে পারল না কেন? তারা তো খবর খুঁচিয়ে বের করার ওস্তাদ। অন্য তিনজন খেয়াল না করলেও কিশোর ঠিকই করেছে, ডাফ রোজ সকাল-বিকাল শেভ করে। যেন দাড়ি কামিয়ে বয়েস কমিয়ে রাখতে চায়। আরও একটা ব্যাপার, কিশোরের মনে হয়েছে পনেরো-ষোলো বছরের কিশোরের তুলনায় ডাফের দাড়ি অনেক মোটা আর ঘন!

সন্দেহটা মনে ঢুকিয়ে দেয়ার পর অন্য তিনজনও ব্যাপারটা লক্ষ করল। তারপর আরও একটা ব্যাপার ঘটল, যাতে রহস্য আরও জমাট হলো। বদমেজাজী হলেও ডায়মন্ড হার্টেড বলে পরিচিত যে প্রফেসর ইভানফ, তিনি এমন একটা কাণ্ড করে বসলেন, যাতে কিছুতেই আর মানতে ইচ্ছে করে না তাঁর মনটা ভাল, দরদী।

সেদিন রোববার। ছুটির দিন। সব কিছু বন্ধ, এমনকি সম্মেলনও। সেদিন ট্রেনটিংহ্যামে যাননি প্রফেসর আর পারকার আঙ্কেল। বাগানে বসে আছেন ইভানফ, আরাম করে আর্মচেয়ারে আধশোয়া হয়ে তন্দ্রা উপভোগ করছেন। ব্যাপারটা কেরিআন্টির নজরে পড়ল। ইশারায় ছেলেমেয়েদেরকে ডেকে নিয়ে বারণ করে দিলেন যাতে হৈ-চৈ না করে। প্রফেসর সাহেবের ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটায়।

ওরা অবাধ্য ছেলেমেয়ে নয়। কথা শোনে। বাগানে আর খেলতেই গেল না। নিঃশব্দে এগোল গেটের দিকে, বাগান পেরিয়ে বাইরে চলে যাবে। গণ্ডগোলটা বাধাল রাফি। কেন যে হঠাৎ প্রফেসরকে অপছন্দ করে বসল কে জানে! তিনি বাগানে বসে ঢুলছেন, বোধহয় এই ব্যাপারটাই পছন্দ হলো না তার। হয়তো তার মনে হলো, লোকটা কি রকম বোকা দেখো! এত সুন্দর রোদ আর বাতাস, আর এই মানুষটা কিনা ঘুমাচ্ছে। তাকে জাগিয়ে দেয়া দরকার। কেউ বাধা দেয়ার আগেই প্রফেসরের পায়ের কাছে গিয়ে ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিল সে, ঘুম ভাঙানোর জন্যে।

জেগে গেলেন প্রফেসর। খুশি তো হলেনই না, ভীষণ রেগে গেলেন। এই প্রথম ইংরেজি ভুলে গিয়ে মাতৃভাষায় গাল দিয়ে উঠলেন। তারপর কষে এক লাথি মারলেন রাফির পেটে।

ব্যথায় কেঁউউ করে উঠল রাফি।

এত দ্রুত ঘটে গেল সমস্ত ব্যাপারটা, চোখের সামনে রাফিকে লাথি খেতে দেখেও কিছুই করার সুযোগ পেল না জিনা। তবে প্রফেসরের এই আচরণে রেগে কাঁই হয়ে গেল সে। দৌড়ে গেল।

ছেলেমেয়েরা গেটের কাছে চলে গিয়েছিল, তাই কাউকেই দেখেননি প্রফেসর, ভেবেছিলেন কুকুরটা একা। তাই লাথিটা হেঁকেছিলেন। নইলে ওরকম করতেন না। জিনা আর তার বন্ধুদেরকে দেখে অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন।

'কিছু মনে কোরো না,' লজ্জিত হওয়ার ভঙ্গি করলেন প্রফেসর। 'ঘুমিয়ে

পড়েছিলাম। হঠাৎ চমকে দিল তো কুকুরটা, মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। না ভেবেই কাজটা করে ফেলেছি।'

কেউ কিছু বলল না। জিনার পা ঘেঁষে দাঁড়াল রাফি। দুই পায়ের ফাঁকে লেজ ঢুকিয়ে ফেলেছে।

লজ্জিত হয়ে কেউ মাপ চাইলে তো আর কিছু বলা যায় না। যেখানে যাচ্ছিল সেখানেই চলল আবার ওরা। সৈকতে নেমে এল। রাগ আর চেপে রাখতে পারল না জিনা। বিস্ফোরিত হলো এবার, 'কাণ্ডটা দেখলে? প্রফেসর করলটা কি? রাফিকে লাথি মারে!'

'মাপ তো চাইলেন,' রবিন বলল। 'আর কি? এর পরেও রাগ করে আছো কেন?'

'রাগি কি আর সাধে! ইচ্ছে করেই মেরেছে! জেগে উঠে ভাবার অনেক সময় পেয়েছে। মনে করেছিল, কেউ নেই, কুকুরটা একা, দিই না একটা লাথি হাঁকিয়ে! ব্যাটা শয়তান!'

'আহ্, জিনা, একজন ভদ্রলোকের সম্পর্কে ওভাবে কথা বলা উচিত না!'

'ভদ্রলোক না ছাই!' ফুঁসে উঠল জিনা।

'হ্যাঁ, ইচ্ছে করেই লাথি মেরেছে,' কিশোরও একমত হলো জিনার সঙ্গে।

প্রতিবাদ করল না কেউ আর। রাফিকে মারায় সবারই খারাপ লাগছে। বসে পড়ে কুকুরটাকে কোলের কাছে টেনে এনে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল জিনা, বেশি ব্যথা লেগেছে কিনা। যেমনই লেগে থাকুক, সেটা বাড়িয়েই দেখাল রাফি। আরও বেশি আদর নেয়ার জন্যে কয়েকবার গুঙিয়ে উঠল। তাতে প্রফেসরের ওপর রাগ আরও বেড়ে গেল জিনার। ধমক দিয়ে বলল, 'যাস কেন? গেছিস বলেই তো মারতে পারল! আর যাবি কখনও লোকের সঙ্গে খাতির করতে?'

রেগে গেল রাফি। গোঁ গোঁ করতে লাগল। জিনার ওপর নয় অবশ্যই, প্রফেসরের ওপর। নির্দেশ পেলেই এখন ছুটে গিয়ে প্রফেসরের পায়ে কামড়ে দেবে। তাকে মারার মজা দেখিয়ে ছাড়বে।

'থাক থাক, হয়েছে!' তার পিঠে চাপড় দিল জিনা। 'এখন ঝগড়া করে লাভ নেই। তবে কথাটা আমি ভুলব না।'

ঘাউ করে যেন কুকুরের ভাষায় আচ্ছা বলল রাফি। বুঝিয়ে দিল, প্রফেসরকে সে-ও ক্ষমা করেনি।

কিশোর বলল, 'আসলেই কাজটা অন্যায় করেছেন প্রফেসর। তাঁর মত এতবড় একজন লোকের এই আচরণ মানায় না। তা-ও যদি তাঁকে ডায়মন্ড হার্টেড বলা না হতো তাহলে এককথা ছিল।'

'একবারও ভাল মানুষ মনে হয়নি আমার তাঁকে,' মুসা বলল। 'তাঁর কথাবার্তা তো শুনেছি। কেবল বদমেজাজীই নন, লোকও ভাল না।'

'হ্যাঁ,' জিনা বলল। 'সেদিন ডলি এল, গাঁয়ের মেয়েটা, আম্মা খবর দিয়েছিল। ঘরটরগুলো সাফ করে দেয়ার জন্যে। তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে বসলেন প্রফেসর। নানান ছলে ধমক দিতে লাগলেন। বেচারী তো ঘাবড়েই গেল। শেষে আর প্রফেসরের সামনেই এল না। আরও আছে। পাশের বাড়ির বেড়ালটা এসেছিল। ওটাকে ঢিল মেরেছিলেন। ভেবেছিলেন, কেউ দেখছে না। তারপর

চোখ পড়ল আমার ওপর। লজ্জা পেয়ে গেলেন।'

'লোকটা বদ এবং শয়তান!' মন্তব্য করে বসল কিশোর। 'আমাদের এসব আলোচনা লোকে শুনলে অবশ্যই খারাপ বলবে। কিন্তু যা দেখছি শুনছি, তাতে এছাড়া আর বলবটাই বা কি? হীরার দিল না লোহার দিল?'

'আয়রন হার্টেড! ভাল শব্দ বের করেছ। হাহ্ হাহ্!' হাসল মুসা। 'তোমার সাথে আমিও একমত। লোকটা ভাল না। যতই দেখছি, আরও খারাপ মনে হচ্ছে। দুই ইভানফকেই।'

সুতরাং সেদিন যখন ডাফ ওদের সঙ্গে খেলতে এল, তাকে আর সহজভাবে নিতে পারল না ছেলেমেয়েরা।

পরদিনের কথা। খেলতে এল সেদিনও ডাফ। কিশোর প্রস্তাব দিল, 'এক কাজ করলে কেমন হয়? জিনা, চলো দ্বীপে চলে যাই। গোবেল আইল্যান্ডে।'

'ভাল বলেছ!' লাফিয়ে উঠল মুসা। 'তাঁবু-টাঁবু নিয়ে কয়েকদিনের জন্যেই চলে যাই। কেরিআন্টি মানা করবেন না, আমি জানি। আবহাওয়া খুব ভাল। ঝড় তুফানের ভয় নেই। দ্বীপেই যাওয়া যাক।'

'দ্বীপ?' আগ্রহী মনে হলো ডাফকে। 'ক্যাম্পিঙে যাবে? নেবে আমাকে?'

'যেতে পারেন,' কিশোর বলল। মুখের ওপর তো আর 'না' বলে দেয়া যায় না।

'দ্বীপটা কেমন? ভাল?'

'দারুণ!' জবাব দিল জিনা। 'বেশি বড় না। তবে ঝর্না আছে, পাহাড় আছে। ছোট সৈকত আছে। আর আছে চমৎকার একটা খাঁড়ি। লুকানো। বাইরের সাগর থেকে দেখা যায় না। একটা প্রণালী দিয়ে যেতে হয়। যারা চেনে শুধু তারাই ঢুকতে পারে। পুরানো একটা ভাঙা দুর্গ আছে, দেখার মত। কতবার ঝড়বৃষ্টির সময় ওখানে ঠাঁই নিয়েছি আমরা। ডাঙা থেকে বেশি দূরে না, অথচ ওখানে গেলে তোমার মনে হবে বহুদূরের এক নির্জন দ্বীপে উঠেছ, রবিনসন ক্রুসোর মত।'

'তাই নাকি? দারুণ তো!' ছেলেমানুষী ভঙ্গিতে বলল ডাফ। কিন্তু অভিনয়টা ধরে ফেলল গোয়েন্দারা। 'কখন রওনা হচ্ছি?'

'আজই,' কিশোর বলল। 'লাঞ্চের পর। খাবার-টাবার রেডি করে দিতে হবে তো আন্টিকে, তাই দেরি হবে। নইলে এখনই যেতে পারতাম।'

বাড়িতে ফিরে এসে মাকে বলল জিনা। বলতেই রাজি হয়ে গেলেন তিনি। তাঁবু আর ক্যাম্প করার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে লাগল ওরা।

বিকেল তিনটেয় লটবহর নিয়ে এসে জিনার নৌকায় উঠল অভিযাত্রীরা। বাতাস থাকলে পাল তুলে দেয়া যেত। নেই। তাই শুধু দাঁড়ের ওপরই ভরসা করতে হলো। তবে তাতে অসুবিধে নেই। তীর থেকে বেশি দূরে নয় গোবেল আইল্যান্ড।

পৌছতে বেশিক্ষণ লাগল না। বালিতে ঢাকা ছোট্ট সৈকতে নৌকাটাকে টেনে তুলল ওরা। এখানে এলে যে জায়গাটায় সব সময় ক্যাম্প করে ওরা, মালপত্রগুলো নিয়ে গিয়ে তুলতে লাগল সেখানে। সবুজ ঘাস, টলটলে পানির ঝর্না, খাড়া চূড়া, ভাঙা দুর্গ, গাছপালা, ঝোপঝাড়, বুনো ফুল, সব কিছু সুন্দর।

একনাগাড়ে প্রশংসা করে যেতে লাগল ডাফ। রাফির এখানে যেন শুধু একটাই কাজ, খরগোশকে তাড়া করে বেড়ানো।

বরাবরের মতই দ্বীপে রান্নার দায়িত্বটা নিয়ে নিল রবিন। তাঁবু খাটাল ছেলেরা। আগুন জ্বালল। ঝর্না থেকে পানি এনে দিল। আর দুর্গের একটা ভাঙা ঘরে নিয়ে গিয়ে খাবার আর অন্যান্য জিনিস সাজিয়ে রাখল জিনা। সব কিছুতেই সাহায্য করল ডাফ। আন্তরিক ভাবেই করল। করতে ভাল লাগছে বোঝাই গেল। এই একটিবার তার কাজকে অভিনয় বলে ভাবতে পারল না গোয়েন্দারা।

রাতের খাবার তৈরি হয়ে গেলে খেতে ডাকল রবিন।

খাওয়া শেষে আগুনের ধার ঘিরে বসল সবাই। শুরু হলো গান বাজনা। মুসা বাজাল মাউথ অরগান, কিশোর গিটার। গান গাইল রবিন আর জিনা। আর আজব আজব গল্প শোনাল ডাফ। রোমাঞ্চকর গল্প, অ্যাডভেঞ্চারের গল্প, হাসির গল্প। অনেক রাত হলো। শুতে যাওয়ার সময়। ছোট একটা তাঁবুতে জিনা একা ঢুকল। আরেকটা তাঁবুতে তিনজন থাকতে পারবে। সমস্যা হলো কে কে থাকবে? কিশোর বলল, সে বাইরে গিয়ে শোবে। মুসা, রবিন আর ডাফই ভেতরে থাক। কিন্তু ডাফ তাতে রাজি হলো না। সে বলল, রাতটা সুন্দর। তা ছাড়া এই দ্বীপে আর আসেনি। রাতটা বাইরে কাটিয়ে আনন্দ পেতে চায়। কাজেই স্লীপিং ব্যাগটা বাইরেই নিয়ে গেল সে।

দেখতে দেখতে যেন ঘুমিয়ে পড়ল পুরো দ্বীপটা। কিন্তু মুসার চোখে ঘুম নেই। কেন আসছে না বুঝতে পারছে না। ডাফের কথা ভাবছে। অস্বস্তি লাগছে তার। রহস্যময় হোক আর যা-ই হোক সে তাদের মেহমান। তাকে ওভাবে বাইরে যেতে দেয়াটা উচিত হয়নি। নাহ্‌ কাজটা খারাপই হয়ে গেল। শেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, সে-ই বাইরে শোবে। ডাফকে জোর করে ভেতরে পাঠাবে।

কতগুলো পাথর স্তূপ হয়ে আছে একজায়গায়। সেখানেই শুয়েছে ডাফ। ভাল জায়গা বেছেছে। সাগরের দিক থেকে জোর বাতাস এলে তার গায়ে লাগবে না। আকাশও দেখা যাবে পরিষ্কার। এগিয়ে চলল মুসা। ব্যাগের কাছে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল। হাত দিয়ে চেপে দেখল ব্যাগ। না, ভুল দেখেনি। ভেতরে নেই ডাফ।

চার

'ঘুম আসছে না বোধহয়,' আপনমনেই বিড়বিড় করল মুসা। 'তাই হাঁটতে গেছে।'

পায়ের আওয়াজ শোনার জন্যে কান পেতে রয়েছে সে, হঠাৎ সৈকতের দিক থেকে একটা শব্দ ভেসে এল। জোরাল নয়। যে করেছে, সে সতর্ক রয়েছে যাতে জোরে না শব্দ হয়ে যায়। ঢালের কিনারে ছুটে গেল মুসা। চাঁদের আলোয় ভালই দেখা যাচ্ছে সব কিছু। অবাক হয়ে দেখল জিনার নৌকাটা আবার পানিতে ভাসিয়েছে ডাফ।

'হুঁ,' ভাবল মুসা। 'পরিশ্রম করতে গেছে, যাতে ঘুম আসে। করুক।' কিন্তু খানিক পরে আরও অবাক হতে হলো তাকে। সোজা তীরের দিকে নৌকা বেয়ে

চলেছে ডাফ।

'বাইরে বোধহয় ঘুম আসছিল না, তাই ঘরে গেছে ঘুমাতে,' নিজেকে বোঝাল মুসা। 'বেশি আরামপ্রিয় আরকি। কেন যে এসব লোক ক্যাম্পিঙে বেরোয়।'

শব্দ শুনে ফিরে তাকাল মুসা। কিশোর এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। 'কি ব্যাপার?'

হাত তুলে নৌকাটা দেখাল মুসা। 'ডাফ। তীরে যাচ্ছে।'

'তীরে যাচ্ছে! আশ্চর্য!'

'এতে আশ্চর্যের কি দেখলে?' মুসা যা বুঝেছে তা-ই বোঝাতে শুরু করল কিশোরকে।

কথা শুনে জিনা আর রবিনও বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। ওদেরও ঘুম ভেঙে গেছে। নীরবে তাকিয়ে রইল নৌকাটার দিকে।

কিশোর বলল, 'বেশি আস্তে চালাচ্ছে। দাঁড় ফেলার ভঙ্গি দেখেছ? সতর্ক রয়েছে। পানিতে যাতে ছপছপ শব্দ না হয়। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে না?'

'কি জানি,' জিনা বলল। 'হয়তো আমাদের ঘুম ভাঙাতে চাইছে না। সব কিছুর মধ্যেই রহস্য খোঁজা একটা স্বভাব হয়ে গেছে তোমার, কিশোর।'

'হয়তো। তবে যাই বলো, ব্যাপারটা আমার কাছে সুবিধের লাগছে না। কোথায় যায়, কি করে, দেখতে হবে। চলো। রবারের ডিঙিটা আছে না, সেটা নিয়েই পিছু নেব।'

নৌকা নিয়ে এলেও ডিঙিটা নিয়ে আসে কিশোর, এখানে এলে। যখন কোনও রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। বাড়তি সতর্কতা। জিনিসটা জিনার বাবার। কিশোর বলাতে চেয়ে নিয়ে এসেছে জিনা। এনে তুলে রেখেছে দুর্গের একটা ঘরে।

পানিতে ডিঙি ভাসানো হলো। দাঁড় ফেলল জিনা আর মুসা। হালকা জিনিস৭ তরতর করে ছুটল।

প্রণালী থেকে বেরোতেই একটুকরো মেঘে ঢাকা পড়ল চাঁদ। একদিক দিয়ে অসুবিধে হলো এতে, ডাফকে স্পষ্ট দেখতে পাবে না। আরেক দিক দিয়ে সুবিধে, ওদেরকেও সে দেখতে পাবে না।

'আরে!' ফিসফিস করে একসময় বলল রবিন, 'জিনাদের বাড়ির দিকে তো যাচ্ছে না!'

'তাই তো!' জিনা বলল।

গতি আরেকটু কমিয়ে দিল মুসা আর জিনা। ডাফকে এগিয়ে যাওয়ার সময় দিল। কিনারে এসে ডিঙি ভেড়াল ওরা, সামনে কিছুদূরে ভিড়িয়েছে ডাফ। ঠিক এই সময় মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ।

'ডাফ গেল কোথায়!' অবাক হয়ে বলল মুসা।

'আস্তে!' হুঁশিয়ার করল কিশোর। 'শুনছ না, পাথরে জুতোর শব্দ! সৈকত থেকে রাস্তায় উঠে যাওয়ার পথটা ধরে হাঁটছে।'

'হ্যাঁ,' রবিন দেখে ফেলেছে। 'ওই তো। ওপরে উঠে গেছে প্রায়।'

'চলো,' কিশোর বলল।

একসারিতে পথ বেয়ে উঠতে শুরু করল গোয়েন্দারা। রাফিকে চুপ থাকার

নির্দেশ দিয়েছে কিশোর, চুপ করেই আছে কুকুরটা। ডাফের এই রহস্যজনক আচরণে সবাই অবাক। নিশুতি রাতে এভাবে তীরে আসার কি দরকার পড়ল তার? আর এভাবে চোরের মত চুপি চুপিই বা চলছে কেন?

ওপরে উঠেই থেমে গেল গোয়েন্দারা। দেখল ডাফ কি করে। এখনও ওদের দিকে পেছন করেই আছে সে। তবে বেশি দূরে নয়। তাড়াতাড়ি একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ার নির্দেশ দিল কিশোর। রাস্তার কিনারে গিয়ে থেমে গেল ডাফ। গোবেল ভিলা তার বাঁয়ে, পাঁচশো মিটার মত দূরে। সেদিকে তাকিয়ে রইল।

'কোনও কিছুর অপেক্ষা করছে,' রবিন অনুমান করল।

'কিংবা কারও জন্যে,' বলল মুসা।

'চুপ!' একসাথে বলে উঠল জিনা আর কিশোর।

রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে আরেকটা কালো জিনিস। এগিয়ে আসতে লাগল। আরেকটু কাছে এলে দেখা গেল একটা মোটর সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে আসছে একজন লোক। আরও কাছে এলে চেনা গেল। প্রফেসর ইভানফ। মোটর সাইকেল ঠেলে এনে হাঁপাচ্ছেন। ফোঁস ফোঁস করে বাতাস ছাড়ছেন মুখ দিয়ে।

কথা বলতে লাগলেন দু'জনে। বাতাস বইছে উল্টো দিকে। ফলে কথাগুলো ভালমত শুনতে পেল না গোয়েন্দারা। যা-ও বা পেল, বুঝতে পারল না। দুর্বোধ্য ভাষা। ভ্যারানিয়ান হতে পারে, ভাবল ওরা। তবে একটা ব্যাপার স্পষ্টই দেখতে পেল, একটা বিশেষ দিকে বার বার হাত তুলছে দু'জনেই, যেন ওদিকটায় কিছু আছে বোঝাচ্ছে।

মোটর সাইকেলের হ্যান্ডেলটা ডাফের দিকে ঠেলে দিয়ে আবার কিছু বললেন প্রফেসর। বার কয়েক মাথা ঝাঁকিয়ে সাইকেলে চড়ে বসল ডাফ। এঞ্জিন স্টার্ট দিল। শক্তিশালী এঞ্জিন। লাফ দিয়ে চলতে শুরু করল মোটর সাইকেল, তীব্র গতিতে ছুটে চলে গেল।

প্রফেসর আবার ফিরে চললেন গোবেল ভিলায়।

'ওদিকে গেল কেন ডাফ?' মুসার জিজ্ঞাসা।

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল, 'ট্রেনটিংহ্যামের দিকে!'

হতাশই হলো গোয়েন্দারা। বেশি কিছু জানতে পারেনি। তবে যেটুকু দেখেছে, তাতেই চিন্তার অনেক খোরাক পেয়ে গেল। রাতের বেলা কেন নির্জন জায়গায় সাক্ষাৎ করতে এল পিতাপুত্র? ডাফ গেল কোথায়? কি করতে বলে দিয়েছেন তার বাবা?

অনেক প্রশ্ন, কোনটারই জবাব নেই। মোটর সাইকেলে করে গেছে ডাফ, কাজেই তাকে অনুসরণ করতে পারেনি গোয়েন্দারা।

'এবার কি?' জিনা জিজ্ঞেস করল। 'ডাফের ফেরার অপেক্ষা করব, না দ্বীপে ফিরে যাব?'

'ফিরে যাব,' কিশোর বলল। 'এখানে থেকে লাভ নেই। কিছু জানতে পারব না। বরং ডাফ ফিরে এসে আমাদের দেখে ফেলতে পারে।'

'হ্যাঁ, ফিরেই যাই,' বেশি হতাশ হয়েছে মুসা। ডাফ কি করতে গেছে দেখতে

পারল না বলে।

দ্বীপে ফিরে আবার স্লীপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকল গোয়েন্দারা। তবে আর ঘুম আসতে চাইল না। কেবলই ঘুরেফিরে মনে আসছে, ডাফ কোথায় কিজন্যে গেল?

অনেক পরে ফিরে এল ডাফ। কিশোর ঠিকই টের পেল। ব্যাগ থেকে বেরিয়ে তাঁবুর কানা ফাঁক করে দেখল, নিঃশব্দে গিয়ে ব্যাগের মধ্যে ঢুকছে ডাফ। রাফিকে মানা করে দেয়া হয়েছে, কাজেই সে কোনও শব্দ করল না।

পরদিন সকালে বেলা করে ঘুম ভাঙল ছেলেমেয়েদের। রোদ চড়ে গেছে। তাদের সাড়া পেয়ে হাসিমুখে ব্যাগের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ডাফ। 'হাল্লো, ঘুম ভাঙল। দারুণ জায়গা! এমন ঘুম ঘুমিয়েছি কিচ্ছু টের পাইনি। সেই যে তোমাদের সঙ্গে ব্যাগের ভেতরে ঢুকলাম, আর একটিবারের জন্যেও ঘুম ভাঙল না।'

এত বড় মিথ্যে কথা! নিজেকে সংযত রাখতে বেগ পেতে হলো ছেলেমেয়েদের। পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল ওরা। ডাফ যেমন মিথ্যুক, তেমনি অভিনেতা।

ওরা যে জেনে ফেলেছে, সেটা বুঝতে দিল না তাকে। নাস্তা তৈরি করতে বসল রবিন। ডিম ভাজল, পাঁউরুটি টোস্ট করল। জিনা কমলার রসের টিন খুলল, গেলাসে গেলাসে ঢেলে দিল রস।

রাতে নৌকা বেয়ে এসেছে সবাই। খিদেটা তাই বেশি। দেখতে দেখতে সাবাড় করে ফেলল সমস্ত খাবার।

সাথে করে তার ছোট পকেট রেডিওটা নিয়ে এসেছে মুসা। চালু করে দিল।

খবর শুনতে শুনতে হঠাৎ থমকে গেল সবাই। বিশেষ করে গোয়েন্দারা।

'গত রাতে,' পড়ে চলেছে সংবাদ পাঠক। 'এক দুঃসাহসী চুরি হয়েছে টেনটিংহ্যামে। যেখানে বৈজ্ঞানিক সম্মেলন হচ্ছে। একজন বিজ্ঞানীর দামী দলিলপত্র খোয়া গেছে। নিজের নাম প্রকাশ করতে চাইছেন না তিনি। শোবার আগে তাঁর দলিল যত্ন করে বিছানার তোষকের নিচে রাখতেন। তাঁর ঘরে ঢুকে, ক্লোরোফর্ম দিয়ে তাকে বেহুঁশ করে, কাগজপত্রগুলো নিয়ে গেছে চোর। তদন্ত চলছে। এখনও কোনও হদিস করতে পারেনি পুলিশ।'

নীরবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল গোয়েন্দারা।

'কাণ্ডটা করল কি!' ডাফও মাথা নাড়তে লাগল।

একসাথে চারজোড়া চোখ ঘুরে গেল তার দিকে। তারপর সরিয়ে ফেলল আবার, ভয়ে, যদি তাদের দৃষ্টি দেখে কিছু সন্দেহ করে বসে ডাফ।

সেদিন সকালে সাঁতার কাটতে কাটতে ডাফ যখন দূরে চলে গেল তখন একা কথা বলার সুযোগ পেল ওরা। পানিতে ভাসানো হয়েছে রবারের ডিঙি। ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে। তাতে বসে আলোচনা চলল।

'খবর তো শুনলাম,' জিনা বলল। 'কাল রাতে চুরি হয়েছে। আর কাল রাতেই টেনটিংহ্যামে গিয়েছিল ডাফ।'

'আর কি মিথ্যে কথাটাই না বলল!' ডাফের ওপর বিরক্ত হয়ে গেছে রবিন। 'সারারাত নাকি নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছে!'

'আর চমৎকার একখান অ্যালিবাই তৈরি করে রেখেছে,' বলল মুসা। 'অবশ্য সেটা ওর ধারণা। ও তো আর জানে না আমরা দেখে ফেলেছি।'

'তাহলে কি দাঁড়াল?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'তাকেই যদি চোর সন্দেহ করি আমরা, ভুল হবে?'

'কিন্তু কেন করবে?' প্রশ্ন তুলল মুসা। 'তার বাবা একজন বিজ্ঞানী। সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছেন। ওই দলিল চুরি করে ডাফের কি লাভ?'

'হয়তো দেখতে চায় কি লেখা রয়েছে। কি জিনিস আবিষ্কার করেছেন ওই বিজ্ঞানী,' রবিন বলল।

'ওভাবে দেখার দরকার কি? সম্মেলনে তো জানানোই হবে। জানানোর জন্যেই তো নিয়ে আসা হয়েছে আবিষ্কারের কাগজপত্র।'

'হয়তো সবাইকে জানাতেন না বিজ্ঞানী,' জিনা বলল।

'সে-জন্যেই প্রফেসর ইভানফ ছেলেকে দিয়ে চুরি করিয়েছেন কাগজগুলো?' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। 'তাঁর মত একজন বিজ্ঞানী আরেকজনের কাগজ চুরি করবেন, এটা ভাবা যায় না। অন্যের আবিষ্কার মেরে দিয়ে নাম কামানোর কোনও প্রয়োজন নেই তাঁর। এমনিতেই তাঁর অনেক খ্যাতি।'

'হুঁম্‌ম্‌!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। 'ভাল একটা কথা বলেছ, মুসা। আসল বিজ্ঞানী হলে চুরি করার কোনও দরকারই হতো না। যেহেতু নকল, সে-কারণেই করেছে। হয়তো যাকে আমরা দেখছি সে কোনও বিজ্ঞানীই নয়, একজন স্পাই।'

বোমা ফাটল যেন নৌকার মধ্যে। অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল সবাই।

'বিজ্ঞানী নয়?' জিনা বলল। 'কিন্তু দুনিয়ার সবাই জানে তিনি বিজ্ঞানী।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'দুনিয়ার সবাই আরও কিছু কথা জানে। প্রফেসর ইভানফের সোনালি চুল, অনেক বড় হৃদয়, আর ষোলো বছর বয়েসী একজন ছেলের বাবা। কিন্তু এ-কাকে দেখছি আমরা? টাক মাথা, ভীষণ বাজে স্বভাব, ছেলের বয়স বাইশ। এমন কিছু কাজ করছে, রহস্যজনক। যে-কারও সন্দেহ জাগাতে বাধ্য। এর মানেটা কি?'

তার দিকে তাকিয়ে রইল অন্য তিনজন। জবাব দিতে পারল না।

এক এক করে সবার মুখের ওপর চোখ বোলাল কিশোর। 'মানেটা বলছি। যতই ভাবছি, ততই সন্দেহ গাঢ় হচ্ছে আমার, প্রফেসর ইভানফ আর তার ছেলে ডাফ, দু'জনেই নকল। আসল বিজ্ঞানী আর তাঁর ছেলের ছদ্মবেশে রয়েছে। টেলিভিশনে আসল দু'জনকে দেখেছিলাম, মনে আছে? কত ভদ্র, কত বিনয়ী। আর জিনাদের বাড়িতে যারা এসেছে তারা? দেখেই বিরক্তি লেগেছে আমার।'

'হুঁ, এখন মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক,' ফিসফিসিয়ে বলল রবিন। 'ইস্‌, বিশ্বাসই করতে পারছি না! এরকম না হলেই ভাল হতো!'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল জিনা। 'কিশোর, এভাবে ভাবিনি। তাহলে তোমার মতই আমরাও আগেই বুঝে যেতাম।'

'আমিও সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিলাম,' মুসা বলল। 'কিন্তু কিছুতেই

বিশ্বাস হচ্ছিল না...'

ঘাউ করে যেন রাফি বলল, 'ঠিক!' তারপর সাগরের দিকে মুখ করে খেকখেক করে উঠল। ঘোষণা করল ছদ্মবেশী ডাফ ইভানফ ফিরে আসছে। মুখের ভাব এমন করে ফেলল গোয়েন্দারা, যেন কিছুই হয়নি। সাধারণ আলোচনা করছে। কিছুতেই বুঝতে দিতে চায় না ডাফকে যে ওকে ওরা সন্দেহ করছে।

সাধারণত কোনও রহস্য পেলে সেটা নিজে নিজে সমাধানের চেষ্টা করে কিশোর। কিন্তু এবারের ব্যাপারটা এতই বিপজ্জনক, নিজে কিছু করার সাহস করতে পারল না। বড়দেরকে বলে পুলিশকে জানানোর সিদ্ধান্ত নিল। ভাবল, সেদিন বিকেলে পারকার আঙ্কেল ফিরে এলেই সব তাঁকে বলবে। সুযোগ মত তার সিদ্ধান্তের কথা অন্যদেরকে জানিয়ে দিল সে।

দুপুর বেলা রবিন বলল, তার ভীষণ মাথা ধরেছে। অসুস্থ বোধ করছে। এটা অবশ্যই মিথ্যে কথা, অভিনয় করতে শিখিয়ে দিয়েছে তাকে কিশোর। গোবেল ভিলায় ফিরে যাওয়ার একটা ছুতো, ডাফের সন্দেহ না জাগিয়ে কাজটা করতে চায় ওরা।

'খুব বেশি!' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল ডাফ।

'তাহলে তো খুব খারাপ কথা,' জিনাও উদ্বেগ প্রকাশ করল। 'বোধহয় সানস্ট্রোক। বেশি রোদে থাকলে হয় এরকম। বাড়ি ফেরা ছাড়া তো আর পথ দেখছি না। আমাদের ক্যাম্পিংটাই মাঠে মারা গেল। রাতে জ্বর উঠে গেলে আর আসা যাবে না এখানে। দূর, কি একটা কাণ্ড হলো!'

এমনই অভিনয় করল ওরা, কিছুই সন্দেহ করতে পারল না ডাফ।

ফেরার পথে নৌকায় একটু পর পরই মাথা টিপে ধরতে লাগল রবিন, উহ্-আহ্ করল, যেন যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে মাথা। প্রচণ্ড গরম পড়েছে, আর রোদটাও কড়া, সত্যি সত্যি সানস্ট্রোক হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

রোগের কথা শুনে কেরিআন্টিও উদ্বিগ্ন হলেন। ঠাণ্ডা শরবত খাইয়ে সোজা পাঠিয়ে দিলেন শোবার ঘরে। কিশোর বলল, সে গিয়ে রবিনের কাছে বসে থাকবে। তাকে সঙ্গ দেবে। জিনা আর মুসা চলে গেল বই পড়তে। অন্তত মুখে তা-ই বলে গেল। আসলে ডাফের কাছে আর একজনও থাকতে চাইছে না। বেফাঁস কিছু করে ফেলার ভয়ে।

বাকি দিনটা বড় বেশি দীর্ঘ মনে হলো ওদের কাছে। সময় আর কাটতেই চায় না। কখন বিকেল হবে, পারকার আঙ্কেল আসবেন, কেবল তার অপেক্ষা। রাফিও ওদের সঙ্গে ঘরে বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

অবেশেষে ইভানফকে নিয়ে ফিরলেন পারকার আঙ্কেল। দু'জন একসাথেই থাকলেন। আলাপ যেন আর শেষ হতে চায় না। বিকেলের চা পর্ব শেষ হলো, রাতের খাওয়া শেষ হলো। ছেলেমেয়েরা আশা করল, এবার কথা বলা যাবে। গেল না। স্টাডিতে গিয়ে ঢুকলেন দুই দু'জনে।

তারপর যখন হালই ছেড়ে দিতে বসেছে ছেলে-মেয়েরা, সেই সময় স্টাডি থেকে বেরোলেন ইভানফ। চলে গেলেন শোবার ঘরে। ডাফ আগেই গিয়ে ঢুকেছে তার ঘরে।

আস্তে করে এসে পারকার আঙ্কেলের স্টাডির দরজার সামনে দাঁড়াল গোয়েন্দারা। দরজায় টোকা দিল কিশোর। অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেন তিনি। এই সময়টায় নাকি তাঁর মাথা বেশি খেলে। কেউ কথা বলতে এলে বিরক্ত হন।

'কে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আমি, কিশোর। জিনা, রবিন, মুসা আর রাফিও আছে।'

'এত রাতে কি দরকার তোমাদের? এখনও শোওনি কেন?'

'জরুরী কথা আছে, আঙ্কেল! একটু খুলুন!'

দরজা খুলে দিলেন পারকার আঙ্কেল। ভুরু কুঁচকে গেছে। প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, 'ফালতু কথা বলতে এলে...'

'আস্তে, আঙ্কেল, আস্তে বলুন! ওরা শুনে ফেলবে! কথাটা খুব জরুরী!'

পাঁচ

ঢুকেই আর তর সইল না রবিনের। গড়গড় করে উগড়ে দিল, 'আঙ্কেল, প্রফেসর ইভানফ, টাক মাথা। তার ছেলের বয়েস বাইশ। আর রাতের বেলা মোটর সাইকেল নিয়ে টেনটিংহ্যামে গিয়েছিল।'

ভুরু আরও কুঁচকে গেল পারকার আঙ্কেলের। 'সত্যিই সানস্ট্রোক হয়েছে তোমার, রবিন, সেজন্যেই প্রলাপ বকছ।'

'না, আমার কিছুই হয়নি!'

'তাহলে এসব কি বলছ?'

'ঠিকই বলেছে, আব্বা,' জিনা বলল। 'সরো, আগে ভেতরে ঢুকি। সব বলি। তাহলেই বুঝতে পারবে।'

বলতে শুরু করল ছেলেমেয়েরা। উত্তেজিত হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। একজন কথা শেষ না করতেই আরেকজন লুফে নিয়ে বাকিটা শুরু করে দিচ্ছে। প্রথমে 'ঠিক না, ঠিক না' করলেও শেষ দিকে এসে আর অবিশ্বাস করতে পারলেন না পারকার আঙ্কেলও।

'কি করতে বলো তাহলে?' অবশেষে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'তোমরা বলছ দু'জনেই ছদ্মবেশী, মূল্যবান কাগজ চুরি করেছে, স্পাই। কি বলছ বুঝতে পারছ? ভুল হলে কি সাংঘাতিক বেকায়দায় পড়তে হবে? কোনও প্রমাণ নেই তোমাদের হাতে।'

'কিন্তু জোগাড় করতে পারি,' কিশোর বলল। 'একটা ফাঁদ পেতে তাতে কিছু রসাল টোপ রাখলেই হলো। তারপর কাজটা যখন করতে যাবে, হাতেনাতে ধরে ফেলব।'

'জিনা,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন পারকার আঙ্কেল, 'তোর মাকে ডেকে নিয়ে আয় তো। আলোচনা করা দরকার। এরকম একটা ব্যাপার, একা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।'

স্টাডির দরজা বন্ধ করে নিচু গলায় অনেক রাত পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে

আলোচনা করলেন দু'জনে। দরজার বাইরে পাহারায় রইল রাফি। কাউকে আসতে দেখলেই হুঁশিয়ার করে দেবে। যেন একটা যুদ্ধ বৈঠক বসল।

সবাই কথা বলতে পারল মন খুলে, যার যা মাথায় এল। সেটা নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখা হলো।

অবশেষে অনেক চিন্তাভাবনা করার পর একটা পরিকল্পনা ঠিক করল কিশোর। ঠিক হলো, পরদিন সন্ধ্যায় সার্কাস দেখতে যাবে সবাই। একটা সার্কাস পার্টি এসেছে তখন ওই অঞ্চলে। ইভানফ আর ডাফকেও আমন্ত্রণ জানানো হবে সার্কাসে যাওয়ার জন্যে, কেরিআন্টিই সেটা করবেন। যাওয়ার ইচ্ছে থাকলে খুশি হয়েই যেতে চাইবেন প্রফেসর আর ডাফ। কারণ ভ্যারানিয়া এমন একটা রাজ্য, যেখানে আমোদ-প্রমোদের তেমন ব্যবস্থা নেই। ভ্রাম্যমাণ সার্কাসও নেই। এসব সার্কাস-টার্কাসে যাওয়াটা পারকার আঙ্কেলের জন্যে একটা যন্ত্রণা, তবু রাজি হলেন। সবাই বেরিয়ে গেলে খালি হয়ে যাবে গোবেল ভিলা। এবং এই খালি হওয়ার ওপরই নির্ভর করছে কিশোরের সমস্ত পরিকল্পনা।

ডবিমুর থানায় টেলিফোন করলেন পারকার আঙ্কেল। অনেকক্ষণ ধরে কথা বললেন শেরিফ জিংকোনাইশানের সঙ্গে। ছেলেমেয়েদের সন্দেহ ঠিক হলে আর নকল প্রফেসর টোপ গিললে, তাঁকে ধরাটা তখন কঠিন হবে না।

পরদিন। সকালটাই যেন আর কাটতে চায় না, বাকি দিন তো পড়েই রয়েছে। দুপুরে ওরা খেয়ে ওঠার পর পরই চলে এলেন পারকার আঙ্কেল, ইভানফকে নিয়ে, কারণ সেদিন শনিবার। সম্মেলন অর্ধেক বেলার পরেই ছুটি।

খেতে বসলেন দু'জনে। আশেপাশেই রইল ছেলে-মেয়েরা। খেতে খেতে পারকার আঙ্কেল বললেন, 'প্রফেসর, একটা কথা। এতদিন বলিনি, তার কারণ আছে। ভেবেছি, শেষ হোক, তার পরেই বলব। যদি সফল হতে না পারি? কিন্তু এখন হয়েছি। কাল অনেক রাত পর্যন্ত খেটে শেষ করেছি। তবে ছোটখাট আরও কিছু কাজ সারতে হবে। সোমবারে সম্মেলনে আবিষ্কারটা নিয়ে আলোচনা করব ভাবছি। আর এমাসের শেষের দিকেই পেটেন্ট তৈরি করে ফেলতে পারব।'

খুব যেন মন দিয়ে বাবার কথা শুনছে জিনা, এমন ভঙ্গিতে বলল, 'তুমি যে বললে সোমবারে বলবে? আগেই বলে ফেলাটা রিস্কি হয়ে যাচ্ছে না? শুনেছি বিদেশী গুপ্তচরেরা বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের পেছনে লাগে, ফরমুলা চুরি করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।'

কথাটাকে হেসেই উড়িয়ে দিলেন যেন পারকার আঙ্কেল। 'বেশি টিভি দেখে আর থ্রিলার পড়ে ওই অবস্থা হয়েছে তোমার। বাস্তবে ওসব কমই ঘটে। আর যদি ঘটেই আমার ভয়ের কিছু নেই। আলমারিতে তালা দিয়ে রেখে দিয়েছি। আবিষ্কারটা যে করেছি তাই বা জানছে কে?'

'কি আবিষ্কার করেছ, আব্বা? কাজটাজ হবে কিছু?'

'হবে মানে? তৈরি করে বাজারে ছাড়তে পারলে কোটিপতি হয়ে যাওয়া যাবে।'

তাঁর আবিষ্কারকে স্বাগত জানালেন প্রফেসর ইভানফ। বললেন, 'আশা করি আপনার এই আবিষ্কারে আমার দেশেরও উপকার হবে।' ডাফের দিকে তাকালেন

একবার তিনি। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল কিছু, সেটা গোয়েন্দাদের নজর এড়াল না, বিশেষ করে কিশোরের।

ফাঁদ পাতা হয়ে গেছে। আর এখানে বসে থাকার দরকার নেই। বন্ধুদের নিয়ে বাগানে বেরিয়ে এল সে।

'যাক, টোপ ফেলা হয়ে গেল,' মুসা বলল। 'এখন গিললেই হয়।'

'গিলেছে বলেই তো মনে হলো,' বলল জিনা। 'আবিষ্কারটার কথা শুনে বাপবেটার চেহারা কি হলো দেখলে না?'

'দেখলাম তো।'

'তবে আমার এখনও সন্দেহ আছে,' কিশোর বলল। 'ওরা গুপ্তচর। আর বোকা লোক গুপ্তচর হতে পারে না। যদি কোনভাবে টের পেয়ে যায়, ওদের জন্যে ফাঁদ পাতা হয়েছে, ধারেকাছে আসবে না আর।'

'তা পারবে বলে মনে হয় না,' মুসা বলল। 'এত সহজ ভাবে বললেন পারকার আঙ্কেল, আমি যে জানি সব, তবু আমারই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল।'

'তা বটে।'

'কোন ফাঁকি দিয়ে সার্কাস থেকে বেরোয় দু'জনে,' হেসে বলল রবিন, 'আমার দেখার খুব কৌতূহল হচ্ছে।'

'বেরোলে দেখতে পাবি,' কিশোর বলল। 'ইচ্ছে থাকলে ছুতো একটা তৈরি করেই নেবে।'

'কিন্তু, যদি লোকটা আসল হয়,' মুসা বলল। 'আর আমাদের সন্দেহ মিথ্যে হলে, বড় একটা ধাক্কা খেতে হবে। আমাদের ওপর ভীষণ রেগে যাবেন পারকার আঙ্কেল।'

'কি ঘটে, দেখাই যাক না,' জিনা বলল। 'আগেই এত হতাশ হওয়ার দরকার কি।' বড় মাঠে বিশাল তাঁবু টানিয়ে সার্কাস দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। বড়রা গেলেন গাড়িতে করে, আর ছেলেমেয়েরা সব সাইকেলে। বিকেলের শুরুটা বেশ ভালই লাগল ওদের কাছে। টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকল সবাই। সার্কাস শুরু হলো। ফাঁদ যে পেতে এসেছে সার্কাস দেখতে দেখতে সেকথাই ভুলে গেল গোয়েন্দারা।

একটা করে খেলা শেষ হয় আর হাততালিতে ফেটে পড়ে দর্শকরা। আরেকটা শুরু হলে আবার রুদ্ধশ্বাস হয়ে যায়। এমনি করে চলল। প্রফেসর ইভানফও যেন একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে গেলেন। খেলা দেখছেন। তার ভাবভঙ্গি দেখে এখন লজ্জাই পাচ্ছে রবিন, এমন একজন ভাল মানুষকে মিথ্যে সন্দেহ করেছে ভেবে।

'এই ভাঁড়গুলোকে দেখেছেন!' হাসতে হাসতে কেরিআন্টির দিকে ফিরে বললেন প্রফেসর। 'হাসাতে হাসাতেই মেরে ফেলবে। ভ্যারানিয়ায় এরকম থাকলে ভালই হতো, মাঝে মাঝে সময় কাটানো যেত।'

কিশোরের কানে কানে বলল মুসা, 'বেশ উপভোগই করছে মনে হয়। কই, যাচ্ছে তো না?'

'আরে দাঁড়াও না। শেষ তো হয়ে যায়নি এখনও।'

শো'র প্রথম অর্ধেক শেষ হলো। বিশ্রামের সময় উঠে গেল ডাফ, সবার জন্যে

আইসক্রীম কিনে আনতে। সেগুলো নিতে দ্বিধা হলো ছেলেমেয়েদের, কারণ ওকে আর এখন পছন্দ করে না ওরা। তবু নিতে হলো সন্দেহ না জাগানোর জন্যে। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন তার বাবা। বললেন, 'ভাল লাগছে না! হঠাৎ শরীরটা কেমন খারাপ হয়ে গেল! হবেই। কাল অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেছি। বয়েস হয়েছে তো, রাত আর জাগতে পারি না।' পারকার আঙ্কেল আর কেরিআন্টিকে বললেন, 'আপনারা কিছু মনে না করলে আমি যাই। শুয়ে থাকব।'

'একা যাবেন?' উদ্বিগ্ন হলেন আন্টি। 'আমরা আসি। বাচ্চারা দেখুক।'

'না না,' তাড়াতাড়ি বললেন প্রফেসর, 'দরকার নেই। আপনাদের আনন্দ কেন মাটি করব। আপনারা দেখুন।'

'চলুন তাহলে,' আঙ্কেল বললেন, 'গাড়িতে করে দিয়ে আসি।'

এতে আর অমত করলেন না প্রফেসর। বেরিয়ে গেলেন দু'জনে। মুসার গায়ে খোঁচা মারল কিশোর। রবিন আর জিনাও তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে। চোখ টিপল কিশোর।

ভালই একটা ছুতো বের করেছেন প্রফেসর। ফিরে গেছেন গোবেল ভিলায়। একেবারে একা থাকবেন কিছুক্ষণ। স্টাডিতে ঢুকে ফরমুলা চুরি করার যথেষ্ট সময় পাবেন।

ফিরে এলেন পারকার আঙ্কেল। ছেলেমেয়েদের দিকে তাকালেন, তারপর ফিরলেন স্ত্রীর দিকে। চাহনিতেই যা বোঝানোর বুঝিয়ে আবার সীটে বসে পড়লেন। যেভাবে যা পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেভাবেই ঘটছে সব।

শো'র দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হলো। প্রথমবারের চেয়ে এবার ভাল ভাল খেলাগুলো দেখানো হলেও তাতে মন দিতে পারল না গোয়েন্দারা। ওরা শুধু কল্পনা করার চেষ্টা করছে, ওই মুহূর্তে কি ঘটছে গোবেল ভিলায়?

বাড়ির চারপাশে পুলিশ লুকিয়ে থাকবে। শেরিফ আলবার্তো জিংকোনাইশান তা-ই বলেছেন পারকার আঙ্কেলকে। নজর রাখবে স্টাডির ওপর। প্রফেসর সেখানে ফরমুলা চুরি করতে ঢুকলেই ধরে ফেলবে।

কেরিআন্টি আর পারকার আঙ্কেল রিঙের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁদেরও মন নেই ওখানে। বার বার দরজার দিকে তাকাচ্ছে ছেলেমেয়েরা। আশা করছে, যে কোনও মুহূর্তে হাসিমুখে ঢুকবে পুলিশ, খবর জানানোর জন্যে।

তাদের এই পরিবর্তনটা চোখে পড়ে গেল ডাফের। উসখুস করছে কেন ওরা জিজ্ঞেসও করে বসল। হ্যাঁ-না বলে কোনমতে একটা দায়সারা জবাব দিয়ে দিল কিশোর।

তারপর মুসার কানে কানে বলল, 'আর ফিরে তাকাবে না কোনদিকে। বুঝে ফেলবে।'

কিন্তু বোধহয় বুঝেই ফেলেছে ডাফ। স্থির চোখে তাকিয়ে রয়েছে রবিনের দিকে, আড়চোখে সেটা দেখে ফেলল জিনা। শুধু রবিনই নয়, সবার দিকেই তাকাল ডাফ। ষোলো বছরের খোলস খসে পড়েছে। কুৎসিত হাসি ফুটেছে মুখে। হাসিখুশি খেলার সাথী নয়, বিপজ্জনক লাগছে এখন তাকে।

পরিবেশ যে বদলে গেছে, একমাত্র রবিনই টের পায়নি। সে এখনও দরজার

দিকে তাকাচ্ছে। শেষে সেটা ধামাচাপা দেয়ার জন্যে কিশোরকে বলতেই হলো, 'এই, এত দরজার দিকে তাকাও কেন? সার্কাস দেখতে এসেছ, দেখো। আইসক্রীম পরেও কিনে দেয়া যাবে। এখানে কি আর ফেরিওয়ালা ঢুকবে নাকি?'

হুঁশিয়ারি বুঝতে পারল রবিন। সতর্ক হলো। রিঙের দিকে ফিরল আবার। কিন্তু লাল হয়ে গেছে মুখ। তবে ডাফের উদ্বেগ কাটল যেন। আবার স্বাভাবিক হয়ে এল তার চেহারা।

আরও নিশ্চিত হয়ে গেল গোয়েন্দারা, ডাফ আর প্রফেসর ইভানফ আসল নয়। তাহলে ওরকম আচরণ করত না ডাফ। কিন্তু পুলিশ এখনও আসছে না কেন? এতক্ষণে তো প্রফেসরকে গ্রেপ্তার করে ফেলার কথা। এসে ডাফকে ধরার কথা।

শেষ হলো শো। দরজার দিকে এগোলেন পারকার আঙ্কেল, কেরিআন্টি, ডাফ আর ছেলেমেয়েরা। সুন্দর একটা সন্ধ্যা। বাইরে পরিষ্কার রাত। ঝকঝকে তারা। কথা বলতে বলতে, বেশির ভাগই সার্কাসের প্রশংসা করতে করতে এদিক ওদিক রওনা হয়ে যেতে লাগল দর্শকেরা।

ভিড় কমে যেতেই সার্কাসের ক্যারাভানের পেছন থেকে বেরিয়ে এল তিনজন ইউনিফর্ম পরা লোক। তাদের একজন শেরিফ জিংকোনাইশান। এগিয়ে এলেন পারকার আঙ্কেলের কাছে। শান্তকণ্ঠে বললেন, 'ঠিকই সন্দেহ করেছিল ওরা। ধরেছি! অনেক বড় বড় কথা বলল অবশ্য।' ডাফের দিকে ফিরলেন তিনি। 'এই শোনো, তোমাকে অ্যারেস্ট করা হলো।'

দু'জন কনস্টেবলের দিকে ফিরে ইশারা করলেন তিনি। ডাফের দিকে এগোল ওরা।

কেঁপে উঠল ছেলেমেয়েরা। তাহলে সব সত্যি! এতদিন ভয়ংকর দু'জন স্পাইয়ের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হয়েছিল ওরা!

এতটা দ্রুত নড়ে উঠবে ডাফ, আশা করেনি কনস্টেবলেরা। ওরা ভেবেছে, গ্রেপ্তারের কথা শুনেই স্তব্ধ হয়ে যাবে সে। দাঁড়িয়ে থাকবে চুপচাপ। কিন্তু মোটেও তা করল না ডাফ। লাফ দিয়ে উঠে ছুটতে শুরু করল। চোখের পলকে ক্যারাভানের পাশ ঘুরে দৌড় দিল বনের দিকে। মাঠটা পেরোতে পারলেই ঘন বন।

'গেল! গেল!' চিৎকার করে উঠল জিনা। 'ওই বনে ঢুকতে পারলে আর ধরা যাবে না!'

ঠিকই বলেছে সে। কোনমতে বনে ঢুকতে পারলে অন্ধকারে গা ঢেকে চলে যাবে মেইন রোডে। একটা গাড়িটাড়ি থামিয়ে লিফট নিয়ে চলে যাবে শহরে। কিংবা বন পেরিয়ে স্টেশনে চলে যাবে। মালগাড়িতে লুকিয়ে উঠে চলে যেতে পারবে যেখানে খুশি। কিশোর, মুসা, রবিন, জিনা, সবাই ভাবতে লাগল এসব কথা। অনেক সিনেমা দেখেছে ওরা। গুপ্তচরেরা কি করে জানে।

দাঁড়িয়ে নেই পুলিশেরা। ডাফকে ধরার জন্যে দৌড় দিয়েছে তারাও। পারকার আঙ্কেলও তাদের পেছনে ছুটলেন। কেরিআন্টি হাঁটতে শুরু করলেন গাড়ির দিকে। গাড়িতে অপেক্ষা করবেন। আশা করলেন ছেলেমেয়েরাও তার পেছনে যাবে। ভুল করলেন তিনি। ওরা গেল না।

ডাফের ছুটন্ত মূর্তিটার দিকে হাত তুলল কিশোর। চাঁদের আলোয় দেখা

যাচ্ছে বনের দিকে দৌড়ে চলেছে সে। রাফিকে আদেশ দিল, 'ধর, রাফি, ধর!'

একটা কথাই যথেষ্ট। একবার মাত্র ঘাউ করে উঠেই ছুটে বেরিয়ে গেল তীরের মত। তার পেছনে দৌড় দিল কিশোর। মুসা, রবিন, আর জিনাও কি আর দাঁড়ায়। ওরাও ছুটল।

মাঠটা উঁচুনিচু। জায়গায় জায়গায় ফাটল, গর্ত, তার ওপরে রয়েছে ঝোপ। ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পাথর। ডাফ ছুটছে বাঁচার জন্যে, কাজেই এসব বাধার পরোয়া করল না সে। জানে থামলেই ধরা পড়বে। কিন্তু যারা পিছু নিয়েছে, তারা এসব বাধা দেখেই চলছে, ফলে গতি গেল কমে। রাফি বাদে।

'যা, রাফি!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। 'ধর! পালাতে দিবি না!'

কিশোরের কথা শুনে গতি আরও বাড়িয়ে দিল রাফি।

বনের কিনারে পৌঁছে বাঁচার শেষ চেষ্টা করল ডাফ। লাফ দিয়ে দিয়ে গিয়ে পৌঁছল গাছের কাছে। কিন্তু দেরি করে ফেলল। ধরে ফেলল তাকে রাফি।

ঝাড়া দিয়ে ছোটার চেষ্টা করল ডাফ। পারল না। কামড়ে ধরে রাখল কুকুরটা। একেবারে নাছোড়বান্দা।

পুলিশ আর কিশোর যখন তার কাছে পৌঁছল, তখনও কামড় ছোটানোর চেষ্টা করে চলেছে ডাফ।

অবশেষে তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হলো।

ধরা পড়ে কেউটে সাপের মত ফুঁসতে লাগল ডাফ।

চাঁদের আলোয় চকচক করছে রাফির চোখ। ঘনঘন তাকাচ্ছে জিনার দিকে। এরকম একটা কাজ করতে পেরে যেন গর্বিত। পুরস্কার চায়। আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল জিনা।

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়ালেন পারকার আঙ্কেল আর অন্য তিন গোয়েন্দা। সবাই রাফির প্রশংসা করতে লাগল।

গোবেল ভিলায় ফিরে এল দলটা। সেখানে রয়েছে আরেক বন্দি, প্রফেসর ইভানফ। পুলিশ ঘিরে রেখেছে তাকে। ডাফকে দেখল হাতকড়া পরা অবস্থায়। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল পারকার আঙ্কেল আর পুলিশের দিকে।

কটেজের সিটিং রুমে এসে বসল সবাই।

ছেলেমেয়েদের প্রশংসা করে শেরিফ বললেন, 'একটা কাজের কাজ করেছ তোমরা। চমৎকার ফাঁদ পেতেছিলে।' পারকার আঙ্কেলের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি নামিয়ে দিয়ে যাওয়ার পরই স্টাডিতে ঢুকল। আলমারি খুলে কাগজপত্র বের করে সেগুলোর ছবি তুলতে লাগল। এই সময় ধরলাম।'

'একেবারে হাতেনাতে,' মুসা বলল, 'বমাল।'

'হ্যাঁ, বমাল,' হাসলেন শেরিফ। 'তবে মাল নিয়ে পালাত না, মালের ছবি নিয়ে যেত। তোমাদের চালাকির জন্যেই পারল না। কাল আদালতে নিয়ে যাব।'

'কি বিচার হলো আমরা জানতে পারব তো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'নিশ্চয়ই।'

সেদিন ছেলেমেয়েদেরকে বেশি রাত করতে দিলেন না পারকার আঙ্কেল, জোর করে তাড়াতাড়ি বিছানায় পাঠালেন। আগের রাতে ভালমত ঘুমায়নি ওরা,

তার আগেরও কয়েক রাত একই কাজ করেছে। এভাবে রাত জাগলে শরীর খারাপ হতে বাধ্য।

তবে বিছানায় শুয়েও ঘুমাতে দেরি হলো ওদের। উত্তেজনায়। কি একখান অ্যাডভেঞ্চারই না গেল, সেই উত্তেজনা।

পরদিন সকালে আবার খারাপ লাগতে লাগল। উত্তেজনা না থাকায়। করারও কিছু নেই। গত কয়েকটা দিন একটা কাজ ছিল, আজ শুধুই বসে থাকা, আর অপেক্ষা করা, আদালত থেকে কি খবর আসে শোনার জন্যে। কাজে বেরোলেন পারকার আঙ্কেল, বিকেলের আগে ফিরবেন না। আর তিনি না ফিরলে খবরও জানা যাবে না।

দুপুরের পর পরই ফিরে এলেন তিনি।

দৌড়ে গেল ছেলেমেয়েরা।

'কি খবর?' জানার জন্যে আর তর সইছে না কিশোরের।

'খবর ভালই,' জানালেন পারকার আঙ্কেল। 'তোমাদের সহায়তায় দুটো শয়তান স্পাইকে আটক করতে পেরেছে পুলিশ। ওরা প্রফেসর ইভানফ আর তাঁর ছেলে নয়। আসল নাম জোরেক আর ডাউনিল। মধ্য ইউরোপেরই লোক, ইভানফদের মত। আসল প্রফেসর আর তাঁর ছেলে আমেরিকায় এসে এয়ারপোর্টে ঠিকই পৌঁছেছিলেন, কিন্তু পথে তাঁদেরকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায় গুপ্তচরদের একটা দল। একটা ইনডিপেনডেন্ট অরগানাইজেশন।'

'তারমানে,' জিনা বলল, 'নিজের দেশের হয়ে কাজ করছে না ওরা?'

'না।' বুঝিয়ে বললেন পারকার আঙ্কেল, 'ওরা কিছু লোক মিলে একটা দল গড়েছে। বিভিন্ন দেশের লোক রয়েছে তাতে। মূল্যবান খবর আর দলিল জোগাড় করাই ওদের কাজ। তারপর সেসব চড়া দামে বিক্রি করে। কেনার লোকের অভাব হয় না।'

'সাংঘাতিক ব্যাপার!' মুসা বলল। 'এসব শুধু সিনেমাতেই দেখেছি। বাস্তবেও যে ঘটে, বিশ্বাস করতাম না। ইন্টারন্যাশনাল স্পাই রিঙ!'

'হ্যাঁ। নিজেদেরকে চেক বলে পরিচয় দেয় ওরা। শব্দটা ধার নিয়েছে দাবা খেলার সময় খেলোয়াড়েরা যে "চেক" বলে সেটা থেকে।'

'তা তো বুঝলাম!' কিশোর জিজ্ঞেস করল। 'কিন্তু আসল ইভানফরা এখন কোথায়?'

ছয়

'আসল ইভানফরা?' পারকার আঙ্কেল বললেন, 'নিয়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে চেকরা। এখন তো জানাজানি হয়ে গেছে, আর রাখতে সাহস পাবে না। ছেড়ে দেবে। যে কোনও মুহূর্তে তাঁরা হাজির হয়ে যেতে পারেন।'

'কিন্তু ওদের ছদ্মবেশ নিয়ে এখানে কেন এসেছিল জোরেক আর ডাউনিল?'

জানতে চাইল রবিন।

'ভাল প্রশ্ন,' হাসলেন পারকার আঙ্কেল। 'বড় একজন বিজ্ঞানীর ছদ্মবেশে এসেছিল সম্মেলনে ঢোকার জন্যে। তাহলে কি কি আলোচনা হয় সব জানতে পারবে। কার কাছে মূল্যবান কি কাগজপত্র আছে জেনে হয় সেগুলো চুরি করত, নয়তো ছবি তুলে নিত। তারপর সেগুলো বিক্রি করত।'

'মস্ত বড় ঝুঁকি নিয়েছে,' মন্তব্য করল মুসা। 'এতবড় একজন বিজ্ঞানীর ছদ্মবেশ নিতে গিয়েই ভুলটা করল, সহজেই নজরে পড়ে গেল আমাদের। ছোটখাট কারও নিলে এত সহজে হয়তো পড়ত না।'

'যতটা ভাবছ ততটা ঝুঁকি কিন্তু ছিল না আসলে। জোরেক আর ডাউনিল মধ্য ইউরোপের কোনও দেশ থেকে এসেছে। ভ্যারানিয়া হতে পারে, তার পাশের দেশটাও হতে পারে, পুলিশ এখনও শিওর নয়। যাই হোক, ভ্যারানিয়ার ভাষা জানে স্পাইগুলো, দেশটাও চেনে। আমার সঙ্গে অনেক আলাপ করেছে। খুব বুদ্ধিমান লোক জোরেক। প্রফেসর ইভানফের ছদ্মবেশ নেয়া খুব একটা কঠিন ছিল না তার জন্যে। কারণ, প্রফেসর কম কথা বলেন, গম্ভীর হয়ে থাকেন, বয়স্ক লোক, কারও সঙ্গে মেশেন না। এরকম লোকের ছদ্মবেশ নেয়াই তো সুবিধে। ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম।' ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন পারকার আঙ্কেল। 'তবে তোমাদেরকে আন্ডারএস্টিমেট করে ফেলেছিল। গুরুত্ব দেয়নি। ভাবতেই পারেনি তোমরা গোয়েন্দা। অনেক অপরাধীকে নাকানি-চোবানি খাইয়েছ, যেসব সামান্য সূত্র থেকে তাদেরকে ধরেছ, সেটা তো অনেক বড় গোয়েন্দার কাজ। উইগ একটু সরে গিয়ে ছোটবড় হলো কপাল, আর সেটাও তোমাদের নজর এড়াল না। আরেকজন মুখ ফসকে বয়সের ব্যাপারে একটা গোলমাল করে ফেলল, তোমাদের কান এড়াল না।' আবার হাসলেন তিনি। 'এতগুলো বুদ্ধিমান গোয়েন্দাকে কি করে ফাঁকি দেবে ওরা? তা ছাড়া রয়েছে রাফির মত একটা কুকুর। পাকড়াও করে তারপর ছাড়ল। আসলে গুপ্তচরগিরি করতে ভুল জায়গায় চলে এসেছিল ওরা।'

প্রশংসায় বুক ফুলে গেল গোয়েন্দাদের।

'সব ভাল যার শেষ ভাল,' মাথা দুলিয়ে বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বলল জিনা।

দ্বিতীয় পর্ব

হাসলেন পারকার আঙ্কেল। 'হ্যাঁ। তবে শেষ হয়নি এখনও। প্রফেসর ইভানফ আর তাঁর ছেলে ভালয় ভালয় মুক্তি না পেলে হবেও না। স্পাইগুলোর মুখ খোলাতে সময় লাগবে পুলিশের। তবে ছাড়বে না। অনেক কিছুই বলে ফেলেছে ওরা। বাকিটুকুও বলে ফেলত। পারছে না সহকর্মীদের ভয়ে। যদি তারা প্রতিশোধ নিতে আসে? আর স্পাইদের প্রতিশোধ একটাই, বিশ্বাসঘাতককে খুন করে ফেলা।'

শিউরে উঠল রবিন।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ এলাকায় লুকিয়েছে, তা কি বলেছে?'

'বলেছে। আমাদের এই এলাকাতেই। পুলিশ ধারণা করছে, পুরানো কোরি ক্যাসলের কাছাকাছিই রয়েছেন প্রফেসর আর তাঁর ছেলে। পুরানো দুর্গটার কোনও

পাতাল ঘরেও থাকতে পারেন। অনেক পুরানো বিল্ডিং। ভেঙেচুরে গেছে বহু জায়গায়। শেরিফ বলেছেন প্রফেসর আর ডাফের খোঁজ পেলেই ফোন করে জানাবেন আমাকে।'

'এত সময় লাগছে কেন তাহলে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'পুলিশ যদি ধারণাই করে থাকে, দলবল নিয়ে গিয়ে বের করে নিয়ে এলেই হয়।'

'জোরেক আর ডাউনিলের মুখ থেকে কথা বের করতেই তো অনেক সময় লেগে গেছে। বেশি তাড়াহুড়া করছে না, করলে যদি সন্দেহ করে ফেলে জোরেকের দলের অন্য লোকেরা। সরিয়ে ফেলে প্রফেসরকে। তাই আঁটঘাট বেঁধে কাজে নামবে পুলিশ। প্রফেসর আর ডাফের ওপর যাতে জীবনের হুমকি আসতে না পারে।'

'হুঁ, তাহলে তো ভাবনারই কথা। ভালয় ভালয় বেরিয়ে এলে তবে শান্তি।'

এই সময় বাজল টেলিফোন।

'নিশ্চয় শেরিফ!' বলে উঠে গেলেন পারকার আঙ্কেল। 'এখুনি গিয়ে প্রফেসরকে নিয়ে আসতে হবে আমার। যাই, দেখি, কি বলেন।...হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ...বলছি...'

হঠাৎ হাসি মিলিয়ে গেল তাঁর। কুঁচকে গেল ভুরু।

'কি হয়েছে, আব্বা?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'চুপ করো,' কিশোর বলল। 'নিশ্চয় খারাপ খবর!'

'কি?' পারকার আঙ্কেল বলছেন, 'পাওয়া যায়নি!' ক্যাসলে কাউকে পাওয়া যায়নি?...হ্যাঁ, তাই হয়েছে। জোরেক আর ডাউনিলের অ্যারেস্টের খবর জেনে ফেলেছে চেকেরা। সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিয়ে গেছে বন্দিদের।...যা-ই করে আমাকে জানাবেন, প্লীজ!'

রিসিভার রেখে দিলেন তিনি। ফিরে তাকালেন। তাঁর বলার দরকার নেই আর কিছু, যা বোঝার বুঝে ফেলেছে সবাই।

'কপালটাই খারাপ বাপবেটার!' আফসোস করে বলল মুসা। 'কিন্তু আর ওদেরকে আটকে রাখার কি কারণ থাকতে পারে?'

'যত বিদ্যা আছে সব বের করে নিতে চায় হয়তো,' রবিন বলল। 'যত বেশি তথ্য আদায় করতে পারবে ততই তো লাভ। বিক্রি করতে পারবে।'

'কিংবা,' কিশোর বলল। 'তাঁদেরকে জিম্মি হিসেবে আটকে রাখতে চায়। বিনিময়ে ওদের দু'জন লোকের মুক্তি চাইবে।'

'আমারও তাই মনে হয়,' পারকার আঙ্কেল বললেন। 'এছাড়া আর তো কিছু মাথায় আসছে না। আর হবেই বা কি?' স্ত্রীর খোঁজে বেরিয়ে গেলেন তিনি, শেষ খবরটা জানানোর জন্যে।

নীরবে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল গোয়েন্দারা।

'বন্দি বিনিময়!' রেগে গেল কিশোর, 'এরকম একটা কাজ ঘটতে দিতে পারি না আমরা!'

'বেচারারা!' প্রফেসর আর তাঁর ছেলের জন্যে মায়াই লাগছে রবিনের। 'কি কুক্ষণেই যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন!'

মুসা বলল, 'কিন্তু একটা কিছু করা দরকার, এ ভাবে তো ছেড়ে দেয়া যায় না।'

'আমরাই খুঁজতে যাব,' কিশোর বলল। 'কোরি ক্যাসলে যাব প্রথমে। দুর্গটায় আমরা নিজেরা একবার খুঁজে দেখব। অন্যের কাজের ওপর ভরসা রাখতে পারি না আমি। হোক না পুলিশ।'

'বড় বেশি আত্মবিশ্বাস তোমার। ঠিক আছে। আমার আপত্তি নেই। পেলে তো ভালই। আর বন্দিদেরকে না পেলেও কোনও সূত্রটুত্র পেয়ে যেতে পারি, তাই বা কম কি?'

'আমার মনে হয় না কিছু পাওয়া যাবে ওখানে,' মাথা নাড়ল জিনা। 'পুলিশ আর কি কোনও জায়গা খোঁজা বাকি রেখেছে? ওরা ট্রেইনড। আমরাই বরং আনাড়ি।'

'তারপরেও যাব,' কিশোর বলল। 'অনেক সময় বড়দের চোখে এমন কিছু এড়িয়ে যায়, যেটা ছোটদের যায় না। তারা ট্রেইনড বটে, কিন্তু মানুষ খুঁজেছে তারা, সূত্র খোঁজেনি। আমরা খুঁজব সূত্র। এগোনোর মত কোনও কিছু পেলেই আমি খুশি, যত ছোটই হোক না কেন।'

'তা যাওয়া যায়। পেলে তো ভালই। আর না পেলেও ক্ষতি নেই। সাইকেল চালানোও হবে, আর দুর্গটাও দেখা হবে।'

'কখন যাবে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'এখুনি। দেরি করে লাভ কি।'

দরজার দিকে ওদেরকে এগোতে দেখেই ঘাউ করে উঠল রাফি। দরজা মানে বাইরে বেরোনো, আর বেরোনো মানেই হয় খেলা, কিংবা হাঁটাহাঁটি। তার তো মজাই।

সাইকেল নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা। রাতের খাবারের অনেক দেরি। কয়েক ঘন্টা সময় পাবে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। তাই আস্তে আস্তে সাইকেল চালাল। সাথে করে শক্তিশালী টর্চ নিয়েছে, দুর্গের পাতালঘরে খোঁজার জন্যে।

দুর্গের কাছে পৌঁছে দেখল ধসে পড়েছে জায়গায় জায়গায়। আশপাশে কোনো মানুষ দেখা গেল না, একেবারে নির্জন। পুলিশ চলে গেছে অনেক আগেই। লোক না থাকার কারণ আছে। এমনিতেই এদিকে কেউ বড় একটা আসে না। আর পুলিশ এমন ভাবে এসে খুঁজে গেছে, যাতে কারও চোখে কিছু না পড়ে, কৌতূহল না জাগায়।

'মানুষ না থাকায় ভালই হয়েছে,' কিশোর বলল। 'কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না। নিশ্চিন্তে খুঁজতে পারব।'

ঝোপের ভেতরে সাইকেলগুলো লুকিয়ে রাখল ওরা। দুর্গের ধ্বংসাবশেষের চারপাশ ঘিরে কাঁটাতারের বেড়া। তবে ওগুলোর যত্ন আর নেয় না কেউ এখন, ফলে বহু জায়গা নষ্ট হয় গেছে। ফাঁক হয়ে আছে।

পাতালঘরে নামার সিঁড়ি খুঁজে বের করতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। নিচে নামল ওরা। খুব শক্ত করে তৈরি করা হয়েছে ঘরের দেয়াল, শত শত বছর টেকার উপযোগী করে। ওপরের চেয়ে নিচটা অনেক শক্ত, তাই এখনও ধসে পড়েনি। তবে ওপরটা ভেঙে পড়ায় বিপদ বেড়েছে। পাথরের স্তূপের ভারে ছাত

ধসে পড়তে পারে, তাহলে জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে নিচে যারা থাকবে। বিপজ্জনক, সন্দেহ নেই। সাবধান রইল গোয়েন্দারা। একটু এদিক ওদিক বুঝলেই পালানোর চেষ্টা করবে।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা যায়, তিনটে ঘর ব্যবহার করা হয়েছিল, এবং সেটা ইদানীং। মেঝেতে অনেক পাতা পড়ে রয়েছে। বিছানা পাতার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। খাবারের এঁটো পড়ে আছে। আর তেমন কিছু চোখে পড়ল না। থাকলেও হয়তো নিয়ে গেছে পুলিশ।

'এই দেখো,' জিনা দেখাল। 'এঘরের দরজায় কোনও তালা নেই। বন্দিদের পাহারায় যারা ছিল, তারা থেকেছে এখানে।'

'মনে হচ্ছে,' একমত হলো মুসা। 'অন্য দুটো ঘরে নতুন ছিটকানি লাগানো হয়েছে। তারমানে ওদুটোতেই রাখা হয়েছিল প্রফেসর আর তাঁর ছেলেকে।'

জিনা যে ঘরটাতে উঁকি দিয়েছে, তাতে একটা খবরের কাগজ আর একটা খালি সিগারেটের প্যাকেট পড়ে থাকতে দেখল। অন্য দুটোতে কিছুই নেই, শুধু দুটো বিছানা পাতার চিহ্ন বাদে।

'ডালপাতাগুলো নিল না কেন পুলিশ?' রবিন বলল। 'অন্তত পরিষ্কার করে রেখে যেতে পারত।'

'অ্যাই, রাফি,' এককোণে কুকুরটাকে শুঁকতে দেখে বলে উঠল কিশোর। 'কিছু পেলি নাকি?'

'ঘাউ!'

আঁচড়াতে শুরু করল সে। মাটি খুঁড়ে কি যেন একটা বের করে আনল। এগিয়ে গেল কিশোর। ছোট একটা সাদা বলের মত জিনিস।

'আরে, গোল করে বলের মত করে রেখেছে!' কিশোর বলল। 'একটা রুমাল!' রাফির কাছ থেকে নিয়ে ডলে ডলে ওটা সমান করতে শুরু করল সে।

অন্য ঘর থেকে তার চিৎকার শুনতে পেল তিন গোয়েন্দা।

'লেখা রয়েছে কিছু!' চেঁচাতে থাকল কিশোর। 'মেসেজ! ইংরেজিতে! ডাফ লিখেছে!'

'কি লেখা!'

'দেখি তো?'

'পড়ো না, জোরে পড়ো!'

'ঘাউ!'

একসাথে চেঁচাতে শুরু করল সবাই।

বসে পড়েছে কিশোর। হাঁটুতে রুমালটা বিছিয়ে ডলে ডলে সমান করল আরও খানিকটা। তারপর মেসেজের মানে বের করার চেষ্টা করল। পড়তে অসুবিধে হচ্ছে। তার কারণ, সাদা কাপড়ে বলপয়েন্ট কলম দিয়ে লেখা। তারপর পড়ে ছিল মাটির নিচে। লেখাগুলো ঝাপসা হয়ে গেছে।

এসব মেসেজ নিয়ে মাথা ঘামাতে ভালবাসে মুসা। কিশোরের কাছ থেকে রুমালটা নিয়ে নিল। একেবারেই পড়া যায় না, তা নয়, কষ্ট হয় আরকি। পড়তে শুরু করল সে, 'যার হাতেই এই রুমাল পড়ুক, তাকেই বলছি, আমাদের সাহায্য

করুন। চেক নামে একটা আন্তর্জাতিক গুপ্তচক্রের হাতে বন্দি হয়েছি আমি এবং আমার বাবা প্রফেসর মিখাইল ইভানফ...'

'এসব আমরা জানি!' রবিন বলল।

'কিন্তু আমরা যে জানি সেটা ডাফ জানে না। ওদেরকে কেউ খুঁজছে, এখবরও জানে না। শোনো, পরেরটুকু পড়ছি।' আবার পড়তে লাগল মুসা, 'আমরা কোথায় রয়েছি বলতে পারব না। আজ সকালে দু'জন লোককে কথা বলতে শুনলাম। ওরা আলোচনা করছে, এখান থেকে আমাদেরকে সরিয়ে নিয়ে যাবে আরেকটা জায়গায়। "পুরানো দুর্গ" কথাটা বলতে শুনলাম ওদেরকে। এটা একটা মূল্যবান সূত্র হতে পারে। দয়া করে সাহায্য করুন। ডাফায়েল ইভানফ।'

'পুরানো দুর্গ! তার মানে দ্য ওল্ড ফোর্ট!' উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল জিনা। 'বুঝতে পেরেছি!'

'চেনো নাকি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, উইংকল বে'র পুরানো দুর্গটা! তোমরাও তো গেছ ওখানে...'

'মনে পড়েছে!' রবিন বলল। 'ওল্ড ফোর্ট বলে লোকে। লুকোচুরি খেলেছি।'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে সেখানেই প্রফেসরকে নিয়ে গেছে ওরা,' কিশোর বলল।

'কিন্তু জায়গাটা তো বিক্রি হয়ে গেছে,' জিনা জানাল। 'কে জানি একজন কিনে নিয়েছে, ভেঙে ফেলবে। তেমন ঐতিহাসিক মূল্য নেই, কাজেই কোনও মিউজিয়মও ওটা সংরক্ষণে আগ্রহী নয়। যে কিনেছে, সে ওটা ভেঙে নতুন বাড়ি তুলে হোটেল বানাবে, ট্যুরিস্টদের জন্যে। ভাঙাচোরা শুরু হয়নি এখনও। কয়েক মাস দেরি আছে। শুনলাম আসছে শরৎ থেকে শুরু করবে। তবে কাউকে ঢুকতে দেয়া হয় না ওখানে। লোকে অবশ্য ঢুকতে যায়ও না। সাপের উৎপাত নাকি খুব বেশি। ইয়া বড় বড় সাপ। লোকে ভয় পায় জায়গাটাকে।'

'তা তো পাবেই,' রবিন বলল। 'আমার তো শুনেই কেমন লাগছে!'

নীরবে চিন্তা করছে মুসা। বলল, 'এতসব ঝামেলা না করে আরেকটা কাজ করলেই পারি আমরা,' বলল সে। 'সহজ কাজ। পুলিশের কাছে নিয়ে যেতে পারি এই রুমালটা।'

কড়া চোখে তার দিকে তাকাল কিশোর। 'এত সহজেই ভয় পেয়ে যাও। খালি পিছিয়ে আসার তাল। পুলিশের কাছে যাওয়ার মানেই হচ্ছে সেই ঢাকঢোল পেটানো। আবার সতর্ক হয়ে যাবে স্পাইরা। আরেকবার সরিয়ে ফেলবে বন্দিদের।'

'ওরা এখন এমনিতেই সতর্ক হয়ে আছে। নজর রাখছে চারদিকে।'

'সে-জন্যেই তো আরও বেশি সতর্ক হতে হবে আমাদের। পুলিশকে ওদিকে যেতে দেখলেই বন্দিদের নিয়ে সরে পড়বে ওরা। তখন হয়তো আর কোনও মেসেজও রেখে যেতে পারবে না ডাফ। সুযোগ বার বার পায় না মানুষ। একটা পাওয়া গেছে, সেটাকে নষ্ট করা উচিত হবে না।'

'তার পরেও অবশ্য কথা থাকে,' জিনা বলল। 'ওরা যে এখনও সেখানেই রয়েছে তার ঠিক কি? এমনও হতে পারে তাড়াহুড়া করে তখন ওল্ড ফোর্টে সরিয়ে

নিয়ে গিয়েছিল–ওটা ছিল সাময়িক আশ্রয়। তারপর সরিয়ে নিয়েছে অন্য কোথাও। ওই দুর্গটা এখানে. স্পাইদের ঘাঁটি হতেই পারে না। অনেক সময় পেয়েছে। সরিয়ে নিয়ে যেতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।'

'না, সরায়নি,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'অত সহজ না, অন্তত এখনকার পরিস্থিতিতে। পুলিশ সজাগ হয়ে গেছে। লোকজনকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে যাতে প্রফেসরের চেহারার কোনও মানুষকে দেখলেই পুলিশকে খবর দেয়। রেডিও শোনোনি? এখান থেকে বেরোনোর সমস্ত রাস্তায় রোড ব্লক বসানো হয়েছে। কড়া নজর রাখছে পুলিশ। এই পাহারা ভেদ করে কিছুতেই বেরোতে পারবে না স্পাইরা।'

'তা ঠিক,' রবিন বলল। 'তারমানে কিডন্যাপাররাও আটকা পড়েছে এই এলাকায়।'

'তাহলে তো তাড়াতাড়ি করতে হয়,' মুসা বলল। 'জলদি গিয়ে বের করে আনতে হয় বন্দিদেরকে।'

আরও কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একমত হলো সবাই। বের করে আনতে যাবে প্রফেসর আর তাঁর ছেলেকে। এখন, স্পাইদের সন্দেহ না জাগিয়ে, ওদের চোখ এড়িয়ে কি করে ঢুকবে দুর্গে, সেটাই প্রশ্ন। আলোচনা চলল বিষয়টা নিয়ে।

'আমি বলি, কি করব।' জিনা বলতে লাগল, 'আমরা চলে যাব ওখানে। এমন একটা ভাব করব, যেন ক্যাম্পিঙে বেরিয়েছি। তাঁবু ফেলার জায়গা খুঁজছি। দুর্গের পাশে একটা মাঠ আছে। সেখানে তাঁবু ফেলব। তখন আর দুর্গের কাছে ঘুরঘুর করলেও আমাদেরকে সন্দেহ করতে পারবে না ওরা।'

'কিন্তু সাপের কথাটা ভুলে গেলে চলবে না,' প্রশ্ন তুলল রবিন। 'বিষাক্ত যদি হয়?'

'হলে কিছু করার নেই,' কিশোর বলল। 'সাবধান থাকতে হবে। সাপগুলো নির্বিষও হতে পারে। বিষছাড়া সাপই বড় হয় বেশি। মোটা হয়। কামড়ে দিলে কিছু হয় না।'

'সেরকম সাপ হলে ধরে নিয়ে আসব,' হেসে বলল রবিন। আড়চোখে তাকাল মুসার দিকে। 'রান্না করে দিলে চেখে দেখতে পারবে মুসা। চীনারা বলে সাপের মাংস নাকি মুরগীর মাংসের মত লাগে।'

নির্বিকার কণ্ঠে মুসা জবাব দিল, 'আমার কোন আপত্তি নেই। চীনারা খেতে পারলে আমি পারব না কেন? পৃথিবীর আরও অনেক দেশের মানুষই শুনেছি সাপ খায়...'

'বাদ দাও তো এখন ওসব কথা,' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল কিশোর। 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। জিনার বুদ্ধিটা মন্দ না। ওভাবে কাজ করে দেখতে পারি।'

পাতালঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। বাড়ি ফিরে চলল।

ওরা যে প্রফেসর আর তাঁর ছেলেকে খুঁজতে যাচ্ছে, একথা কেরিআন্টিকে বলল না। শুধু বলল ক্যাম্পিঙে যাচ্ছে। এতে অমত করার কিছু নেই। অনুমতি দিয়ে দিলেন তিনি। এমনকি বেশ কিছু ভাল ভাল খাবারও দিয়ে দিলেন।

সেদিন আর যাওয়ার সময় নেই। পরদিন সকালে উঠে সাইকেলের ক্যারিয়ারে মালপত্র বোঝাই করে রওনা হয়ে পড়ল দলটা। তাঁবু, স্লীপিং ব্যাগ, অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস, আর কয়েকদিন চলার মত খাবার নিয়েছে সঙ্গে। রাফির ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে।

গোবেল ভিলা থেকে দুর্গটা বারো কিলোমিটার দূরে। একটা ঢালের ওপরে। ওখানটায় উঠে গেছে সরু একটা পথ। কাঁচা রাস্তা, কিন্তু পাথরের মত কঠিন। অনেক পাথরও পড়ে রয়েছে পথের ওপর।

খুব গরম পড়েছে। দরদর করে ঘামছে অভিযাত্রীরা।

'থেমো না থেমো না!' হাঁপাতে হাঁপাতে রসিকতা করল মুসা, 'চালিয়ে যাও। আর সামান্যই পথ। ওই দুর্গের ভেতরে ঢুকতে পারলেই হলো। এয়ারকুলার রয়েছে। আইসক্রীম রয়েছে...'

'ইস্, তা যদি থাকত!' জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল রবিন।

'তবে ঠাণ্ডা পানি আছে, এটা বলতে পারব। ঝর্না। কি রকম কুলকুল করে পানি পড়ে দেখলেই বুঝবে। মিষ্টি, পরিষ্কার। তবে নির্বিষ সাপেরা নিশ্চয় পানি খেতে আসে যেখানে। ধরতে পারলে কাবাব বানিয়ে দেয়া যাবে মুসাকে।'

'থামতো!' হাত নেড়ে বলল কিশোর। 'অহেতুক বকবক করে শক্তি খরচ না করে জমিয়ে রেখে দাও। ওই ঢাল বেয়ে উঠতে কাজে লাগবে। দেখেছ কি রকম খাড়া? এই বকবকানিগুলো ওপরে উঠে কোরো। ওরা ভাববে সত্যিই আমরা ক্যাম্প করতে গেছি, কয়েকটা বোকা ছেলেমেয়ে।'

'ভেবো না,' হেসে বলল মুসা। 'এমন কাণ্ড শুরু করে দেব, ওরা কল্পনাই করতে পারবে না আমাদের অন্য উদ্দেশ্য আছে।'

'আচ্ছা,' জিনা বলল। 'এমন কিছু করতে পারি না আমরা, যাতে প্রফেসর আর তাঁর ছেলে ভাবেন যে আমরা জেনে ফেলেছি তাঁরা ওখানে রয়েছেন? তাঁদেরকে বের করতে এসেছি?'

'হবে, সব হবে,' কিশোর বলল। 'কি কি করতে হবে সবই ভেবে রেখেছি আমি।'

প্যাডাল করতে করতে হঠাৎ থেমে গেল জিনা। সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াল। অবাক হলো অন্য তিনজন। তারাও নামল।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল মুসা। 'এখানে তো নামার কথা নয়? চলো। আরেকটু সামনে।'

'সে-জন্যে থামিনি। একটা কথা মনে পড়ল হঠাৎ।'

'কি?'

'বের করতে তো এলাম। নাহয় জানালামও ওদেরকে আমরা এসেছি। কিন্তু কিভাবে কি করব তা তো আলোচনা করিনি।'

'সেটা পরেও করা যাবে। সময় আসুক তো আগে,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আর আমরা যদি কিছু করতে না-ই পারি, পুলিশ তো আছেই, তাদেরকে খবর দেব। আগে তো শিওর হয়ে নিই যে এখানেই এনে রাখা হয়েছে। চলো। গরমে মরে গেলাম!'

আবার ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। রাফির হয়েছে মহা আনন্দ। ছোটাছুটি করছে সে। আশেপাশে অনেক খরগোশের গর্ত। প্রচুর ঝোপঝাড় রয়েছে। সেগুলোর ওপরে উড়ছে অসংখ্য প্রজাপতি। খরগোশ ধরবে না প্রজাপতি, বুঝে উঠতে পারছে না। পাগল হয়ে গেছে যেন। তার কাণ্ড দেখে হাসতে শুরু করল সবাই।

পথের শেষে পৌঁছল দলটা। ওখান থেকেই শুরু হয়েছে 'জিনার মাঠ'। আসলে ঠিক মাঠ বলা যায় না ওটাকে। পাহাড়ের ঢালে সমতল জায়গায় এক টুকরো তৃণভূমি, চারণভূমি হিসেবে এসব জায়গাকে ব্যবহার করে লোকে, গরুছাগলকে ঘাস খাওয়াতে আনে। ওটার একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই 'পুরানো দুর্গ'।

জোরে জোরে কথা বলতে শুরু করল ওরা। চেঁচিয়ে ঝগড়া শুরু করল। দুর্গে লোক থাকলে যাতে তাদের কানে যায়।

'বাহ্, চমৎকার!' চেঁচিয়ে বলল জিনা। 'এখানেই তাঁবু খাটানো যাক।'

'এই এই, দুর্গের বেশি কাছে যেয়ো না!' আরও জোরে বলল রবিন। 'ওখানে সাপ আছে শুনেছি। সাপকে আমার ভীষণ ভয়।'

'ওই দুর্গের ভেতরে কে যায়,' কিশোর বলল। 'ওটা একটা জায়গা হলো নাকি। বাজে। কয়েকটা পুরানো ইঁট আর পাথর, দেখার কিছু নেই। এর জন্যে কে যায় সাপের কামড় খেতে। এসো, ঝর্নাটা দেখে আসি। ওটার ধারেই তাঁবু ফেলব। পানি পাওয়া যাবে।'

'ঠিক বলেছিস,' মুসা বলল। 'ওখানেই ফেলব। এই, তোমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছ? এসো।'

ঝর্নার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। জায়গাটা সত্যি সুন্দর। পাহাড়ের ওপর থেকে আশপাশের অনেক দূর চোখে পড়ে। পেছনে দুর্গ। সামনের দিকে নিচে সাগর। চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই শোভা দেখল ওরা। তারপর মালপত্র খুলতে বসল।

'আমার কেমন একটা অনুভূতি হচ্ছে,' ফিসফিস করে বলল রবিন। 'মনে হচ্ছে, কারা যেন নজর রেখেছে আমাদের ওপর।'

'উরিব্বাবারে, ভূত!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'এই, চুপ করো!' কিশোর বলল। 'এখানে আর চেঁচানোর দরকার নেই। অনেক হয়েছে।' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল, 'আমারও মনে হচ্ছে কেউ নজর রাখছে। আমাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সঠিক নির্দেশনা দিয়ে থাকলে ধরে নিতে হবে শত্রুরা এখানেই আছে। আর স্পাইদের থাকার অর্থই হচ্ছে বন্দিরাও আছে।'

শব্দ করে, অনেক হৈ-হট্টগোল করে তাঁবু খাটাতে শুরু করল ওরা।

ভালই চলছিল, সমস্যার সৃষ্টি করল রাফি। তার মনে হলো, প্রজাপতি বাদ দিয়ে দুর্গের ভেতরে ঢোকা উচিত। মাটিতে নাক ঠেকিয়ে কি যেন শুঁকতে লাগল। কোন জিনিসের গন্ধ আগ্রহী করে তুলেছে তাকে। শুঁকে শুঁকে এগিয়ে চলল দুর্গের দিকে। কিশোর তার কলার চেপে ধরতেই গরগর করে উঠল। টেনে নিয়ে যেতে চাইল দুর্গের দিকে। কিন্তু যেতে দিল না জিনা। সরিয়ে নিয়ে এল আবার ঝর্নার ধারে। কানে কানে বলল, 'চুপ করে থাক। এখনও যাওয়ার সময় হয়নি। কোনও দিকে যাবি না, বুঝলি?'

অবাকই হলো রাফি। এরকম জায়গায় এলে সে যেখানে যেতে চায় তাকে যেতে দেয় জিনা। এখন আটকাচ্ছে কেন? তবে জোরাজুরি করে আর যেতে চাইল না। শুধু বলল, 'ঘাউ!'

রান্নার জোগাড়ে বসে গেল রবিন। ভাবছে, কোনও একটা উপায়ে জানিয়ে দেয়া যায় কিনা যে তাঁদের বন্ধুরা কাছেই রয়েছে। তাতে তাঁরা খুশি হতেন, স্বস্তি পেতেন অনেকটা। তৈরি থাকতে পারতেন বেরিয়ে আসার জন্যে। কিন্তু অনেক ভেবেও কিছুই ঠিক করতে পারল না সে।

খাবারটা সেদিন ওদের কাছে মনে হলো অমৃত। প্রথমত, আসতে অনেক পরিশ্রম হয়েছে। তার ওপর এরকম একটা সুন্দর জায়গা। মুসা তো বলেই ফেলল, এখানে এভাবে সারা জীবন থাকতে হলেও আপত্তি নেই তার। এই রোদ, আকাশ, বাতাস, সাগর, প্রকৃতি, এত প্রজাপতি আর পাখি ছেড়ে কে যেতে চায়!

প্রচুর খেল ওরা। সেই সাথে করল প্রচুর চেঁচামেচি। এত কিছুর মাঝেও আসল কথাটা ভুলল না। কড়া নজর রাখল দুর্গের দিকে। কিন্তু জীবনের কোন চিহ্নই দেখল না। কোন শব্দ নেই। জিনার তো সন্দেহই হতে লাগল, এখানেই প্রফেসর আর তাঁর ছেলেকে নিয়ে এসেছে কিনা স্পাইরা।

খাওয়ার পরে কয়েক মিনিট ঘাসের ওপর চিত হয়ে থেকে উঠে পড়ল আবার ওরা। বল খেলতে শুরু করল। খেলতে খেলতে সরে যেতে লাগল দুর্গের কাছে। তবে দুর্গের দিকে ভুলেও তাকাল না, বোঝাতে চাইল ওটার প্রতি কোন আগ্রহ নেই ওদের। তবে রাফিকে নিয়ে অস্বস্তিতে থাকল জিনা। কেবলই সেদিকে যেতে চাইছে কুকুরটা। তাকে আটকে রাখতে হচ্ছে।

অনেক ভাবেই চেষ্টা করে দেখা হলো। লাভ কিছুই হলো না। বহুবার দেয়ালের কাছে গিয়ে ঘুরে এল। কিন্তু মানুষের ছায়াও নজরে পড়ল না। সন্দেহজনক কিছুই নেই। আবার ক্যাম্পের কাছে ফিরে এসে বসল।

অন্ধকার হওয়ার আগেই লাকড়ি জোগাড় করে রাখল। রাতের বেলা অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে তার পাশে গোল হয়ে বসল। গিটার আর সেদিন বের করল না কিশোর। মুসা মাউথ অর্গান বাজাতে লাগল। গুনগুন করে গাইতে লাগল রবিন। ছুরি দিয়ে অযথাই একটা ডাল চাঁছতে লাগল জিনা। কিশোরের পাশে বসে রয়েছে রাফি। আনমনে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সে। মুসার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে পুরানো দুর্গটার দিকে।

হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, 'মুসা, চালিয়ে যাও! একবারও ফিরে তাকাবে না কেউ! যা করছ করে যাও! এইমাত্র একটা ব্যাপার চোখে পড়ল! নড়াচড়া। আকারটা অদ্ভুত! বেরিয়ে এল মনে হলো গেট দিয়ে!'

সাত

'চুপ থাক, রাফি!' তাকেও সাবধান করল কিশোর। 'একটা শব্দ করবি না!'

'দেখতে ঠিক কেমন?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল জিনা।

'আকারটা? মনে হলো ঘোড়ায় চড়ে চলেছে—না না, মোটর-সাইকেল হবে। এঞ্জিন স্টার্ট দেয়নি। সীটে বসে পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে চলেছে।'

'সে-জন্যেই শব্দ শোনা যায়নি।'

'হ্যাঁ। ঠেলে রাস্তায় নিয়ে যাবে। তারপর ছেড়ে দিয়ে হ্যান্ডেল ধরে বসে থাকবে। ঢালু পথে আপনাআপনি নেমে যাবে মোটর সাইকেল।'

'গার্ড!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে রবিনও। 'তারমানে ঠিক জায়গাতেই এসেছি!'

বাজনা থামিয়ে দিয়েছে মুসা। কেউ নড়ছে না। ফিরে তাকাচ্ছে না। তবে টানটান হয়ে আছে স্নায়ু। কান খাড়া। যেন বহুযুগ পরে পাহাড়ের নিচ থেকে ভেসে এল ইঞ্জিনের শব্দ। খুব একটা জোরাল নয়। অনেক দূরে গিয়ে স্টার্ট দেয়া হয়েছে।

'মেইন রোডে নেমে গিয়ে তারপর ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়েছে,' জিনা বলল।

'যাচ্ছে কোথায়?' রবিনের প্রশ্ন।

'দোস্তদের সাথে দেখা করতে, আর কোথায়,' মুসা বলল। 'ওদেরকে বলতে যে আমরা এখানে আড্ডা গেড়েছি, আমাদেরকে কি করবে? কিংবা হয়তো খবর ফুরিয়েছে, আনতে গেছে। নতুন খবর-টবর জানার জন্যেও যেতে পারে।'

'পাহারায় একজনই ছিল কিনা জানতে পারলে হতো,' কিশোর বলল। 'একজন থাকলে তো গেলই; গিয়ে এখন দুর্গটায় তল্লাশি চালাতে পারি আমরা। তবে একজন থাকবে বলে মনে হয় না। কম পক্ষে দু'জন। একজনের পক্ষে দু'জন বন্দিকে টেনে বেড়ানো কঠিন।'

গিয়ে দেখা যায় অবশ্য, কিন্তু ঝুঁকি নিতে চাইল না গোয়েন্দারা। অপেক্ষা করে দেখাই ভাল, কি হয়। তাঁবুতে ঢুকল ওরা। ঘুম এল না। কান খাড়া করে জেগে রইল মোটর সাইকেলের ইঞ্জিনের শব্দ শোনার আশায়।

অবশেষে দূর থেকে ভেসে এল ইঞ্জিনের শব্দ। কান পেতে শুনতে লাগল ওরা। তাঁবুর কানা ফাঁক করে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ নীরব হয়ে গেল আওয়াজ। খানিক পরে দেখা গেল, একটা ছায়া, উঠে আসছে ঢাল বেয়ে। যেমন ঠেলে নিয়ে নেমেছিল, তেমনি ঠেলেই তুলে আনছে মোটর সাইকেলটা।

লোকটাকে দেখা যাওয়ার পরক্ষণেই দুর্গের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আরেকটা ছায়ামূর্তি।

'ভাগ্যিস যাইনি!' ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর। 'ধরা পড়ে যেতাম! দু'জন লোক।'

মোটর সাইকেলওয়ালা লোকটার কাছে এসে দাঁড়াল অন্য লোকটা। কথা হলো দু'জনে। এতদূর থেকে শোনা গেল না। ঢুকে গেল আবার দুর্গের ভেতরে। এরাতে আর কিছু ঘটার আশা নেই। কাজেই আর জেগে না থেকে ঘুমিয়ে পড়ল ছেলেমেয়েরা।

পরদিন সকালে ঝরঝরে শরীর আর মন নিয়ে ঘুম ভাঙল রবিনের। সারারাত একটা উপায় করা যায় কিনা ভেবেছে। ঘুম ভাঙতেই এসে গেল জবাবটা। কিভাবে বন্দিদের সাথে যোগাযোগ করা যায়, সেই প্রশ্নের জবাব।

নাস্তা বানাতে বানাতে সবাইকে তার পরিকল্পনার কথা বলল সে। 'শোনো,

ইভানফদের আমরা জানিয়ে দেব ওদের দুর্গে থাকার ব্যাপারটা আমরা জানি। এবং সাহায্য আসছে।'

'আর ওরা তখন কোনভাবে জানানোর চেষ্টা করবে,' মুসা বলল, 'যে ওরা আছে। ওরাও শিওর হলো, আমরাও শিওর হলাম। এই তো বলতে চাইছ?'

'এটা আরেকটা বাড়তি ঝামেলা,' কিশোর হাত নাড়ল অধৈর্য ভঙ্গিতে। 'ঠিক আছে, বলো, কি বলতে চাইছিলে।'

'আমি একটা বুদ্ধি বের করেছি, কিভাবে যোগাযোগ করব। দুর্গের কাছে অনেক ফুল ফুটে আছে দেখেছি। ফুল তুলতে চলে যাব। তুলতে তুলতে গান গাইব।'

'তাতে কি হবে?' রবিনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে না জিনা।

'চেনা কোন গানের সুর ঠিক রেখে শব্দগুলো বদলে দেব। এমন কিছু বলব যাতে বন্দিরা বুঝতে পারে।'

'ওদের পাহারাদাররা তো আর কান বন্ধ রাখবে না। ওরাও বুঝে যাবে,' কিশোর বলল।

'না, বুঝবে না,' রবিন বলল। 'এমন কিছু বলব, যা শুধু ইভানফরাই বুঝবে। আর কেউ নয়।'

'বুঝেছি!' হাসল কিশোর। 'তুমি বলবে, গোল করে পাকানো একটা রুমাল, তাতে কিছু কথা লেখা আছে!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'বলব, মাটির নিচে একটা রুমাল কুড়িয়ে পেয়েছে রাজকুমারি। তাতে একটা গান লিখে গেছে রাজকুমার, রাজকুমারীর জানার জন্যে। আর সেটা পেয়েই তাকে খুঁজে বের করতে এসেছে রাজকুমারী। কেমন? শুনলে ডাফ বুঝবে না?'

'বুঝবে বুঝবে,' জিনা বলল। 'খুব ভাল আইডিয়া।'

'তাহলে আর দেরি করে লাভ নেই। জলদি গিয়ে কাজটা সেরে ফেলা দরকার,' মুসা বলল।

দ্রুত নাস্তা সেরে নিল ওরা। থালা-বাসন ধোয়ার জন্যে ঝর্নার পাড়ে গিয়ে বসল জিনা, মুসা আর কিশোর। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে রবিন রওনা হয়ে গেল দুর্গের বাগানের দিকে।

এককালে বাগানটা আসল বাগানই ছিল, এখন বুনো হয়ে গেছে। যত্নটত্ন হয় না অনেক বছর। তবে ফুল এখনও ফোটে। বেশির ভাগই বুনো ফুল। বাটারকাপ, ডেইজি–দেখলে মনে হয় ষাঁড়ের চোখ। দেয়ালের গা ঘেঁষে গজিয়েছে কিছু গাছ, সেগুলোতেও ফুল ফুটেছে। তুলে ঝুড়িতে রাখতে লাগল সে। গান গেয়ে চলেছে। আস্তে আস্তে বাড়িয়ে দিল গলা।

দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে কয়েকবার করে বলল একই চরণ। ফুল তুলল। বুদ্ধিটা ভালই করেছে সে। একটা ছেলে ফুল তুলতে তুলতে গান গাইছে, এতে সন্দেহ করার কিছুই নেই। এই দৃশ্য অহরহ দেখা না গেলেও কারও সন্দেহ হওয়ার কথা নয়। তার এত কাছে যাওয়াটা নিশ্চয় পছন্দ করবে না স্পাইয়েরা, তবে কিছু বলতেও আসবে না। বলতে আসবে না নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করে দেয়ার ভয়েই। তবে সেটা আসল কথা নয়, বড় কথা হলো ওরা কিছু সন্দেহ

করতে পারবে না।

গান গেয়েই চলেছে রবিন। সরে যাচ্ছে এখান থেকে ওখানে। স্পাইরা যাতে সন্দেহ না করে, সেজন্যে সরে যাচ্ছে একজায়গা থেকে আরেক জায়গায়। কখনও দেয়ালের ধার ঘেঁষে থাকছে, কখনও চলে যাচ্ছে দূরে।

আরেকবার দেয়ালের কাছে আসতেই প্রায় পায়ের কাছে মৃদু একটা শিস শুনতে পেল রবিন। চমকে গেল। প্রথমেই তার মনে এল সাপের কথা। ঘাসবনের ভেতর দিয়ে নিশ্চয় ছুটে পালাচ্ছে, কিংবা ছোবল মারতে আসছে। ধড়াস করে এক লাফ মারল হৃৎপিণ্ড। কেঁপে উঠল।

ঝট করে নিচে তাকাল। সাপটাপ চোখে পড়ল না। আরেকটু বাঁয়ে চোখ পড়তেই দেখল, মাটির সমতলে একটা জানালা। মোটা মোটা শিক। পাতাল-ঘরের জানালা ওটা।

আরেকবার নরম শিস শোনা গেল।

চকিতের জন্যে চমকে গেলেও গান থামাল না রবিন। যেন ফুল তুলতে বসছে, এরকম করে বসে পড়ে তাকাল জানালা দিয়ে।

জানালায় কাঁচ নেই। শুরুতে কিছু দেখতে পেল না, শুধুই অন্ধকার। যেন একটা গোল্ক গর্ত। ধীরে ধীরে অন্ধকার হালকা হয়ে যেন সেখানে ফুটল দুই জোড়া চোখ। আরও ভাল করে তাকাতে দেখতে পেল, শুয়ে রয়েছে দু'জন মানুষ। ভঙ্গিতেই বোঝা গেল, বেঁধে রাখা হয়েছে।

দুরুদুরু করছে রবিনের বুক। বুঝতে পেরেছে কাদের দেখছে। প্রফেসর ইভানফ আর তাঁর ছেলে ডাফ।

দুটো মূর্তির মধ্যে ছোট মূর্তিটা নড়ে উঠল। তারপর অনেক কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল জানালার দিকে। আরও কাছে এলে আলো পড়ল মুখে। ওপর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ষোলো বছরের একটা ছেলে। সুন্দর মুখ। সোনালি চুল। ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমার রুমালটা পেয়েছ!'

জানালার গরাদের ফাঁকে নাক ঢুকিয়ে দিয়ে রবিন বলল, 'পেয়েছি। তুমি ডাফ ইভানফ, তাই না?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ছেলেটা। 'আস্তে কথা বলো। গার্ডেরা কাছাকাছিই আছে। শুনে ফেলবে।'

'হাত-পা তো বেঁধে রেখেছে দেখছি। মুখ বন্ধ করেনি কেন? তোমরা যে চিৎকার করতে পারো সে-ভয় নেই ওদের?'

'পারি,' বিষণ্ন হাসি হাসল ছেলেটা। 'তাহলে মুখটা চিরতরে বন্ধ করে দেবে। শাসিয়ে রেখেছে। টুঁ শব্দ করলেই শেষ করে দেবে। কি আর করব? এরকম একটা জায়গায় কেউ আসার কথা নয়। লোক চলাচল নেই। চেঁচিয়েই বা কি করব? অহেতুক বিপদ বাড়াব।'

'আর ভাবনা নেই। আমরা এসে পড়েছি। আমার বন্ধু কিশোর, মুসা আর জিনাও এসেছে। রাফিও। জিনা হলো বিজ্ঞানী মিস্টার জনাথন পারকারের মেয়ে, যাদের বাড়িতে তোমাদের ওঠার কথা ছিল। আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করতেই এসেছি। কালই এসেছি। কিন্তু তোমরা এখানে সত্যিই আছো কিনা না জেনে কিছু

করতে পারছিলাম না। এখন জানলাম। আর বেশিক্ষণ আটকে থাকতে হবে না তোমাদের। আমি যাই। ওদের বলিগে।'

উঠে আবার ফুল তুলতে আরম্ভ করল রবিন। আরেকটা গান ধরল। ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল দুর্গের কাছ থেকে। তাড়াহুড়া করল না।

ক্যাম্পে ফিরে এল রবিন।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'এত দেরি করলে যে? আমরা তো ভাবলাম আটকাই পড়লে বুঝি, বিপদে পড়েছ। এখান থেকে দেখাও যাচ্ছিল না অনেকক্ষণ থেকে। তা কি হলো? কিছু দেখলেটেখলে?'

'দেখেছি!' উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে রবিন। 'ইভানফদের!'

বোম ফাটল যেন।

'দেখেছ!' চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলল কিশোর। 'তাহলে আছে! যাক, এতক্ষণে নিশ্চিত হওয়া গেল!'

'বেশি উত্তেজিত হয়ো না!' সাবধান করল মুসা। 'লোকগুলো এদিকে নজর রাখলে আমাদের এই উত্তেজনা দেখে কিছু বুঝে ফেলতে পারে। কারণ এইমাত্র রবিন এল ওখান থেকে।'

কিন্তু শান্ত হওয়া কি সহজ? কেউই হতে পারছে না।

কিশোর বলল, 'জলদি একটা প্ল্যান অভ অ্যাটাক তৈরি করে ফেলতে হবে!'

'প্ল্যান অভ অ্যাটাক?' জিনা বলল। 'আসলে বলতে চাইছ, রেসকিউ প্ল্যান। অর্থাৎ উদ্ধারের পরিকল্পনা, আক্রমণের নয়। কয়েকটা ইনটারন্যাশনাল স্পাইয়ের সঙ্গে গিয়ে মারপিট করতে পারবে না। আমাদেরকেই কাবু করে ফেলবে।'

'তা তো পারবই না,' একমত হলো কিশোর। 'যতটা সম্ভব চুপি চুপি গিয়ে দু'জন বন্দিকে মুক্ত করতে হবে। তারপর চলে যাব পুলিশের কাছে। পুলিশ তখন কিডন্যাপারদের ধরবে।'

মাথা নাড়ল জিনা। 'তা-ও পারব বলে মনে হয় না, কিশোর। আমরা আসলে মুক্ত করে আনতে পারব না ওদের। তার চেয়ে চলো, বাড়ি চলে যাই। আব্বাকে বলি। পুলিশকে জানাক।'

'আর এসে দেখুক, পাখি উড়ে গেছে,' মুসা বলল। 'হবে না, ওসব করে হবে না। আমরা এখন এখান থেকে নড়লেই ওরা পালাবে।'

'ঠিক,' জোর পেয়ে গেল কিশোর। ও কিছুতেই চাইছে না পুলিশের কাছে যেতে। নিজেদেরই সব করার ইচ্ছে। 'এদের দলে আরও লোক আছে। পুলিশ কখনোই গোপনে আসতে পারবে না। দলের অন্য লোকেরা জেনে গিয়ে এদেরকে সাবধান করে দেবে। বন্দিদের নিয়ে পালাবে। কিছুতেই আটকানো যাবে না। কোরি ক্যাসলে কি করেছে ভুলে গেছ? পুলিশ জানল, কিন্তু কিছুই করতে পারল না। ঠিক পালিয়ে এল স্পাইয়েরা। তা-ও বন্দিদের নিয়ে। পুলিশকে জানানোর চিন্তা বাদ দিয়ে এখন কি করে ইভানফদের বের করে আনা যায় তা-ই ভাব।'

'হুঁ,' আর মেনে না নিয়ে পারল না জিনা। 'তবে সব কিছুই খুব সাবধানে করতে হবে। একটু এদিক ওদিক হলেই সর্বনাশ!'

'তা তো নিশ্চয়।'

সামান্যতম ঝুঁকি নিতে চাইল না গোয়েন্দারা। আশেপাশে ঝোপ আছে। কৌতূহলী হয়ে কোনও স্পাই দুর্গ থেকে বেরিয়ে চলে আসতে পারে। ঝোপে লুকিয়ে থেকে ওদের কথা শুনতে পারে, এই ভয়ে সেখানে আলোচনাই করতে চাইল না। উঠে সরে চলে যেতে চায় আরও খোলা জায়গায়, যেখানে ধারেকাছে লুকানোর জায়গা নেই।

কোথায় যাওয়া যায়?

ভাল একটা বুদ্ধি বের করল মুসা। 'সৈকতে চলে যাই। এমনই খোলা জায়গা, কেউ গিয়ে আড়ি পাততে পারবে না। আসার আগেই আমরা তাকে দেখে ফেলব।'

'বেশ,' রাজি হলো জিনা। 'চলো, নেমে যাই। ওই যে রাস্তা,' সরু একটা রাস্তা দেখাল সে।

মোটেও ভাল নয় এখানকার সৈকত। শুধু পাথর আর পাথর। বসার ভাল জায়গা নেই। গোবেল বীচের সৈকতের মত মসৃণ বালিও নেই। বেড়াতে কিংবা খেলতে আসার জন্যে এটা কোনও জায়গাই নয়, তবু, নিরাপদে তো কথা বলা যাবে। কারও শুনে ফেলার ভয় নেই।

'রাফি, পাহারা দে!' নির্দেশ দিল কিশোর। 'কাউকে আসতে দেখলেই ঘেউ ঘেউ শুরু করবি।'

পাহারায় বসে গেল রাফি। নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকতে লাগল। কান খাড়া। সন্দেহজনক কোনও শব্দ কিংবা গন্ধ পেলেই চেঁচাতে শুরু করবে।

গোল হয়ে বসল গোয়েন্দারা। জিনা বলল, 'হ্যাঁ, এবার শুরু করা যাক। সামান্যতম ভুল করা চলবে না আমাদের। করলে আর দ্বিতীয় সুযোগ পাব না। কাজেই ভেবেচিন্তে, সমস্ত সম্ভাবনা খুঁটিয়ে দেখে...'

বাধা দিল কিশোর, 'বেশি ভাবনাচিন্তা করতে গেলে কিছুই করতে পারব না। যা করার সেটা করে ফেলতে হবে। বিপদ অনেক বেশি, জানি, তবু না করে তো উপায় নেই। প্রফেসর ইভানফ আর তাঁর ছেলেকে উদ্ধার করবই আমরা। এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।'

'তা তো বুঝলাম,' মুসা বলল। 'ওদেরকে মুক্ত করবই আমরা। প্রশ্নটা হলো, কিভাবে?'

'উপায় খুব বেশি নেই। পাতালঘরে ঢুকতে হবে। ওদের বাঁধন কাটতে হবে। বের করে নিয়ে আসতে হবে। আর ঢোকার সহজ পথ হলো ওই জানালা।'

'কিন্তু জানালায় তো মোটা মোটা শিক!' রবিন বলল। 'আর মাটি অনেক নিচে। লাফিয়ে নামতে হয়তো পারব, উঠতে পারব না।'

'সে-জন্যে শিক কাটার ফাইল দরকার আমাদের। ঘষে ঘষে কেটে ফেলব। আর বন্দিদেরকে তুলে আনার জন্যে দড়ি।'

'কেন, লোহা কাটার করাত হলে অসুবিধে কি?' মুসা বলল, 'সেটা তো আরও ভাল। তাড়াতাড়ি কাটা যাবে। আরেকটা ব্যাপার ভুলে যাচ্ছ। ওখানে লোক আছে পাহারায়। লোহা কাটার শব্দ ওরা শুনে ফেলবে।'

'আস্তে আস্তে ঘষব। হাতে কাপড়-টাপড় কিছু জড়িয়ে নিয়ে শিক চেপে ধরলে শব্দ আর তেমন হবে না।'

'আরও একটা কথা,' জিনা বলল। 'বন্দিদের হাত-পা বাঁধা রয়েছে। ওপর থেকে খুলবে কি করে?'

'বেশি আঁটো করে বাঁধেনি,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'ডাফ আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে জানালার নিচে আসতে পেরেছে।'

'তা পেরেছে। কিন্তু দড়ি ধরে বেয়ে উঠতে পারবে না। তবে একটা ছুরি-টুরি ফেলে দিয়ে বলতে পারি চেষ্টা করে কেটে নিতে। বেশি টাইট করে তো বাঁধেনি, ঢিল আছে। হয়তো পারবে। ছুরি ফেলে দিয়ে আমরা শিক কাটা শুরু করব। ওরা ততক্ষণে মুক্ত হয়ে যাবে।'

জিনার সঙ্গে একমত হলো রবিন।

'সেটা কোনও সমস্যা নয়,' কিশোর বলল। 'দড়ি বেয়ে দু'জন উঠতে পারলে তিনজনও পারবে।'

'মানে? তিনজন পেলে কোথায়?' মুসা বুঝতে পারল না।

'আমরা একজন অনায়াসে নেমে গিয়ে ওদের বাঁধন কেটে দিয়ে আসতে পারি।'

'তাই তো!' প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল তিনজনে। 'একথা তো ভাবিনি!'

'হ্যাঁ। অনেক সহজ কথা ভুলে যাই আমরা অনেক সময়। যাই হোক, শিক কাটার আগেই একটা ছুরি ফেলে দেব। চেষ্টা করে দেখুক ওরা। যদি কাটতে পারে, ভাল, না পারলে আমরা তো আছিই। আর হ্যাঁ, সাথে করে ল্যাসো বানিয়ে নিয়ে যাব আমরা। দুটো।'

'কেন?' জিনার প্রশ্ন।

'সে দেখতেই পাবে,' রহস্যময় হাসি হাসল কিশোর। মুসার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। বুঝে গেল মুসা। টেলিভিশনে কাউবয়দেরকে ল্যাসো ব্যবহার করতে দেখে একবার শখ হয়েছিল কিশোরের, ওই জিনিস বানিয়ে ব্যবহার করে দেখবে। শুরু করল প্র্যাকটিস। মুসাকেই সঙ্গী করে নিয়েছিল। অনেক মজার কাণ্ড করেছিল সেসময় ওরা। কেন ল্যাসো নিতে চাইছে কিশোর, আন্দাজ করতে পারল মুসা। কাজে লেগে যেতে পারে।

'তা নাহয় নিলাম,' মুসা বলল। 'কিন্তু করাত পাব কোথায়?'

'সঙ্গে করে যখন আনা হয়নি, এখন কিনে আনতে হবে,' জবাব দিল জিনা। 'তা ছাড়া আর কোথায় পাব। আমিও গিয়ে নিয়ে আসতে পারি।'

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে,' রবিন বলল। 'একজন গেলে সন্দেহ করতে পারে স্পাইগুলো। ভাবতে পারে, পুলিশকে খবর দিতে গেছ। দু'জন গেলে মনে করবে খাবারটাবার আনতে গেছি আমরা।'

'হ্যাঁ, সেটাই ভাল,' কিশোর বলল। 'ইতিমধ্যে আমি চেষ্টা করব একটা ছুরি আর একটা নোট পাতালঘরে ফেলে দিয়ে আসতে। ডাফ আর তার বাবাকে কি কি করতে হবে, লিখে দেব।'

'আর আমি?' জানতে চাইল মুসা।

'তুমি নজর রাখবে দুর্গের ওপর। কিছু দেখলেই শিস দিয়ে আমাকে সতর্ক করে দেবে।'

'তাহলে মুক্ত করতে যাচ্ছি কখন?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'আজ রাতে। যত তাড়াতাড়ি বের করে আনা যায় ততই ভাল।'

পরিকল্পনা ঠিক। বেকায়দা জায়গায় বসে থাকার আর দরকার নেই। সরু পথ বেয়ে আবার ওপরে উঠে এল ওরা। ক্যাম্পে ফিরল। খাবার তৈরি করতে বসল রবিন। তাকে সাহায্য করতে লাগল জিনা আর কিশোর। মুসা তার ছোট রেডিওটা অন করে দিল। খবরের সময় হয়েছে। কান খাড়া করে এমন ভঙ্গি করে যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে রইল রাফি, যেন সে-ও শোনার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।

খবর শুরু হলো। কয়েকটা জরুরী রাজনৈতিক খবরের পর সংবাদ পাঠক পড়ল, 'প্রফেসর ইভানফ আর তাঁর ছেলে ডাফায়েলকে এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পুলিশ জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল স্পাই রিঙ চেক পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেছে...'

পরস্পরের দিকে তাকাল কিশোর আর মুসা। কান আরও খাড়া করে ফেলেছে, শোনার জন্যে।

'ওরা জানিয়েছে,' সংবাদ পাঠক পড়ছে, 'সরিয়ে নেয়া হয়েছে প্রফেসর আর তাঁর ছেলেকে। একটা প্রাইভেট প্লেনে করে অন্য এক দেশে...'

'কত বড় মিথ্যুকরে!' রেগে গেল রবিন।

'চুপ! শুনতে দাও!' কিশোর বলল।

'কিডন্যাপাররা তাদের শর্ত জানিয়ে দিয়েছে। প্রফেসর ইভানফ আর ডাফায়েলের বিনিময়ে তাদের দু'জন সহকর্মী জোরেক আর ডাউলিনকে মুক্তি দিতে হবে। আর কোনও শর্তেই প্রফেসর আর তাঁর ছেলেকে ছাড়বে না ওরা। পুলিশ এখনও কোন জবাব দেয়নি।'

'ওদেরকে মুক্ত করে আনা আরও জরুরী হয়ে গেল আমাদের জন্যে!' বলে উঠল কিশোর। 'বন্দি বিনিময় কোনমতেই হতে দেয়া যাবে না। দুটো শয়তান চেক ছাড়া পেয়ে যাবে, আবার গিয়ে তাদের শয়তানী চালাবে, এ-কিছুতেই হবে না।'

'আরেকটা ব্যাপার,' মুসা বলল। 'পুলিশ বন্দি বিনিময়ে রাজি না হলে ভীষণ বিপদে পড়ে যাবেন প্রফেসর আর ডাফ। বেশিদিন দুর্গে থাকার ঝুঁকি নেবে না যারা তাঁদেরকে পাহারা দিচ্ছে। বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। না পারলে মেরে রেখে যাবে।'

উঠে দাঁড়াল জিনা। 'আর দেরি করা উচিত না। আমি এখুনি যাচ্ছি। করাত কিনে নিয়ে আসি।'

'আরে বসো,' বাধা দিল কিশোর। 'এখন আনলেও লাভ হবে না। রাতের জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে আমাদের। শান্ত হয়ে বসো, খাও, তারপর সময়মত যাও। জিনিসটা সন্ধ্যার আগে পেলেও চলবে।'

আট

করাত আনতে রওনা হয়ে গেল জিনা আর রবিন। ল্যাসো বানাতে বসল মুসা। কিশোর বের করল একটা ছুরি, এমনিতেই অনেক ধার, আরও ধার করবে। যাতে

ছোঁয়া লাগলেই দড়ি কেটে যায়। প্রফেসর আর ডাফকে তাহলে বেশি কষ্ট করতে হবে না কাটতে।

ছুরিটা ধার করে, একটা নোট লিখল কিশোর। অক্ষরগুলো গোটা গোটা আর বড় করে লিখল, যাতে পাতালঘরের ম্লান আলোতেও পড়া যায়।

লিখেছে: হাতের বাঁধন কাটার চেষ্টা করুন। বিকেলে শেষবারের মত প্রহরীরা এসে আপনাদের দেখে চলে গেলে তখন কাটতে বসবেন। তার আগে নয়। আজ রাতে আপনাদের বের করে আনব আমরা। তৈরি থাকবেন।

নোটটা ছুরির বাঁটে পেঁচিয়ে, একটা রাবার ব্যান্ড দিয়ে আটকে দিল সে। মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই চোখ রাখ। আমি যাচ্ছি। জানালার কাছ দিয়ে হেঁটে যাব। এমন ভাব দেখাব, যেন প্রজাপতি ধরতে গেছি। সুযোগ বুঝে জানালা দিয়ে ভেতরে ফেলে দেব ছুরিটা। দিয়ে আর একটা সেকেন্ডও দেরি নয়, সাথে সাথে চলে আসব। ভয় নেই। রাফিকে সাথে নিয়ে যাচ্ছি। বিপদ হলে ও আমাকে বাঁচাতে পারবে।' বলেই রাফিকে বলার জন্যে মুখ ফেরাল কিশোর। কিন্তু কোথায় রাফি? নেই!

'রাফি! কোথায় গেলি?'

বার দুই ডাকার পর জবাব শোনা গেল। বেশ খানিকটা দূরে ছোট একটা ডোবার ধার থেকে ডাকছে। কিছু একটা দেখেছে সে যা এখান থেকে মুসা আর কিশোর দেখতে পাচ্ছে না।

'কি দেখল?' মুসার প্রশ্ন।

'চলো। দেখি।'

দৌড়ে ডোবার কাছে চলে এল দু'জনে। ওদেরকে দেখে আরেকবার ঘাউ করে উঠল রাফি। উত্তেজিত হয়ে আছে।

'কি হয়েছে, রাফি? কি দেখলি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

আবার জোরে জোরে চিৎকার শুরু করল রাফি। বার বার তাকাচ্ছে পুকুরের মাঝখানে। সেদিকে তাকিয়ে কি হয়েছে বুঝতে পেরে হো হো করে হেসে উঠল কিশোর আর মুসা। বড় একটা পাথরের ওপর একটা সবুজ ব্যাঙ বসে রয়েছে। চুপ করে এমন ভঙ্গি করে রয়েছে, যেন বিদ্রূপ করছে কুকুরটাকে। বসে রোদ পোয়াচ্ছে।

প্রথমে ওটাকে খেলতে ডেকেছিল রাফি। শোনেনি ব্যাঙটা। তারপর ধমকধামক দিয়েছে। পরোয়াও করেনি ব্যাঙের বাচ্চা। তারপর ভীষণ রেগে গেছে রাফি। নিশ্চয় এখন গালাগাল করে শাসাচ্ছে কুকুরের ভাষায়, ধরতে পারলে মজা দেখাবে।

'পানিতে চোবানোর হুমকি দিচ্ছে কিনা কে জানে!' বলে আবার হো হো করে হাসতে লাগল মুসা।

'ব্যাঙকে পানিতে চোবাবে!' কিশোরও হাসছে।

এত চেঁচামেচিতে বোধহয় বিরক্ত হয়ে গেল ব্যাঙটা। বড় বড় চোখ আরও বড় করে দিয়ে বলল, 'ক্রোঁক!'

আরও জোরে হাসতে লাগল কিশোর আর মুসা।

'হাসছে! হো হো! বুঝলে, হাসছে!' মুসা বলল, 'ব্যাঙটাও হাসছে! দেখেছ কেমন করে রেখেছে মুখটাকে. টিটকারি মারছে রাফিকে।'

'হাসলে অবাক হব না। অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড পড়োনি। কত কাণ্ড করেছে ব্যাঙ। এই রাফি, থাম। একটা সাধারণ ব্যাঙের ওপর তোর মত কুকুরের রেগে যাওয়া শোভা পায় না। আয়, আয়।'

কিন্তু কিছুতেই শান্ত হলো না রাফি। যেন ব্যাঙের এই টিটকারির অপমান তার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। এত্তবড় সাহস! তার দাওয়াত কবুল করে না! মজা দেখাবে! দেখিয়ে ছাড়বে ওই ব্যাঙের বাচ্চা ব্যাঙকে! ভীষণ রেগে গেছে সে। কিশোরের কথা কানেই তুলল না। পানির একেবারে কিনারে গিয়ে জোরে জোরে কয়েকটা হাঁক ছাড়ল।

বিরক্ত হয়েছে ব্যাঙটা। বড় বড় চোখ ঘোরাতে শুরু করল। তারপর আরেকবার ক্রোঁক করে উঠে মারল এক লাফ। পানিতে পড়ল। পানির ওপর দিয়ে ছড়ছড় করে পিছলে চলে এল কিনারে, চোখের পলকে। তারপর আরেক লাফে এসে পড়ল একেবারে রাফির নাকের ডগায়।

এরকম কিছু ঘটবে কল্পনাও করতে পারেনি রাফি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। একটা আলগা পাথরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঝাঁকি লেগে পাথরটা নড়ে যাওয়ায় তাল সামলাতে পারল না। গেল পিছলে। তারপর একেবারে পানিতে।

তাড়াতাড়ি ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে পিছলে চলে গেল আরও বেশি পানিতে।

মজা পেয়ে গেল যেন ব্যাঙটা। কুকুরের নরম নাক ছেড়ে আর নড়তেই চাইল না।

আবার ডাঙায় উঠে এল রাফি। এক লাফ দিয়ে গিয়ে মাটিতে নামল ব্যাঙ। কেশে, নাক মুখ থেকে পানি বের করল রাফি। ঝাড়া দিয়ে শরীর থেকে পানি ঝাড়ল। তারপর নজর দিল আবার ব্যাঙের দিকে। যুদ্ধং দেহি ভঙ্গি করে যেন বলতে চাইল, 'এবার আয়, দেখি কে হারে কে জেতে!'

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ার অবস্থা হলো কিশোর আর মুসার। ভুলেই গেল, জরুরী কাজ রয়েছে ওদের হাতে। ভুলে গেল, দুর্গে বন্দি প্রফেসর আর তাঁর ছেলের কথা।

হাঁ করে ব্যাঙটাকে কামড়াতে গেল রাফি।

একলাফে আবার তার নাকে এসে বসল ব্যাঙটা। আরেক লাফে পানিতে। ছড়ছড় করে পিছলে গিয়ে আবার উঠে বসল আগের পাথরটায়। কিছুতেই ব্যাঙের সঙ্গে না পেরে রাফির চিৎকার বেড়ে গেল আরও। ঘাউ ঘাউ করে বিকট শব্দে চেঁচিয়েই চলেছে।

ভারি চোখের পাতা বিচিত্র ভঙ্গিতে একবার ঢেকে দিল ব্যাঙের চোখ। আবার খুলে গেল। বলল সে, 'ক্রোঁক!' তারপর বিরক্ত হয়েই আবার পানিতে ঝাঁপ দিল। সাঁতরে গিয়ে লুকাল তীরের লম্বা ঘাসের ভেতরে।

ছাড়তে রাজি নয় রাফি। ছুটল। তার পেছনে ডাকতে ডাকতে গেল কিশোর। শুনলই না কুকুরটা। তার এক চিন্তা, ব্যাঙের বাচ্চাকে মজা দেখাবে। ঘাসের ভেতরে খুঁজে বের করল ওটাকে। পানিতে নামতে দিল না আর।

লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটল ব্যাঙ। একটা করে লাফ দেয়, আর ঘাসের ভেতর গিয়ে লুকায়। ডোবার কাছ থেকে সরে এল অনেকখানি। তাকে তাড়া করে চলল রাফি। ধরতে পারছে না কিছুতেই। একেকবার মনে হয়, এই বুঝি ধরে ফেলে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তড়াক করে শূন্যে লাফিয়ে ওঠে ব্যাঙ। গিয়ে পড়ে কয়েক ফুট দূরে। আবার তাড়া করে যায় রাফি।

এভাবে চলল। ওগুলোর পেছনে ছুটেছে কিশোর। তার আশঙ্কা হচ্ছে, সত্যিই না ব্যাঙটাকে কামড়ে দেয় রাফি। বার বার ডেকে ফেরাতে চাইছে।

কোনরকম উত্তেজনা নেই ব্যাঙটার মধ্যে। শান্ত। ঝুপ করে লাফিয়ে গিয়ে পড়ছে কিছুদূর, চুপ করে বসে থাকছে, রাফি কাছে এলেই আবার লাফ।

লাফাতে লাফাতে মাঠ পেরিয়ে চলে যাচ্ছে দুর্গের দিকে।

দেয়ালের কাছে পৌঁছে দেয়ালের ধার ঘেঁষে লাফিয়ে চলল। রাফিও নাছোড়বান্দা। অবশেষে সেই জানালাটার কাছের একটা রৌদ্রালোকিত পাথরের ওপর লাফিয়ে গিয়ে উঠল ব্যাঙটা, যার নিচের ঘরে রয়েছেন প্রফেসর আর ডাফ।

রাফি চেঁচিয়ে চলেছে।

থমকে দাঁড়াল কিশোর। তার গায়ের ওপর এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল মুসা।

'পেয়ে গেছি!' ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর। 'এটাই সেই জানালা!'

জানালার দিকে ছুটে গেল সে।

চুপ করে বসে আছে ব্যাঙটা। ওটার কাছে পৌঁছে গেল রাফি। হাঁ করে কামড়াতে গেল। কামড় বসাবে, ঠিক এই সময় লাফ মারল ব্যাঙ।

রাফিকে ধরার জন্যেই যেন লাফ দিল কিশোর। কলার চেপে ধরলও। তবে একই সঙ্গে পকেট থেকে বের করল ছুরিটা। ফেলে দিল জানালার ভেতর। থামল না। কুকুরটার কলার ধরে টেনে সরিয়ে আনতে লাগল জানালার কাছ থেকে। ধমক দিয়ে বলল, 'কতবার না মানা করেছি এদিকে আসতে!

'সাপ আছে, সাপ, বড় বড় সাপ! ব্যাঙের পেছনে লেগেছ। সাপে যখন কামড়ে দেবে তখন বুঝবে মজা। আয়, জলদি আয়।'

রাফিকে টেনে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এল কিশোর আর মুসা। ধপাস করে গড়িয়ে পড়ল ঘাসের ওপর।

জোরে জোরে দম নিতে নিতে কিশোর বলল, 'যাক, ভালই হলো! ভাল সুযোগ করে দিলি রাফি! নইলে এত সহজে পারতাম কিনা জানি না! ব্যাঙটাকেও কাছে পেলে একটা ধন্যবাদ দিতাম।'

রাফির চেহারা দেখে আবার হাসতে শুরু করল মুসা। তার সাথে যোগ দিল কিশোর। সারা শরীরে কাদা মাখা। জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। কড়া রোদে শুকিয়ে এসেছে কাদা। অদ্ভুত লাগছে দেখতে।

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি?' হাসতে হাসতে বলল কিশোর। 'দেখতে তো লাগছে ভূতের মত। যা, গা ধুয়ে আয়গে।' হাত তুলে ঝর্নার দিক দেখাল সে, যাতে আবার না ডোবায় চলে যায় রাফি।

করুণ চোখে কিশোরের দিকে তাকাল রাফি। এভাবে পরাজিত হয়ে যেন মন খারাপ হয়ে গেছে তার। একটা শিক্ষাও হয়েছে। ভবিষ্যতে ব্যাঙ দেখলে আর

ওরকম করতে যাবে না।

ঝর্নার পানিতে গোসলের ইচ্ছে নেই তার। জোর করে ধরে নিয়ে গেল কিশোর আর মুসা। ঠেলে নামাল পানিতে।

শেষ বিকেলে ফিরে এল জিনা আর রবিন। এসেই রবিন বসে পড়ল খাবার তৈরি করতে। সকাল সকাল খেয়েদেয়ে তৈরি হয়ে থাকতে চায়। অন্ধকার হওয়ামাত্র যাতে বেরিয়ে পড়তে পারে। বরাবরের মত তাকে সাহায্য করতে বসল জিনা।

ওরা যাওয়ার পর কিশোর আর মুসার কিভাবে কেটেছে জানতে চাইল জিনা।

'একটা ছুরি নিয়ে গিয়ে ভেতরে ফেলে দিয়ে এসেছি,' কিশোর জানাল।

কিভাবে ফেলেছে, সেটা খুলে বলল মুসা। আরেকবার শুরু হলো হাসি। রাফি বেচারা যেন বুঝতে পারল, তাকে নিয়েই এই হাসাহাসি। মন খারাপ করে একটু দূরে শুয়ে রইল সে।

'করাত নিয়ে এসেছি,' জিনা বলল। 'দেখবে?'

'না না, এখানে না!' কিশোর চট করে তাকাল একবার দুর্গের দিকে। 'বলা যায় না, দূরবীন দিয়ে হয়তো নজর রাখছে ওরা। দেখে ফেলতে পারে। এতদূর এগিয়ে সামান্য ভুলে সব পণ্ড করতে চাই না। তাঁবুতে ঢুকে দেখব।'

'বেশ, চলো। রবিন, তুমি রান্না করো। আমরা আসছি।'

ঘাড় কাত করে সায় জানাল রবিন।

তাঁবুতে চলে এল জিনা, মুসা আর কিশোর। বের করে দেখাল জিনা। বুদ্ধি করে বেশ কিছু প্যাকেট নিয়ে এসেছে, যাতে স্পাইরা দেখলে বোঝে খাবার আনতেই গিয়েছিল ওরা।

'মাত্র দুটো আনলে,' মুসা বলল।

'আর বেশি দিয়ে কি হবে? দু'তিনটে শিক কাটতে পারলেই হয়।'

'তা ঠিক। শিকে জড়াবটা কি? লোহা কাটার যা শব্দ হয়!'

'তোয়ালে জড়িয়ে নেব মোটা করে,' কিশোর বলল।

'তার পরেও শব্দ হবে,' নিশ্চিন্ত হতে পারছে না মুসা। 'আর রাতের বেলা সামান্য শব্দই অনেক বেশি শোনা যায়।'

'ওটুকু তো হবেই। আর কিছু করার নেই। তবে আশা একটাই, শিকগুলো পুরানো। মরচে পড়া। কাটতে বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'হ্যাঁ। ব্যাটারা এসে আমাদের ঘাড় চেপে না ধরলেই বাঁচি।'

'এতই সহজ? রাফি থাকতে?'

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে। রবিনের কাছে এসে বসল। মন খারাপ করেই রয়েছে রাফি। তাকে খুশি করা দরকার। নইলে রাতে সবকিছু গোলমাল করে দিতে পারে। কাজেই তাকে টেনে তুলে নিয়ে খানিকক্ষণ ছুটাছুটি করিয়ে আনল কিশোর। কয়েকটা খরগোশকে গর্তে ঢুকিয়ে দিয়েই মন ভাল হয়ে গেল রাফির।

রান্না শেষ। দেরি না করে খেতে বসে গেল সবাই। সন্ধ্যার আগেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তৈরি হয়ে গেল। এবার শুধু রাত নামার অপেক্ষা। সময় যেন আর কাটে না। খানিকক্ষণ এসে সাগর দেখল। পাখি দেখল। কথা বলল। সূর্য

ডুবল অবশেষে। ক্যাম্পের কাছে ফিরে এল ওরা। অগ্নিকুণ্ডটা নিভিয়ে তাঁবুতে ঢুকল। স্লীপিং ব্যাগের ভেতরে না গিয়ে ওপরেই বসে পড়ল। আরেকটু রাত হোক। স্পাইরা ভাবুক, ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপরে বেরোবে।

মাঝে মাঝে তাঁবুর দরজায় এসে উঁকি দিয়ে দেখে যায়। দুর্গের ভেতরে সব যেন নিথর হয়ে আছে, কোনও নড়াচড়া নেই। মানুষ আছে বলেই মনে হয় না। উষ্ণ, সুন্দর রাত। মেঘের ফাঁকে লুকোচুরি খেলছে চাঁদ। তবে চাঁদ না থাকলেই ভাল হতো ওদের জন্যে। অন্ধকারে কারও চোখে পড়ার ভয় থাকত না।

অবশেষে এল বহু আকাঙ্ক্ষিত মধ্যরাত। এই সময়টাতেই অপারেশনে যাওয়ার সবচেয়ে ভাল সময় বলে মনে হয়েছে ওদের। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। রওনা হলো দুর্গের দিকে। কিছু ঝোপঝাড় যে রয়েছে, যতটা সম্ভব ওগুলোর আড়ালে আড়ালে মাথা নিচু করে এগোল। রাফিকে কড়া নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে কিশোর, যাতে শব্দ না করে।

এখন মেঘের ভেতরে রয়েছে চাঁদ। যে কোনও মুহূর্তে বেরিয়ে পড়তে পারে। তবে মেঘটা বিশাল, বেরোতে সময় লাগবে বলেই মনে হয়। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আছে কিশোর। সেই সাথে রয়েছে দুশ্চিন্তা। ইভানফরা কি বাঁধন কাটতে পেরেছে? না পারলে ওদেরকে বের করে আনা কিছুটা কঠিন হয়ে যাবে। তবে সেটা আসল ভয় নয়, ভয়টা অন্য জায়গায়। রাতে যদি ওখান থেকে ওদেরকে সরিয়ে ফেলে স্পাইরা? যদি ভাবে, ছেলেমেয়েগুলো দেয়ালের কাছে বেশি ঘোরাঘুরি করছে, বন্দিদেরকে আর ওই ঘরে রাখা নিরাপদ নয়?

ভাবতে ভাবতে ছোট জানালাটার কাছে পৌঁছল সে। বাকিরা রইল তার পেছনে। সবাই চুপ। শিকের ফাঁক দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে ফিসফিস করে ডাকল কিশোর, 'প্রফেসর ইভানফ? আছেন ওখানে? আমরা এসেছি। তখন যে ছুরি দিয়ে গিয়েছিলাম, সেই আমরা!'

কিশোর কণ্ঠে খুব কাছে থেকে জবাব এল, 'আছি। থ্যাংকিউ। বাঁধন কেটে ফেলেছি।'

'গুড!' খুশি হলো কিশোর। ভারমুক্ত হয়ে গেল মন। 'তৈরি থাকো। শিক কাটব আমরা এখন। করাত নিয়ে এসেছি।'

'আমরা কোনও সাহায্য করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল ডাফ।

'না, অনেক লোক আছি আমরা। আমরাই পারব।'

দেরি না করে কাজে লেগে গেল গোয়েন্দারা। রাফিকে নিয়ে রবিন আর জিনা পাহারায় রইল। করাত বের করে শিক কাটতে বসে গেল কিশোর আর মুসা। প্রথমে তোয়ালে জড়িয়ে নিল দুটো শিকে। তারপর করাত চালাল। শব্দ অনেক কমে গেল বটে, কিন্তু নিঃশব্দ রাতে যতটুকু শব্দ হলো তা-ও অনেক। কান খাড়া করে কেউ শুনতে চাইলে শুনে ফেলার কথা।

যতটা আশা করেছিল তত তাড়াতাড়ি কাটা সম্ভব হলো না। ভেবেছিল পুরানো শিক, সহজেই কেটে যাবে। মোটেও তা নয়। লোহা লোহাই। নতুন হলে যা, পুরানো হলেও তাই। শুধু ওপরটায় সামান্য মরচে পরেছে, ব্যস।

তবে অস্থির হলো না দুই গোয়েন্দা। করাত চালিয়ে গেল; আস্তে আস্তেই

চালাল, যাতে আওয়াজ কম হয়।

আরেকটু জোরে চালাতে পারলে আরও তাড়াতাড়ি হতো অবশ্য। অস্থির হয়ে উঠল কিশোর। কোন্ সময় শব্দ শুনে এসে হাজির হয়ে যায় স্পাইরা। তাহলে এত কষ্ট সব বিফল।

দুটো শিক কাটা হয়ে গেল। আরও অন্তত দুটো কাটতে না পারলে মানুষ বেরোনোর মত ফাঁক হবে না।

আচমকা মাথা তুলে চাপা গররর করে উঠল রাফি। চমকে হাত থেমে গেল কিশোর আর মুসার। পাতালঘরে জোরে একটা শব্দ হলো। জ্বলে উঠল উজ্জ্বল আলো। ঝট করে জানালার দু'পাশে সরে গেল দু'জনে। বসে থেকেই মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে তাকাল ভেতরে।

দু'জন লোক এসে দাঁড়িয়েছে ভেতরে। দু'জনের হাতেই পিস্তল।

নয়

'খবরদার! কেউ নড়বে না!' কড়া ধমক লাগাল একজন। সঙ্গীকে বলল, 'আবার বাঁধো এগুলোকে। জলদি!'

অন্য লোকটা পিস্তল হোলস্টারে রেখে দিয়ে প্রফেসর আর ডাফকে আবার বাঁধতে এগোল। এতই চমকে গেছে বেচারারা, প্রতিবাদ করার ক্ষমতাটুকুও যেন নেই। বাধা দেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ পিস্তল তাক করা রয়েছে তাদের দিকে।

উঠে দাঁড়াল কিশোর। বলল, 'আপাতত আর কিছু করার নেই। পরে আবার চেষ্টা করতে হবে। চলো, চলে যাই।'

তবে দেরি করে ফেলেছে ওরাও। অন্ধকার ছায়া থেকে বেরিয়ে এল আরও দু'জন লোক, ওদের পথরোধ করল।

'হায় হায়!' মনে মনে বলল কিশোর। 'দু'জনের বেশি রয়েছে, ভাবতেই পারিনি!'

'চমকে গেছ তো?' হাসল একটা লোক। 'ভেবেছিলে দু'জনই আছে।' ইংরেজিতেই বলল লোকটা, তবে তাতে বিদেশী টান।

মেজাজ খিঁচড়ে গেছে কিশোরের। এত কষ্ট করে শেষে তীরে এসে তরী ডোবা। এভাবে হেরে যাওয়া!

'চারজন!' বিড়বিড় করল সে।

'ইয়েস, ইয়াং ম্যান,' বলল লোকটা। 'তোমাদের খেদমতে চারজনই আছি। তোমাদেরকে চমৎকার করে বাঁধার জন্যে। তারপর? তোমরা ভেবেছিলে বন্দিদেরকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে, তাই না? চালাকিটা মন্দ করোনি। তবে তোমাদের চেয়ে বয়েস বেশি তো আমাদের, আর এসব খেলা অনেক বছর ধরে খেলে আসছি, তাই সন্দেহটা না করে থাকতে পারিনি।'

'যত চালাকই হোন,' রাগ করে বলল কিশোর। 'আপনারা খারাপ কাজ

করছেন। অত গর্ব করার কিছু নেই।'

'বড় বড় কথাও তো বলতে পারো দেখি,' হাসি মুছে গেছে লোকটার। 'বেশি বললে কিন্তু জিভ ছিঁড়ে নেব!'

মুসাও রেগে গেল। 'বড় বড় কথা তো আপনিও বলেন! ছিঁড়ুন না দেখি!'

একটা পুঁচকে ছেলের মুখে এমন জবাব আশা করেনি লোকটা। থ হয়ে গেল ক্ষণিকের জন্যে। তারপর চড় মারার জন্যে হাত তুলল। তার হাত ধরে ফেলল অন্য লোকটা। বলল, 'আহ, কয়েকটা পোলাপান। এদের সঙ্গে রাগ দেখানোর কিছু নেই। বেঁধে ফেলে রাখি। শিক্ষা হয়ে যাবে।'

'পরে আমাদেরকে কি করবেন?' কিশোর জিজ্ঞেস করল। 'সেটা নির্ভর করে সরকার কি জবাব দেয় তার ওপর। আমরা আমাদের দু'জন লোককে ফেরত চেয়েছিলাম। বিনিময়ে প্রফেসর আর তাঁর ছেলেকে ফেরত দিতাম। তোমরা এসে ভালই করলে। জিম্মির সংখ্যা বেড়ে গেল আমাদের। এবার ছ'জনের বিনিময়ে দু'জনকে চাইব। দেখি, এবার কি করে রাজি না হয়ে পারে।'

ছেলেমেয়েদেরকে বাঁধতে শুরু করল ওরা।

অবাক হয়ে কিশোর ভাবতে লাগল, রাফি কোথায় গেল? আশেপাশে কোথাও চোখে পড়ছে না তাকে। ভয় পেয়ে গেল সে। লোকগুলোকে আক্রমণ করার কথা ভাবছে না তো! তাহলে গুলি খেয়ে মরবে!

কোথায় আছে জানতে দেরি হলো না। জিনা, রবিন আর মুসাকে বাঁধা শেষ করেছে লোকগুলো। কিশোরের দিকে এগোল। ঠিক ওই মুহূর্তে অন্ধকার থেকে তীরবেগে বেরিয়ে এল রাফি। পরক্ষণেই ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল একজন লোক, কিশোরের দিকে হাত বাড়িয়েছিল যে লোকটা। কুকুরটা তাকে কামড়ে দিয়েছে।

সুযোগটা কাজে লাগানোর জন্যে নড়ে উঠল কিশোর। কিন্তু কিছু করার আগেই ধরে ফেলল তাকে দ্বিতীয় লোকটা। তাকেও কামড়াতে এল রাফি। পিস্তল তুলল লোকটা। তবে গুলি করল না, বাড়ি মারল রাফির মাথায়। এত জোরে মারল, কিশোরের মনে হলো খুলি ভেঙে ফেলেছে। বেহুঁশ হয়ে লুটিয়ে পড়ল রাফি।

'শয়তান! বদমাশ!' চিৎকার করে কেঁদে উঠল জিনা। 'মেরে ফেলেছে! রাফিকে মেরে ফেলেছে!'

'চুপ থাকো!' শাসিয়ে বলল লোকটা। 'নইলে তোমারও ওই অবস্থা হবে!' বলে রাফির গায়ে ধাঁ করে এক লাথি মেরে বসল। তারপর ঠ্যাং ধরে টেনে তুলে ছুঁড়ে ফেলল ঝোপের ভেতরে।

রাগে, দুঃখে অন্ধ হয়ে গেল যেন কিশোর। ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। কিন্তু দু'জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের সঙ্গে পারা অসম্ভব। ফলে যা ঘটার তাই ঘটল। সহজেই চিত করে ফেলে তার হাত পা বেঁধে ফেলল ওরা।

ছেলেমেয়েদেরকে দুর্গের ভেতরে বয়ে নিয়ে এল স্পাইয়েরা। যে পাতালঘরে প্রফেসর আর ডাফকে বন্দি করে রেখেছে, ওদেরকেও সেখানে এনে ফেলল। তারপর আলো নিভিয়ে দিয়ে চলে গেল।

চাঁদের আলো জানালা দিয়ে এসে পড়েছে মাটির নিচের ঘরে। এক ধারে

বিচিত্র আলোআঁধারির সৃষ্টি করেছে।

'ভাল বেকায়দায় পড়লাম!' বিরক্তির হাসি হাসল রবিন।

'আমাদের জন্যেই তোমাদের এই অবস্থা!' আফসোস করে বললেন প্রফেসর।

'ভাববেন না, স্যার,' সান্ত্বনা দিয়ে বলল মুসা। 'উপায় একটা বের করেই ফেলব। তবে একটা ভুল করেছি, এটা ঠিক। এত ভয়ংকর লোকের বিরুদ্ধে আমাদের মত কয়েকটা ছেলেমেয়ের লাগতে আসা ঠিক হয়নি। পুলিশকে জানানো উচিত ছিল।'

গোবেল ভিলায় কি কি ঘটেছে, জানাল ওরা প্রফেসর আর ডাফকে। কিভাবে ছদ্মবেশে গিয়েছিল জোরেক আর ডাউনিল, সব বলল। কথা বলছে শুধু মুসা ও রবিন। কিশোর চুপ করে আছে। নিচের ঠোঁটে ঘনঘন কামড় বসাচ্ছে। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। আর জিনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

'ভেবো না, জিনা,' মুসা সান্ত্বনা দিতে চাইল। 'বহুবারই ওরকম মার খেয়েছে রাফি, মরেনি তো। এবারেও মরবে না।'

'রাফি!' প্রফেসর বললেন, 'তারমানে তোমাদের আরেক সঙ্গী আছে?'

'আছে, জিনার কুকুর,' জবাব দিল কিশোর। 'শয়তানটা তার মাথায় বাড়ি মেরেছে!'

'কুকুরের খুলি খুব শক্ত,' মুসা বলল। 'সহজে ভাঙে না।'

'না মরলে এতক্ষণে চলে আসত!' জিনা বলল।

'আঘাতটা একটু বেশি লেগেছে আরকি। ঠিক হয়ে যাবে। হুঁশ ফিরলেই চলে আসবে।'

'না এলেই ভাল। এবার দেখলে ওরা ওকে মেরেই ফেলবে!' কিছুতেই দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারছে না জিনা। গাল বেয়ে পানি গড়াচ্ছে।

'আহারে!' আন্তরিক দুঃখ পেয়েছেন প্রফেসর। 'আমাদের জন্যেই এই অবস্থা!'

ডাফ বুঝতে পারল, এসব আলোচনা করে জিনার দুঃখ কমানো যাবে না। অন্য প্রসঙ্গে চলে যাওয়ার চেষ্টা করল সে। 'এভাবে পড়ে থাকলে হবে না। বেরোনোর চেষ্টা করা দরকার। আরেকবার বাঁধন কাটা যায় কিনা দেখি।'

চাঁদের আলো যেখানটাতে এসে পড়েছে, সেখানটা দেখাল সে। হাসল। 'তাড়াহুড়োয় ছুরিটা নিয়ে যাওয়ার কথা মনে ছিল না লোকগুলোর। কিংবা হয়তো দেখেইনি ওটা খেয়াল করেনি।'

মোচড় দিয়ে দিয়ে হাতের বাঁধন সামান্য ঢিল করতে পারল সে। তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে এগোল ছুরিটার দিকে। কাছে গিয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল ওটার ওপর। খানিক পরে বলল, 'পেরেছি! ধরতে পেরেছি!'

সময় যাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা ভাবছে, পারবে তো? ডাফ হাত খুলতে পারবে তো?

কয়েকটা যুগ যেন পেরিয়ে যাওয়ার পর আবার শোনা গেল ডাফের চাপা উল্লাস, 'পেরেছি! খুলতে পেরেছি!'

তারপর অন্যদের বাঁধন খুলতে আর সময় লাগল না।

এবার বেরোনোর চেষ্টায় মন দিল সবাই। জানালাটার নিচে এসে দাঁড়াল

কিশোর। ওপরে তাকাল। শিক কাটা, বেরোতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু উঠবে কি করে ওখানটায়?

'এক কাজ করো,' বুদ্ধি বাতলে দিলেন প্রফেসর। 'আমার কাঁধে ভর দিয়ে একজন উঠে যাও। এখানে দড়ির অভাব নেই। দড়ি নিয়ে গিয়ে শিকের সঙ্গে বাঁধো। বেয়ে উঠে বেরিয়ে যেতে অসুবিধে হবে না।'

'ঠিক বলেছেন!' একমত হলো কিশোর। মুসাকে বলল, 'তুমি যাও। নিচে থেকে দড়ি ছুঁড়ে দেব আমরা।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাতালঘর থেকে খোলা আকাশের নিচে চাঁদের আলোয় বেরিয়ে এল ছয়জনে। খোলা বাতাসে শ্বাস টানতে টানতে প্রফেসর বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক না। পালানো দরকার।'

'আমরা সাইকেল নিয়ে এসেছি,' জিনা বলল। 'চারটে আছে। মুসা, তুমি রবিন আর ডাফদেরকে নিয়ে চলে যাও। আমি আর কিশোর হেঁটে আসছি।'

'তুমি যাও,' মুসা বলল। 'আমি হাঁটতে পারব।'

'তর্ক কোরো না। তুমি এই এলাকা চেনো না, আমি চিনি। বেপথে নামলেই আর চিনবে না। কিশোরের সঙ্গে আমাকেই যেতে হবে। যাও। সোজা থানায় চলে যাবে।'

'জিনা ঠিকই বলেছে, মুসা। জলদি যাও,' কিশোর বলল।

'তাহলে আমিও থাকি না। ওরা তিনজন চলে যাক।'

'কথা বলে সময় নষ্ট কোরো না! রবিন যদি রাস্তা ভুলে যায়? ও একা পারবে না। যাও যাও!'

'তাহলে আমিই থাকি,' ডাফ বলল।

'উঁহুঁ, তোমারও থাকার দরকার নেই! ধরা পড়লে আবারও বন্দির সংখ্যা বাড়বে।' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল কিশোর। 'সাইকেল আছে চারটে। অযথা তুমি থাকতে যাবে কেন? থেকে আমাদের কোন উপকার তো করতে পারবে না।' প্রায় জোর করেই চারজনকে সাইকেলে তুলে দিল কিশোর আর জিনা।

কিশোরকে ডাকল জিনা, 'এসো।'

'দাঁড়াও।' বলে ঝোপের দিকে রওনা হয়ে গেল জিনা। রাফিকে যেখানে ফেলা হয়েছে সেখানে এসেই থমকে গেল। রাফি নেই। ঘাবড়ে গেল সে। তাহলে কি স্পাইরা ফিরে এসে দেখেছে, সত্যিই মরে গেছে রাফি? তাকে তখন সাগরে ফেলে দিয়েছে?

খোঁজাখুঁজি শুরু করল সে আর কিশোর। ভীষণ কাঁদতে ইচ্ছে করছে জিনার। রাফির জন্যে কিশোরেরও মন খারাপ হয়ে গেছে। জিনার চেয়ে কম ভালবাসত না কুকুরটাকে সে।

হঠাৎ দুর্গের ভেতরে একটা হৈ-চৈ শোনা গেল। নিশ্চয় বন্দিরা যে পালিয়েছে এটা দেখে ফেলেছে স্পাইয়েরা।

'জলদি চলো!' তাড়া দিল জিনা। 'দেরি করলে আবার ধরা পড়ব! এবার আমাদেরকে মেরেই ফেলবে শয়তানগুলো!'

ছুটল দু'জনে। ঢাল বেয়ে নামার সময় শুনতে পেল স্পাইদের চিৎকার। দুর্গ

থেকে বেরিয়ে ক্যাম্পের দিকে চলেছে ওরা, যেখানে তাঁবু ফেলেছে গোয়েন্দারা।
রাস্তায় উঠল না জিনা। পথের পাশের ঝোপ ধরে এগোল।
কিছুদূর যাওয়ার পরেই ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল। দেখা যাচ্ছে তিন জোড়া হেডলাইট। এগিয়ে এল গাড়িগুলো।
আরে, পুলিশের গাড়ি!
তাড়াতাড়ি রাস্তায় উঠে এসে হাত নাড়তে লাগল দু'জনে।
থেমে গেল গাড়িগুলো। দুটো পুলিশের, আর একটা প্রাইভেট কার। সেটার ভেতরে ঘেউ ঘেউ করে উঠল একটা কুকুর।
'বেঁচে আছিস!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল জিনা, আনন্দে। 'রাফি, বেঁচে আছিস!'
সামনের গাড়ি থেকে মুখ বের করলেন শেরিফ জিংকোনাইশান। জিজ্ঞেস করলেন, 'শয়তানগুলো আছে এখনও দুর্গে?'
'বলতে পারব না,' জবাব দিল কিশোর। 'আমাদেরকে ধরতে বেরোল দেখেই পালালাম।'
'হুঁ! চলো চলো! ওঠো, গাড়িতে ওঠো!'
গাড়িতেই দেখা গেল প্রফেসর ইভানফ, ডাফ, মুসা আর রবিনকে। রাফিকেও। পারকার আঙ্কেল তাঁর নিজের গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন। তিনি জানালেন, মাঝরাতে ছুটতে ছুটতে গিয়ে হাজির রাফি। তাঁর কাপড় কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে যেতে চাইল দরজার দিকে। তিনি বুঝতে পারলেন, ছেলেমেয়েরা বিপদে পড়েছে। বেরিয়েই সোজা থানায় চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে পুলিশ নিয়ে বেরোলেন। পথে দেখা হয়ে গেল প্রফেসরদের সঙ্গে।

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে জড় হলেন পারকার আঙ্কেল, কেরিআন্টি, প্রফেসর ইভানফ, ডাফ, জিনা, রবিন, মুসা আর কিশোর। রাফি বসল তার পায়ের কাছে। হাসি-আনন্দের মাঝে খাওয়াদাওয়া চলল।
আলোচনা হচ্ছে স্পাইদের নিয়ে। একসময় প্রফেসর বললেন, 'শয়তানগুলো ধরা পড়ল রাফির জন্যেই। সে বুদ্ধি করে বাড়ি চলে না এলে, পারকার আঙ্কেল থানায় যেতেন না। আর অত তাড়াতাড়ি পুলিশ ওখানে না গেলে স্পাইগুলোকেও ধরতে পারত না। পালাত ওরা।'
'হ্যাঁ, রাফিকে একটা মেডেলই দিয়ে দেয়া দরকার,' ডাফ বলল। 'ওর মত বুদ্ধিমান কুকুর খুব কমই দেখেছি।'
শুনে খুশি হলো কিশোর। রাফিও। ডাফের পায়ের কাছে এসে লেজ নাড়তে লাগল।
'মেডেল পরে পাবি,' হেসে রাফিকে বলল ডাফ। 'আপাতত এই কেকটা নে।'
খুশিতে রাফি অস্থির। কেকে কামড় বসানোর আগে ডাফের হাত চাটা দেয়ার সৌজন্যটুকু দেখাতে ভুলল না।

-ঃ শেষ ঃ-